বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী

সর্বভারতীয় খ্যাতির সম্মানে ভূষিত বাঙ্গালী জাতির
সাফল্যের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের
সব চাইতে গৌরবময় অধ্যায়।

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৯৪

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীনীরজ বিশ্বাস

মুদ্রাকর : শ্রীকুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিন্টার্স

৬৭'এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭ ০০০৬

বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী

সবিনয় নিবেদন মেতৎ

প্রিয় ফকিরবাবু! আমার ছেলে আপনার রচিত বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী একখানি কিনিয়া আনে ও আমাকে পড়িতে দেয়। অভয়াপদ মল্লিক মহাশয় ইংরাজীতে একখানি বিষ্ণুপুরের ইতিহাস প্রকাশ করেন। উহা সাধারণ ইতিহাসের মত নীরস তথ্যপূর্ণ হওয়ায় আমাদের বিশেষ মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া বাল্যাবস্থা হইতেই শুষ্ক ইতিহাসের প্রতি আমার বিরূপতা আছে। সে জন্য আপনার গ্রন্থখানি পাঠের জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করি নাই। পরে অনেকটা বাধ্য হইয়াই উহা পড়িতে আরম্ভ করি এবং যতই অগ্রসর হই ততই উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকি। এখন বলিতে পারি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মত আপনি একাধারে ঐতিহাসিক ও সুসাহিত্যিক হওয়ার জন্য আপনার অমরকাহিনী এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এজন্য আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ইতি—

বিনীত—

রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ

অধ্যাপক এলাহাবাদ কলেজ,

২৯ মে, ১৯৭০

দেশ, যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চ অভিমত

ঐতিহ্যময় স্থান 'বিষ্ণুপুর'। বঙ্গদেশের গৌরব। আজ সে স্থান বাঁকুড়া জেলার সামান্য একটি মহকুমার পরিচয় বহন করলেও বিষ্ণুপুর বলতে বোঝায় "বাংলার মুকুটমণি, বাঙ্গালীবীরের শৌর্য্য-বীর্য্যের লীলাভূমি, পূর্বভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মল্লভূম।

পূর্বে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, হুগলীর আরামবাগ হয়ে হাওড়া, পশ্চিমে ছোটনাগপুর, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর তমলুক ও উত্তরে দামোদরনদ —আসানসোল পর্য্যন্ত এই মল্লভূম রাজ্যের বিস্তৃতি। এই রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর নামেই এই রাজ্যের প্রসিদ্ধ।"

পৃথিবীর যে কোন ভৌগোলিক খণ্ডের উন্নতির জন্য তথাকার জনসাধারণ যেমন দায়ী, ততোধিক দায়ী সেখানকার জননায়কেরা তথা নরপতিগণ। ইতিহাসে তাই দেখি যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নরপতি, সেই সেই দেশেও মানুষকে এক অপূর্ব মহিমামণ্ডিত করেছেন। বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। এখানকার মল্লরাজগণ পৃথিবীর যে কোন আদর্শ নৃপতির সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে তার ধ্বংস কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজাদের ইতিহাস গৌরব ও মহিমায় উজ্জ্বল।

এই বিষ্ণুপুর, তার নরপতিদের এবং এখানকার মানুষের এক প্রামাণ্য ইতিহাস লেখার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। বিষ্ণুপুর ও তার রাজবংশ সম্পর্কে বহু ভুল তথ্যের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক বিভিন্ন উপাদান থেকে এই গৌরবময় অঞ্চলের এক তথ্যপূর্ণ সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুধু রাজবংশ, রাজপরিবারের কাহিনীই নয়, বিষ্ণুপুর রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি, শাসন-ব্যাস্থা, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দির, কামান প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন লেখক।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই বই পাঠ করলে সে তার পুরানো গৌরবের ছিটেফোঁটা লাভ করে ধন্য হবে।

"আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য —কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগরার মতো একটি কলানগরী বাংলা দেশ গড়িয়া উঠিল না। এই রূপ একটি

উৎসর্গ

মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর রঘুনাথ সায়র মহল্লার
প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান, বিষ্ণুপুরের
দরদী বন্ধু ও অন্যতম নাগরিক,
পরমপূজ্য
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—
আমার অপরিসীম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, এই
"বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী"
অর্পণ করলাম।

"বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী।" এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য শুধু মাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখাই নয়, সমস্ত মল্লভূমবাসী কৃতজ্ঞ। শ্রীকর্মকারের এই বইখানি আগামী দিনের বহু গবেষক আর ঐতিহাসিককে পথ দেখাবে।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার পক্ষ থেকে শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং তাঁর এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করছি।

শ্রীসত্যব্রত দে, সভাপতি
মাণিকলাল সিংহ, সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা, বিষ্ণুপুর

যুক্তি, তর্ক, তথ্যে ভরা এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি যেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার ইচ্ছা জাগে।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়,
চেয়ারম্যান, বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটি

অভিযান পত্রিকা—১৩৭৪, ৩রা আষাঢ়

মাত্র নগরী সারা বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্প কার্য্যে বাংলাদেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষ-স্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।" ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই আক্ষেপ অনেকাংশে দূরীভূত হবে যদি বাঙ্গালী পাঠকসাধারণ এই বই—যা বর্তমান বিষ্ণুপুর রাজের কথায় "নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরা"—পাঠ করে বিষ্ণুপুর সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হন এবং এই ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার প্রয়াসী হন।

—**দেশ** পত্রিকা ১৩৭৪ সাল, ১৯শে শ্রাবণ।

বাংলা ১০১ সালে, ইংরাজী ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে বসেন আদিমল্ল রঘুনাথ। সেই থেকে মল্লাব্দ নামে এক নূতন অব্দেরও প্রচলন শুরু হয়। দৈব ও পুরুষকারের মাহেন্দ্রযোগে মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং ইতিহাসের পাতায় এই রাজবংশ ও রাজধানী শৌর্য্যে ও মহত্বের এক পীঠস্থানে পরিণত হয়। বিষ্ণুপুরের সেই ঐতিহ্য আজ মলিন, সাংস্কৃতিক স্মৃতিগুলিও ক্ষয়িষ্ণু। আদিমল্ল রঘুনাথ, জয়মল্ল, জগৎমল্ল, বীরহাম্বির, রঘুনাথ, দ্বিতীয় রঘুনাথ প্রভৃতি রাজগণের কাহিনী আজ প্রায় কিম্বদন্তীতে রূপান্তরিত। তার মধ্য থেকে সত্যকে উদ্ধার করে, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গৌরববাহী অদ্বিতীয় এই রাজপাট মল্লভূম বিষ্ণুপুরের, একদা যার নাম ছিল বন বিষ্ণুপুর, দুর্গম ঘন অরণ্যময় এলাকা ও মল্লরাজবংশের গৌরবময় কীর্তিকথা কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিক গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সেই সকল ঘটনাবলী, কাহিনী ও কিম্বদন্তীর বিশ্লেষণ পূর্বকপ্রাপ্ত প্রামাণ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে বিষ্ণুপুরের পূর্ণাঙ্গ এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করে বহুদিনের একটি অভাবকে পূর্ণ করেছেন। সেই সঙ্গে পূর্ব প্রচলিত কিছু ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াসে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যারও প্রয়াস এই গ্রন্থে আছে। দেশবাসীকে বিষ্ণুপুরের এই প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

—**যুগান্তর** পত্রিকা ১৩৭৪ সাল, ২৬শে ফাল্গুন রবিবার।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যপূর্ণ এই নগরের আদি রাজবংশের কাহিনী, মদনমোহনের কাহিনী, দায়ুদ খাঁয়ের লক্ষ সৈন্যের কবর রচনার কাহিনী, দুর্ধর্ষ মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের

গর্ব খর্বকারী মুণ্ডমালা ঘাটের কাহিনী প্রভৃতি অজস্র রোমাঞ্চ রহস্যের স্মৃতি বিজড়িত বিষ্ণুপুরকে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কর্মকার বহু পরিশ্রম ও গবেষণার ফলস্বরূপ উপস্থিত করেছেন পাঠক সমক্ষে। গ্রন্থখানি প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে যেমন একদিকে, তেমনি অপর দিকে রচনার সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে হয়েছে গল্প উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

প্রধানতঃ পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হবার পর গ্রন্থকার উপসংহারের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, শাসনতন্ত্র, সৈন্য ও পুলিশ, রাজ্যের রক্ষা ব্যবস্থা, রাজস্ব বিভাগ, স্বায়ত্বশাসন, বিচার, ধর্ম, দান, স্বাস্থ্য, সমাজ ব্যবস্থা, কৃষি ও বাণিজ্য, শিল্প, সঙ্গীত, উৎসব, কামান, মন্দির, জলঘড়ি বা তামি, বাঁধ, শ্লোক, নরবলী, কতলখানা, সাততালা, লালগড় এবং গুমগড় ও ফোয়ারাখানা সম্বন্ধে সংক্ষেপ আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত আদি থেকে বর্তমান কালপর্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজবংশের নরপতিগণের একটি সালানুক্রমিক রাজত্বকালের তালিকাও সংশ্লিষ্ট হয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। গোড়ার দিকে গ্রন্থকারের নিবেদনটিও সুলিখিত।

—**বসুমতী** পত্রিকা ১৩৭৫ সাল, ৩০শে চৈত্র রবিবার।

পুস্তকটির প্রচ্ছদপট বিষ্ণুপুর মল্লরাজ্যের ভগবৎভক্তি, ধর্ম, বিশ্বাস, শৌর্য্য, বীর্য্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতি, স্থাপত্যশিল্প ও ঐতিহ্যের পূর্ণ বিকাশ করিয়াছে।

লেখক বহু পরিশ্রমে নানান মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া মল্লরাজ্য স্থাপন হইতে বাংলার শেষ হিন্দু রাজত্বের অতুলনীয় ইতিবৃত্তি পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রতিটি প্রগতিশীল পাঠাগারে ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এইরূপ তথ্য-পূর্ণ ইতিবৃত্তের স্থান হইলে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ; উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠক্রমেও মল্লভূমের এই ইতিহাস সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন।

—বাঁকুড়া জেলার মুখপাত্র **মল্লভূম** পত্রিকা ১৩৭৪ সাল, ২২শে শ্রাবণ।

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার নানাভাবে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের প্রাচীন ইতিহাসের প্রচার ও প্রসারে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রথম জীবনে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের ইতিহাসাশ্রয়ী কয়েকটি নাটক রচনা করে ইনি যশস্বী হয়েছেন। মল্লভূমের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগের ফলশ্রুতি—এই

গ্রন্থ সম্বন্ধে মহামান্য বিষ্ণুপুররাজের মন্তব্য ও শুভেচ্ছার প্রতিলিপি।

আজ পর্য্যন্ত মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক কাহিনীর নাম দিয়ে 'বাংলার সতী', 'লালবাঈ', প্রভৃতি উপন্যাস ; 'মদনমোহন', 'মুক্তির মন্ত্র', 'লালবাঈ', 'লালবাঁধ' ; ব্রজেন দের 'পতিঘাতিনী সতী' ; ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঁদী লালবাঈ' প্রভৃতি নাটক ; 'মদনমোহন', 'বীরহাম্বির' কথাচিত্র ও 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের ভৌগলিক বিচরণের মধ্যে মল্লরাজবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস নামক কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ ও কথাচিত্রের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরে ঐতিহাসিক কাহিনীর নাম দিয়ে যেজিনিস প্রচার করা হয়েছে তার অধিকাংশই শুধু ভুল নয়, আপত্তিকর ভুলে ভরা। তাই উক্ত গ্রন্থ ও কথাচিত্রের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করেছি।

সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক মাণিকলাল সিংহ রচিত পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থের ঐতিহাসিক মধ্যপর্ব নামক অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুর রাজবংশ ও তার অধিপতিদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা তিনি লিখেছেন তার অধিকাংশই যেমন অবাস্তব ও অসামঞ্জস্যমূলক, সেইমত আপত্তিকর ! কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যে ঐমত লিখতে পারেন তা আমার ধারণার অতীত। তাই আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি—বিষ্ণুপুরের অধিবাসী শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার বহুকাল হতে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, হাতের লেখা পুঁথি, মন্দির, গড়, বাঁধ, নানাবিধ ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ, বিষ্ণুপুর রাজবংশ ও বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভৃতির কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, "বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী" নাম দিয়ে মল্লভূমের ইতিহাস ও "বিখ্যাত দেবতা মদনমোহন" নাম দিয়ে শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের যে কাহিনী তিনি লিখেছেন, সত্যই তা নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরা মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ হয়েছে। আর উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত, 'মল্লভূম', 'মহারাজা বীরহাম্বির', 'পতিঘাতিনী সতী বা সর্বনাশী লালবাঈ', 'গুপ্ত বৃন্দাবন তীর্থ বা শ্রীমদনমোহন' ও 'বীরভূমি বিষ্ণুপুর' নাম দিয়ে যে পাঁচখানি বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক নাটক তিনি লিখেছেন,

সেগুলিও বিষ্ণুপুরের নিখুঁত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ অতি চিত্তাকর্ষক নাটক হয়েছে। আমার বিশ্বাস, উক্ত গ্রন্থগুলি বিষ্ণুপুরের যথার্থ ঐতিহাসিক কাহিনীর অবগতিতে জনসাধারণকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করবে। সেইজন্য শ্রীযুক্ত কর্মকারকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ও শ্রীভগবানের কাছে উক্ত গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

১৩৮৫ সাল, ১৫ই কার্তিক
শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

শ্রীশ্রীরাজাকালীপদসিংহঠাকুর
বিষ্ণুপুর রাজবাটি।

গোড়ার কথা

অতি কিশোর বয়সে আমার পিতা মাখনলাল কর্মকারের কাছে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক কাহিনী শুনে আমি বিষ্ণুপুর ইতিহাসের ওপর আকৃষ্ট হই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আকাঙ্ক্ষা আমার আরও বাড়ে। তার তথ্য সংগ্রহে আত্ম-নিয়োগ করি। তার ফলে পাই বিভিন্ন কিংবদন্তী ও বিষ্ণুপুর রাজবাড়ী হতে হাতের লেখা এক পুঁথি। সেই পুঁথি উদ্ধার করে তার মধ্যে দেখতে পাই বিষ্ণুপুরের বিগত দিনের এক অপরূপ ছবি। তার শৌর্য্য, বীর্য্য, ন্যায়নিষ্ঠা, রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছু। আমার চোখের সামনে জেগে ওঠে যেন এক নূতন জগৎ। ধর্ম, সুশিক্ষা, সুশাসন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিষ্ণুপুরের নরপতিগণ মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কি অপরূপ এক স্বর্গরাজ্য সেকালে গড়ে তুলেছিলেন। মানবতার লীলাভূমি বিষ্ণুপুরের বুকে সেকালের মানুষ কি স্বর্গসুখই না উপভোগ করে গেছেন! আর আজ আমরা অসংখ্য আবিষ্কারে ভরা বিজ্ঞানের যুগে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি।

বিজ্ঞান আমাদের দান করেছে অনেক কিছু। কিন্তু তার সঙ্গে হরণ করেছে মানুষের পরম সম্পদ জ্ঞান। বিজ্ঞানের সঙ্গে এসেছে অজ্ঞানতার চরম অভিশাপ, অসংখ্য দুর্নীতি দুরাকাঙ্ক্ষা ভরা সর্বনাশা আমিত্ব, প্রচণ্ড আত্মসর্বস্বতা। বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারে অন্ধ হয়ে মানুষ আজ আত্মহত্যা করতে বসেছে। তার সেই চরম উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সে তৈরী করছে ধ্বংসের উপাদান। বহু দিক দিয়ে আজ আমরা অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। ধর্মকে বলতে শিখেছি কুসংস্কার, ভগবানকে বলছি ভুয়োবাজী! যন্ত্রণা ভোগ করছি অহরহ।

কিন্তু সেকালের মানুষ এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে, সত্যাশ্রয়ী, ধর্মাশ্রয়ী হয়ে, ভগবানের ওপর বিশ্বাস অবিচলিত রেখে, দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে কি অগাধ সুখ-শান্তি উপভোগ করে গেছেন! তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই— এই বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীর প্রশংসা, সারা মল্লভূমে অসংখ্য দেবালয়, দেববিগ্রহ, তাঁদের নিত্য পূজা, সারা বৎসর ধরে পাল-পার্বণের ভেতর দিয়ে আনন্দ-উৎসবের প্রথা ও বিভিন্ন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। অগাধ শান্তি ও অপরিমিত অবসর ব্যতীত এ সকল

কখনও সম্ভব হয় না। তাই বিষ্ণুপুরের বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশ করবার জন্য আমার আগ্রহ জাগে। তার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি। আরও বিস্তৃত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করবার আশায় মন্দির, গড়, বাঁধ, নানাবিধ ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ প্রভৃতির মধ্যে তার খোঁজ করি। কোথায় তার আদি উৎস লাউগ্রাম, সেখানের দণ্ডেশ্বরীদেবীর মন্দির, কোথায় প্রদ্যুম্নপুরের ধ্বংসাবশেষ, কোথায় দায়ুদ খাঁয়ের লক্ষ সৈন্যের কবর রচনার ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমি যুঝঘাটি, কোথায় দুর্ধর্ষ মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের গর্ব খর্বকারী মুণ্ডমালা ঘাটের প্রান্তর, কোথায় রহস্যময় লালগড়, কোথায় লালবাঈয়ের বাসভবন নূতনমহল, কোথায় মহারাজ রঘুনাথসিংহদেবের হত্যারঞ্জিত প্রাসাদশীর্ষ, কোথায় তাঁর রক্তাপ্লুত হরিণপিঞ্জরের অবস্থান ভূমি, কোথায় মহীয়সী মহারাণী চন্দ্রপ্রভার আত্মোৎসর্গের পুণ্যক্ষেত্র সতীকুণ্ড, কোথায় কোন মহারাজার প্রতিষ্ঠিত কোন বিগ্রহ, তাঁদের শ্রীমন্দির প্রভৃতি। আর তার সঙ্গে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি বিষ্ণুপুর রাজবংশ, বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট মহাপাত্র-বংশ, পূজারীবংশ, বিশ্বাসবংশ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে। তারপর সব কিছু বিষয়ে যথাসম্ভব নিঃসন্দেহ হয়ে, এই "বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী" প্রকাশে ব্রতী হই।

এর জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই আমি পূজনীয় বংশীবদন পূজারী, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, সর্বোপরি বিষ্ণুপুর রঘুনাথসায়র মহল্লার অধিবাসী পরমপূজ্য শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি ব্যতীত এই পুস্তক লেখা ও লোকচক্ষে একে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এর জন্য শুধু আমার নয়, তিনি সারা মল্লভূমবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

১৩৭৪ সাল, প্রথম প্রকাশ

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার
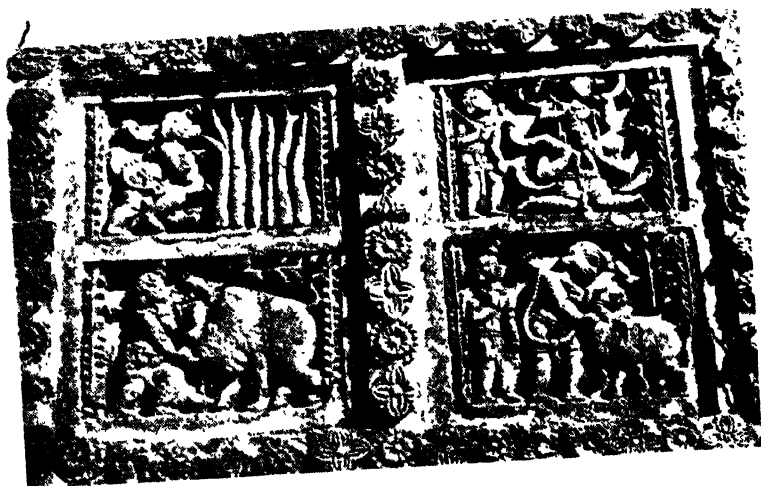
জোড়বাংলা মন্দিরের টের.কোটার কাজ
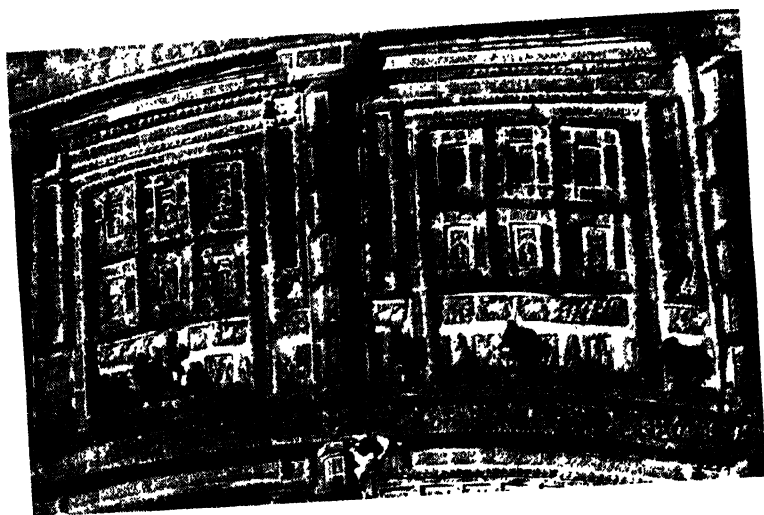
শ্যামরায় মন্দির
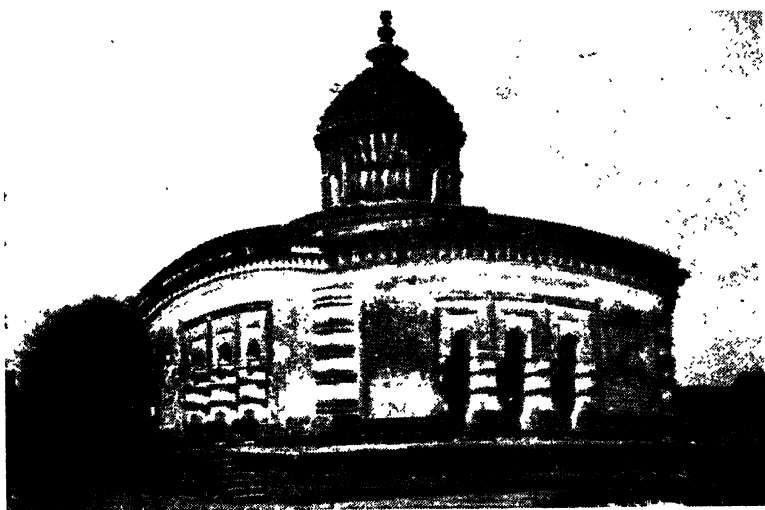
মদনমোহন মন্দির

শিকার দৃশ্য : জোড়বাংলা মন্দির

জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটার কাজ
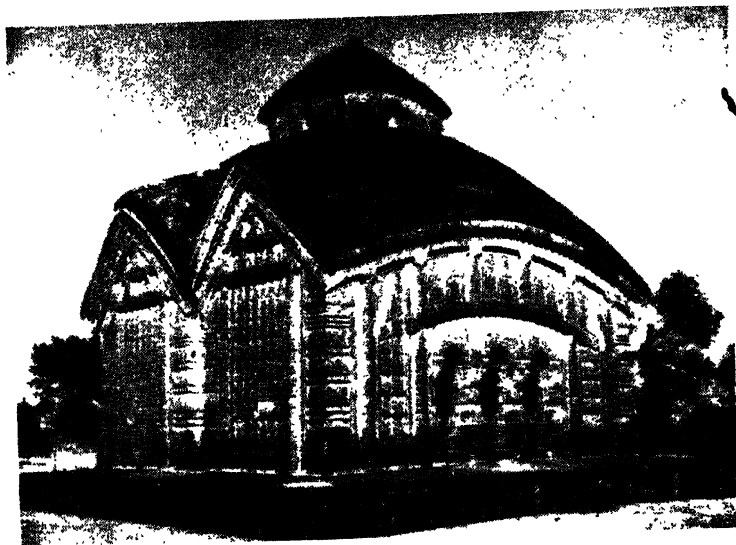
জোড়বাংলা মন্দির
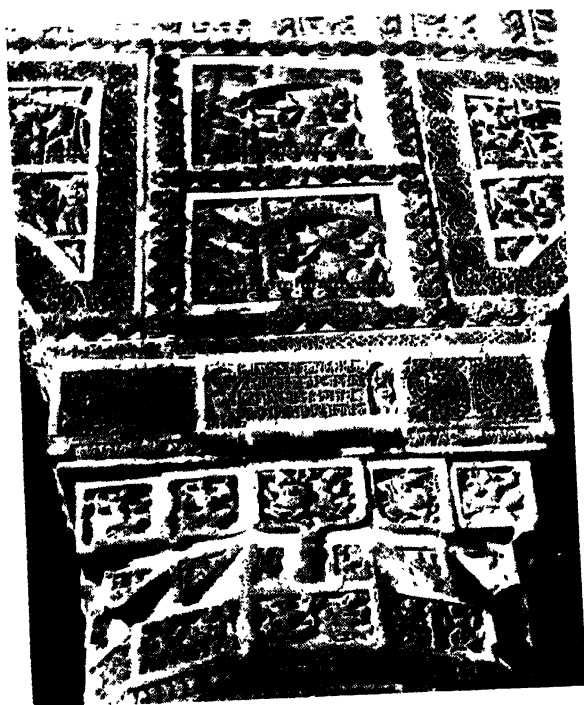
জোড়বাংলার স্তম্ভ

রাধাশ্যাম মন্দির

লালজীউ মন্দির

বিষ্ণুপুরের দুর্গদ্বার বড়পাথের দরজা

পাথরদরজা। (দুর্গ)
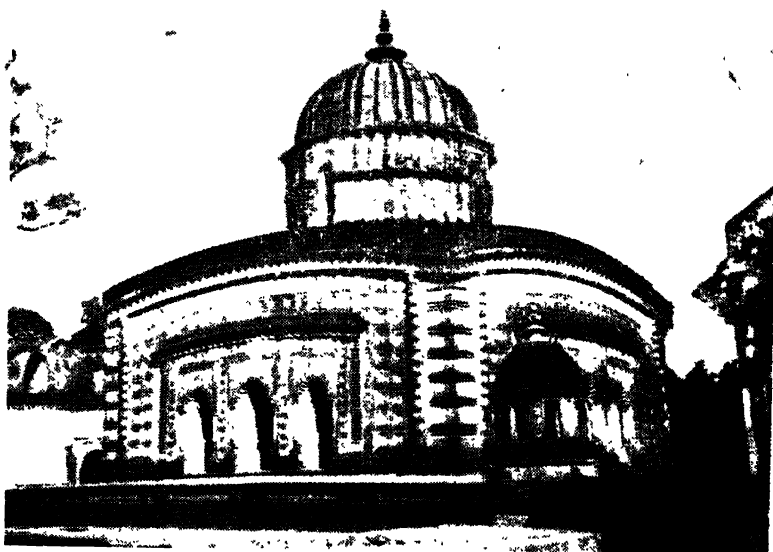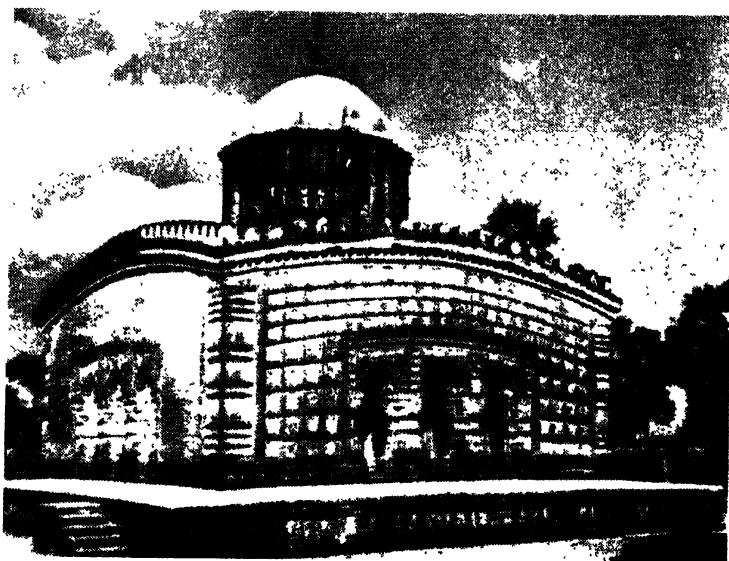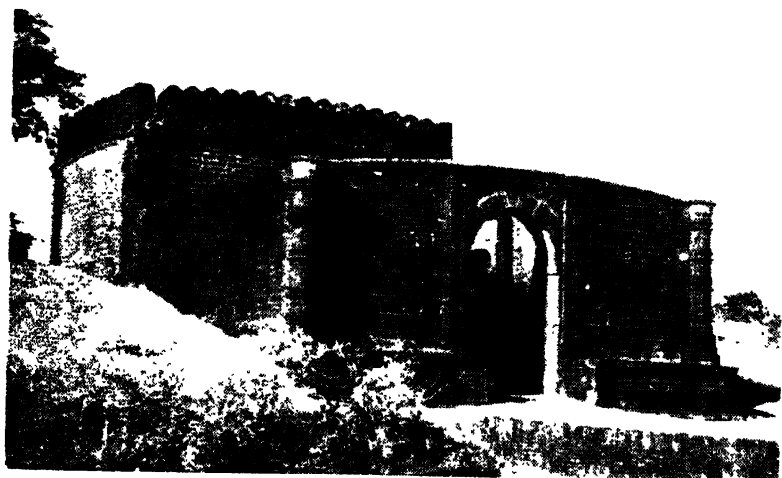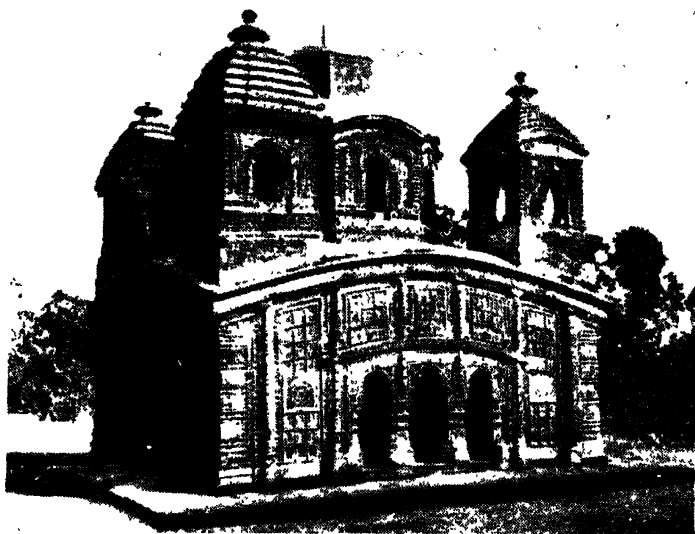
শ্যামরাই মন্দির
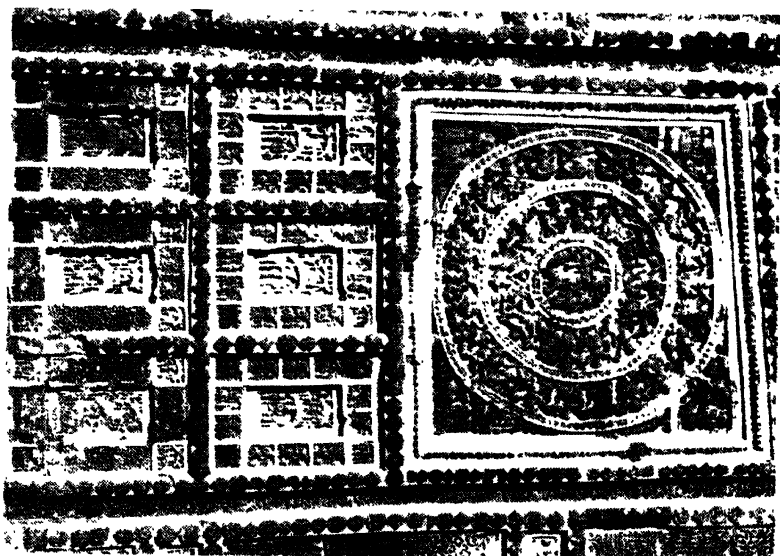
শ্যামরাই মন্দিরের রাসমণ্ডল

মদনগোপাল মন্দির

রাসমঞ্চ
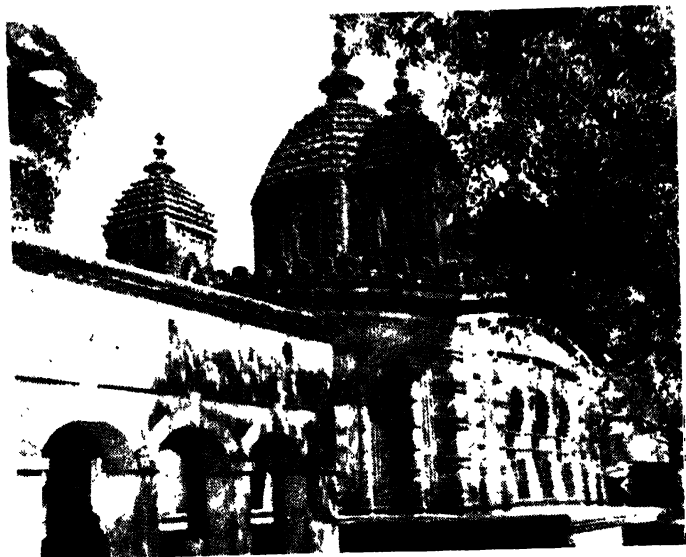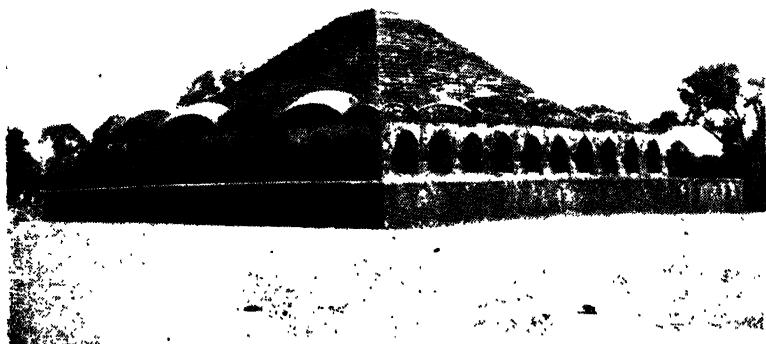
দলমাদল

পাথরের রথ

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিষ্ণুপুরের পরিচয় ও কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা।

মানব সভ্যতার আদিকাল হতে যুগ যুগান্ত ধরে এগিয়ে চলেছে মানবজাতির পতন আর অভ্যুদয়ের বিচিত্র ইতিহাস। তার মধ্যে যে জাতি যে রাজ্য বা যে ব্যক্তি অসাধারণ বলে গণ্য হয়েছে, সেই কালের শিলালিপিতে ইতিহাসের বুকে অমর হয়ে আছে।

সেইমত এক রাজ্য আর তার নরপতিদের বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী নিয়েই এই 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী' লিখিত।

সে রাজ্য বাংলার মুকুটমণি, বাঙ্গালী বীরের শৌর্য্য-বীর্য্যের লীলাভূমি, পূর্বভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মল্লভূম।

পূর্বে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, হুগলীর আরামবাগ, জাহানাবাদ হয়ে হাওড়া; পশ্চিমে ছোটনাগপুর; দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর, তমলুক ও উত্তরে দামোদর নদ-আসানসোল পর্যন্ত এই মল্লভূম রাজ্যের বিস্তৃতি। এই রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের নামেই এই রাজ্যের প্রসিদ্ধি।

বাংলায় প্রতাপাদিত্য, কেদাররায়, ঈশার্খা প্রভৃতি বহুবীরের অভ্যুত্থান হয়েছে। আর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের প্রায় সব কিছুর শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের তা হয়নি। দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরে সে তার অতুলনীয় ইতিহাস রচনা করে গেছে।

এর গৌরবময় ও সৌরভময় অতীত অন্বেষণ করলে দেখা যায়—শৌর্য্য, বীর্য্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নিয়মনিষ্ঠা, রাজ্যশাসন প্রণালী প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই বিষ্ণুপুর ছিল অসামান্য! সব কিছুই ছিল এর মানুষের কল্যাণকর উপাদানে ভরা। অতি অল্পসংখ্যক ইতিহাসেই এরূপ আদর্শময় ঘটনার এত অধিক সমাবেশ দেখা যায়। এমনকি এমন অতুলনীয় ঘটনা এতে দেখা যায় যা অন্যান্য ইতিহাসে বিরল।

যেমন, মহারাণী চন্দ্রপ্রভা—ইতিহাস প্রসিদ্ধা পতিঘাতিনী-সতীর দৃষ্টান্ত। পতির জন্য সতীর দেহত্যাগের কাহিনী, স্বামীর জন্য পত্নীর সর্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্ত পুরাণে দেখা যায়। নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য জহরব্রতের কাহিনীও ইতিহাসে

লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই বোধহয় প্রথম—পরার্থে, প্রজার কল্যাণের জন্য নারী যেখানে নিজের সর্বস্ব ধন স্বামী বলি দেবার পথ বেছে নিয়েছে; বধূর বেশে এগিয়ে গিয়েছে স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতার বাসর শয্যায়। সতীত্বের মহত্ত্বের এই অপূর্ব দৃষ্টান্তে বিষ্ণুপুর অতুলনীয়া! তার ধাত্রী বাংলা—তথা সমগ্র ভারতভূমি ধন্যা। এখানের নরপতিগণও ছিলেন পরার্থে আত্মনিবেদিত ধর্মপ্রাণ রাজা। এঁদের রাজ্য ছিল, রাজকীয় শক্তি সামর্থ্য প্রভূত পরিমাণে ছিল। যার জন্য মোগল, পাঠান, মারাঠা প্রভৃতি বহু পরাক্রান্ত শক্তিও তার গড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। ফিরে যেতে হয়েছে তাদের বিফল হয়ে পরাজয়ের কালিমা নিয়ে। কিন্তু তবুও ছিলনা তাঁদের রাজসিক দম্ভ, রাজকীয় বিলাস। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি না নিয়ে তাঁদের অর্জিত সম্পদ উৎসর্গ করে গেছেন তাঁরা প্রজার কল্যাণে। তাই অন্যান্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ্যের মত বিষ্ণুপুরের বুকে দেখা যায় না কোন জয়স্তম্ভ, রত্নমণ্ডিত রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় প্রমোদভবন প্রভৃতি রাজসিক বৈভব। অসংখ্য কারুকার্যপূর্ণ বিশাল দেবমন্দিরের কাছে দেখা যায় তাঁদের ত্যাগের, মহত্ত্বের নিদর্শন অতি সাধারণ বাসভবন।

তাঁদের শাসন পালনও ছিল সব কিছুই পক্ষপাতিত্ব শূন্য। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রজাই ছিল তাঁদের কাছে সমান। হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মত মুসলমান পীর ফকিরেরাও তাঁদের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত হতেন সমানভাবে। হিন্দুদের দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মত মুসলমানদের পীরোত্তর সম্পত্তিও তাঁরা দান করে গেছেন প্রচুর। বিষ্ণুপুর—তথা সমস্ত মল্লভূমের বুকে আজও দেখা যায় তার অসংখ্য নিদর্শন।

মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ চরিত্র। সেই চরিত্রকে গড়ে তুলে রাজ্যের নৈতিক মানকে উন্নত করবার জন্যও চেষ্টায় তাঁদের অন্ত ছিল না। তার জন্য রাজ্যময় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা বহু শিক্ষায়তন, টোল, মক্তব। ধর্মের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন সমস্ত রাজ্য। তার চারদিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেবমন্দির, দেববিগ্রহ, ধর্মশালা প্রভৃতি। যার ফলে প্রজাদের নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠেছিল অমরার অধিবাসীদের মত। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই—দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীর প্রশংসা ও সারা মল্লভূমে প্রজাদের নিজস্ব দেবালয়, জলাশয়, সদাব্রত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎচেষ্টার ভেতর দিয়ে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের নরপতিদের চিত্র ও তাঁদের পারিবারিক বিবরণ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকার জন্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রতিষ্ঠা থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে এর ধ্বংসকাল পর্যন্ত

ধারাবাহিক ভাবে এর বিস্তৃত ইতিহাস ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। তাই হাণ্টার, ওল্ডহ্যাম, ওম্যালী, রামানুজকর, অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রভৃতি দেশী-বিদেশী যত ব্যক্তি বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক কাহিনীর নাম দিয়ে যে জিনিষ পরিবেশন করেছেন, তা তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ও ভ্রান্তিপূর্ণ হয়েছে। সাধারণের অবগতির জন্য তার কয়েকটা এখানে আমি উল্লেখ করলাম। তার মধ্যে 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, আই-এ-এস মহাশয় উক্তগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভৌগলিক বিবরণের মধ্যে মল্লরাজ বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস নাম দিয়ে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর যে চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, প্রথমে সেই কথাই এখানে আমি উল্লেখ করলাম।

এক : বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিরাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে।

উক্ত গ্রন্থের আঠারো পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় আদিবাসী সমাজেরই কোন একজন প্রতাপশালী নেতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' বঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলের বাগ্দী, বাউরী, মাল, ধীবর, ডোম প্রভৃতিরা চিরকালই রণনিপুণ। এদের লাঠি, সড়কীর প্রতাপের কাছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষও হার মেনেছে। এবং তাদেরই কোন সর্দার উক্ত সামরিক সম্প্রদায়-গুলিকে সংগঠিত করে হয়তো এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই বংশধর বিষ্ণুপুর রাজপরিবার।

অর্থাৎ তাঁর মতে বিষ্ণুপুর রাজবংশ উক্ত বাগ্দী, বাউরী, মাল, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি হতে উদ্ভূত।

যেখানের ইতিহাস সেখানে এসে তিনি কি ভাবে, কতটুকু অনুসন্ধান করেছেন জানিনে। তবে উক্ত পুস্তকে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে হাণ্টার, ওম্যালী, ওল্ডহ্যাম প্রভৃতি বিদেশীদের উক্তিরই অধিক সমাবেশ এবং তাঁদের অভিমতকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া দেখে মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টি দিয়েই তিনি বিষ্ণুপুরকে দেখেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর লিখিত 'বৃহৎবঙ্গে'র দ্বিতীয় খণ্ডের 'শিক্ষা-দীক্ষার কথা' প্রবন্ধের ৯০৬ পাতায় লিখেছেন, 'অধুনা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এদেশের কোন ঐতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ লিখিতে যাইয়া কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ তাঁহাদের চারদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিবার শক্তি তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা কোন সাহেব দেখেন নাই, বা বলেন নাই ; এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে

দেখিলেও তাহা বলিবার মত সাহস তাঁহাদের নাই।' আর সাহেবেরা যে ভুল করেন, তার উদাহরণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন, 'টলেমি যে ভৌগলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, তদুক্ত 'সলসোম্বু', 'সাবার', 'দাসরা', 'বেলিয়াজুড়ম', এই কয়টি নগর খাস্‌বাংলার। যে সকল সাহেব সেই ভৌগলিক বৃত্তান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা খুব সম্ভব বাংলাদেশের অধুনা নগন্যত্ব প্রাপ্ত ঐ কয়টি জায়গার অস্তিত্ব জানিতেন না, সুতরাং উহাদের স্থান নির্ণয় করিতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। আর তার প্রমাণ স্বরূপ ঐ সমস্ত জায়গা যে খাস্‌বাংলা দেশের তা তিনি আলোচনা করেছেন।'

আমার মনে হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। সাহেবদের উক্তির অনুসরণ করেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি রাজার সম্বন্ধে ঐমত ভুল মন্তব্য করা হয়েছে।

কিন্তু তাঁরা বিদেশী বিজাতি। তাঁদের ভাষা, সমাজ, ধর্ম সব আলাদা এবং আমাদের সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তার ওপর একটা দেশ, বা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হলে সেখানের সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে যেরূপ ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন; তাঁরা যাই বলুন, সেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অথচ যেখানের ইতিহাস, সেখানের রীতি, নীতি, সমাজ, ধর্মকে বাদ দিলে ইতিহাসের আসল বস্তুই বাদ পড়ে যায়। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

কারণ তাঁরা আমাদের দেশীয় লোক নন। আর সেকালে ভাল ইংরেজি জানা ব্যক্তি এখানে খুব কমই ছিলেন। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুর রাজদরবারে তখন ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না বললেও চলে। তাই সেখান থেকে বিষ্ণুপুর ইতিহাস সম্বন্ধে ভালভাবে কোন কিছু বোঝান সম্ভব হয়নি। তার ওপর তাঁদের পরিবাররা বিবরণ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকার জন্য সে বিষয়ে তাঁরা আগ্রহীও হননি।

আর আমাদের সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের অনভিজ্ঞতার জন্য সেদিক দিয়ে বিচার করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বিষ্ণুপুর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের মনে ঐমত ভ্রান্ত ধারণা স্থান পেয়েছে এবং সব চাইতে সর্বনাশ হয়েছে! আজ পর্যন্ত দেশী-বিদেশী যত ব্যক্তি বিষ্ণুপুর ইতিহাস সম্বন্ধে ঠিক-বেঠিক যে কাহিনী লিখেছেন, নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য তাকেই বিষ্ণুপুরের

রাজাদের কুলপঞ্জী বলে প্রচার করেছেন। আর তাই তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ভুল, ত্রুটিপূর্ণ কাহিনী জনসাধারণের মনে বিশ্বাসের পরিবর্তে এনেছে বিভ্রান্তি। কিন্তু আমাদের এখানের ধর্ম, রীতি, নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন আসল সত্য কি।

প্রথমত—বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ যদি ঐমত বাগ্দী, বাউরী, মাল প্রভৃতি তথা কথিত নিম্নবর্ণের জাতি হতেন, তাহলে বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুল পুরোহিত মহাপাত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে, কিছুতেই ঐমত নিম্ন-বর্ণের জাতির পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতেন না। গ্রহণ করলে, সেকালের ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ তা মেনে নিতেন না।

দ্বিতীয়ত—কেহ যদি বলেন, নিম্নবর্ণের জাতি হলেও তিনি অতি দোর্দণ্ড-প্রতাপ ছিলেন, জোর করে তিনি ঐ সৎ ব্রাহ্মণকে তাঁর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করাতে বাধ্য করেছিলেন এবং জোর করেই তিনি সেকালের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকে তা মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। এক কথায় যাকে বলা যায় অসম্ভব। কারণ রাজা, মহারাজা দূরের কথা, সেকালের সম্রাটেরা পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা এবং ভয় করতেন।

তার ওপর সারা ভারতে তখন হিন্দুর একচ্ছত্র আধিপত্য। আর আদি-মল্লের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বড় রাজা তখন ভারতবর্ষের বহুস্থানে ছিলেন। আর তাঁরাই ছিলেন হিন্দুজাতির সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির রক্ষাকর্তা। তাই জোর করে কোন ধর্ম বিরুদ্ধ বা অসামাজিক আচরণ করা কারও পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়ত—তাই যদি কেহ ধারণা করে থাকেন, জোর করেই তিনি সব কিছু করেছিলেন, তাহলে সেখানেইত উচ্চবর্ণের অধিকার অর্জন করে উচ্চ জাতিতে তিনি পরিণত হয়েছিলেন। তাহলে অলৌকিক উপায়ে স্থানীয় বাগ্দী রাজাদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটিয়ে, সেখানে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় বংশের কষ্টকল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উক্ত গ্রন্থে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

চতুর্থত—তিনি যদি সব কিছু জোর করেই করে থাকেন, তাহলে লাউ-গ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে যে 'বাগ্দী রাজা' বলে থাকে বলা হয়েছে, জোর করে তাও তিনি বন্ধ করে দিতে পারতেন।

কিন্তু তা নয়। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তিনি মা হারা হয়ে, তাঁর পালন-

কারিণী বাগ্দী মায়ের কোলে, বাগ্দী জাতির গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে কেহ কেহ তাঁকে 'বাগ্দী রাজা' বলে থাকেন।

কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঐমত বাগ্দী, বাউরী, মাল প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি হতে উদ্ভব হলে, রাজপুত জাতি বা রাজপুত রাজাদের মধ্যে তা গোপন থাকত না। আর তাহলে ময়ূরভঞ্জ, মহেশপুর, বরাহভূম প্রভৃতির নামকরা রাজপুত রাজারাও তাঁদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না, বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতেন না। মহারাজ বীরসিংহদেব বরাহভূমের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, মহারাজ চৈতন্যসিংহ-দেব ময়ূরভঞ্জের রাজদুহিতাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর গোড়ার দিকেও দেখা যায়, দ্বিতীয় রাজা জয়মল্ল চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দীনুসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তৃতীয় রাজা বেণুমল্ল মতিহার সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন প্রভৃতি।

পঞ্চমত—বিষ্ণুপুর রাজবংশ, রাজপরিবার ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের রাজপুত আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি এখনও সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। কেহ যদি বলেন হাজার বারশ বৎসর ধরে এসবই তাঁদের পরিকল্পিত ব্যাপার, তাহলে বিষ্ণুপুর রাজবংশের ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরুষ প্রভৃতির নাম ধরে তাঁদের যে অনার্য জাতি বলে মন্তব্য করা হয়েছে, পরিকল্পনা করে সে নাম বদলে অন্য ভাল নাম তাঁরা দিতে পারতেন। আর নাম ধরে জাতি নিরূপণ করাও সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের এখানেই বহু হিন্দুর নাম এবং উপাধি মুসলমানসূচক আছে। তাহলে তাদের কি আমরা মুসলমান বলব? তা নয়। অনেকের অনেক কারণবশত খাপছাড়া নাম থাকে। আসল সত্য হচ্ছে বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ আদিমল্ল রাজপুত সন্তান। তাই, দেখতে তিনি খুবই প্রিয়দর্শন ছিলেন। আর অতি কিশোর বয়স হতেই তার রাজপুত-সুলভ স্বভাব পরিস্ফুট হয়। বিষ্ণুপুরের মহাপাত্রবংশের আদি পুরুষ, তাঁর প্রতিপালক পঞ্চানন ঘোষালের গোচারণ করতে গিয়ে তাঁর সহচর আরও সব রাখাল বালকদের নিয়ে সেখানে তিনি শরীরচর্চা ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং সেই বিদ্যায় আশ্চর্যজনকভাবে সফলতাও অর্জন করেন। যার জন্য দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাতি সাঁওতালেরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলে পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার জন্য সাঁওতালদের নিয়ে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্রপূজা বা ইন্দপর্ব, বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবারের এক বিশিষ্ট উৎসব। এবং তাদের নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপরোক্ত

কাহিনী যে সত্যতার প্রমাণ, ঐ ইন্দ্রপূজা বা ইন্দপর্ব উৎসবে সমবেত সাঁওতালদের কাছ থেকে রাজা হিসেবে ভেট্ নেওয়ার পরিবর্তে, তাদের সাহায্যে মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের সর্দারদের হলদে রংয়ের পাগড়ী উপহার দেওয়ার প্রথা। আর ঐ ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে আদিমল্লের মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন থেকে মল্লাব্দ আরম্ভ হয়েছিল বলে, সেই দিনে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত মল্লাব্দ ঘোষণা করা হত। এখানের চলতি ভাষায় তাকে বলা হয় 'সনপেটা'। এখানের পণ্ডিত উপাধিধারী বুড়োধর্ম-রাজদেবতার পূজারী কর্মকার মহাশয়েরা ঘোষণা করতেন উক্ত অব্দ। আমি নিজে তা দেখেছি।

সেইজন্য সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় আদিবাসী সমাজের কোন একজন প্রতাপশালী নেতা, বাগ্দী, বাউরী, মাল, ধীবর, ডোম প্রভৃতি রণনিপুণ সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে তাদের নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে—তা "সম্পূর্ণ অবাস্তব"। অন্যান্য দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ভাণ্ডারকে যেভাবে তাঁরা পূর্ণ করে গেছেন এবং ধর্ম, দান, সুশিক্ষা, সুবিচার, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাতিত্ব শূন্যভাবে প্রজাপালন প্রভৃতি যে মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন, সেও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনো গৌরবময় উত্তরাধিকার ব্যতীত সম্ভব হয় না।

মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, বীরহাম্বির বীরভূমে শিকার করতে গিয়ে উক্ত বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। কিন্তু তা নয়। পরমশাক্ত, প্রচণ্ডযোদ্ধা বীরহাম্বিরের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম জাগে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর। কিন্তু তখন তিনি প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত। মনে-প্রাণে সম্পূর্ণভাবে অহিংসা ব্রতধারী। শিকার করা দূরে থাক, অতি সামান্যতম হিংসাও তখন তাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু। সেই সময় বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শন করে ফেরবার পথে বীরভূমের বৃষভানুপুর গ্রাম হতে উক্ত মদনমোহন বিগ্রহ তিনি বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের যমুনা, কালিন্দী প্রভৃতি সাতটি বাঁধ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, বিষ্ণুপুরের জলকষ্ট নিবারণের জন্য মহারাজ বীরসিংহ ঐ সাতটি বাঁধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাও ঠিক নয়। মহারাজ বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর বৃন্দাবনধাম থেকে ফিরে এসে, বিষ্ণুপুরকে বৃন্দাবনের অনুকরণে

তৈরী করবার সময় যমুনা ও কালিন্দী বাঁধ তৈরী করিয়েছিলেন। লাল বাঁধ তৈরী হয়েছিল দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের সময়। আর যতদূর জানা যায়, বীরসিংহদেবের সময় একটি মাত্র বাঁধ তৈরী হয়েছিল। নাম ছিল তখন তার বীর বাঁধ। পরে তার জলে অতিরিক্ত পোকা হওয়ার জন্য নাম হয়েছে তার পোকা বাঁধ।

বিষ্ণুপুরের আদিরাজা আদিমল্লের রাজ্যাভিষেকের কাল ৬৯৪/৯৫ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তিনি লিখেছেন, "আদিমল্লের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল ৬৯৫ বা ৬৯৬ খৃষ্টাব্দ। আর তাঁর রাজত্বকাল মাত্র ১৬ বৎসরের স্থলে তিনি লিখেছেন ৩৩ বৎসর কাল। কিন্তু ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অভিষেক ও ৭১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ৭১০ খৃষ্টাব্দে মল্লভূমের দ্বিতীয় অধীশ্বর জয়মল্লের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। তার প্রমাণ সরকার বাহাদুরের ঘরে দেওয়া তাঁদের নামের তালিকা।

দুই: মল্লভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি-পুরুষ আদিমল্লের পিতামাতার আগমন সম্বন্ধে।

কেহ বলেন—শ্রীবৃন্দাবনধামের নিকটবর্তী জয়নগর থেকে তাঁরা এসেছিলেন। আর কেহ বলেন, রাজপুতানার জয়পুর থেকে তাঁদের আগমন। কিন্তু শেষোক্ত রাজপুতানা থেকে আগমনই বিষ্ণুপুর রাজবংশ, রাজপরিবার ও বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকর্তৃক সমর্থিত। তার আর এক প্রমাণ, অতি আত্মীয়-বৎসল বলে খ্যাত, মল্লভূমের দ্বিতীয় অধীশ্বর জয়মল্ল, নিজের বংশ-পরিচয় অবগত হয়ে, রাজস্থান থেকে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের আনয়ন করে, তাঁদের বাসের জন্য স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর পূর্বপুরুষদের অধিষ্ঠান ভূমির নামে তার নাম দেন জয়নগর নয়, জয়পুর বলে। সেই জয়পুর গ্রাম এখনও বর্তমান। বিষ্ণুপুর নগর হতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বে হাওড়া রোডের পাশে তা অবস্থিত।

এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত আখ্যাধারীর বক্তব্য, বর্তমানে তাঁদের কোন অস্তিত্ব সেখানে যখন নেই তখন কোনকালেই তা ছিল না। কিন্তু অতীতের অনেক কিছুইত বর্তমানে নেই। যেমন—মল্লভূম রাজ্যরক্ষার জন্য করাসুরগড়, অসুরগড়, শ্যামসুন্দরগড়, হোমগড়, ঐ জয়পুরেরই নিকটবর্তী কুম্ভস্থলদুর্গ যা জয়পুরের আরও অনেক পরবর্তীকালের। তার কিছুই নেই। বিষ্ণুপুরেরও আমারই দেখা কত মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়ে, তার ইট পাথর পর্যন্ত বিক্রীত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার এবং আরও অনেকের দেখা পরিখা ভরাট করে সেখানে বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজ, কে জি

ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্সটিটিউট প্রভৃতি হয়েছে। তাহলে পরিখা কি সেখানে ছিল না? তাই সব কিছু বেশ ভালভাবে বিচার করে দেখে, সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করতে তাঁদের অনুরোধ করি।

তিন : আদিমল্লের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে।

ইংরেজীতে লেখা 'হিষ্ট্রি অফ বিষ্ণুপুর রাজ' গ্রন্থে আছে—আদিমল্লের তীর্থযাত্রী পিতা, প্রসব যন্ত্রণায় কাতর তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে লাউগ্রামের মনোহর পঞ্চানন ও ভগীরথভঞ্জ নামে দুজন অপরিচিত বাঙ্গালীর কাছে রেখে শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। আর ফিরে আসেন নি। কিন্তু যাঁরা তাঁদের ভাষা পর্যন্ত জানেন না, সেই আসন্নপ্রসবা অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রতিকারের জন্য কোন কথা বললেও যাঁরা তা বুঝতে বা তাঁদের নিজের ভাষা তাঁকে বোঝাতে পারবেন না—সেইমত ব্যক্তিদের কাছে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর নিজের স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার অর্থ তাকে হত্যা করে রেখে যাওয়ারই সমতুল্য। আর তীর্থ দর্শনের যত আগ্রহই থাকনা কেন, যে কোন মানুষের পক্ষে ঐমত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সম্ভব হতে পারে না। আর অন্য দিক দিয়েও, ঐমত অবস্থার ভিন্ন ভাষাবলম্বী কোন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের ভার নেওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

দ্বিতীয় 'মল্লভূম কাহিনী' নামক গ্রন্থে আছে—তীর্থযাত্রী একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ যাচ্ছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। আর স্ত্রী ছিলেন আসন্নপ্রসবা। লাউগ্রামে এসে স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করলেন। আঁতুড়ের সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে নিয়ে অত দূরের তীর্থে যাওয়া অসম্ভব। তাই স্ত্রী-পুত্রকে ঐ গ্রামেরই এক বাগ্দীর বাড়ীতে রেখে, পুরুষটি একাই পুরীর পথে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও অবাস্তবতা। তখনকার দিনে হিন্দির এরূপ ব্যাপক প্রচলন ছিল না, যার জন্য বাগ্দীর মত অতি অনগ্রসর জাতি তার ভাষা বুঝে তাদের পালন করতে পারবে। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেই প্রবল জাতি বিচারের দিনে, গ্রামে আরও সব সংজাতি থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের জাতি ক্ষত্রিয় হয়ে বাগ্দীর মত নিম্নবর্ণের জাতির গৃহে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে রেখে যাওয়াও সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব।

তৃতীয়—লাউগ্রামের অরণ্যপথ দিয়ে যাবার সময় আদিমল্লের আসন্নপ্রসবা মা সেই বনের মাঝে তাকে প্রসব করে মারা যান, তার পিতা পতিত হন এক মর্মান্তিক অবস্থায়। একদিকে সদ্য-প্রসূত সন্তান, অন্যদিকে প্রাণ হতেও প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃতদেহ। কি করবেন, কাকে নিয়ে কোথায় যাবেন। শোকে,

দুঃখে পাগলের মত হয়ে পড়েন তিনি। সেই বিহ্বল অবস্থায় কিছু স্থির করতে না পেরে পরিচয় লিপি, নিজের মন্ত্রঃপূত তরবারি প্রভৃতি সবকিছুসহ শিশুকে ভগবানের ওপর সঁপে দিয়ে, সেই বনের মাঝের এক গাছের গোড়ায় তাকে শুইয়ে রেখে, তাঁর গন্তব্য স্থান শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে তিনি চলে যান। আর ফিরে আসেননি। তারপর এক বাগ্দীর মেয়ে কাঠ কুড়োবার জন্য সেখানে এসে শিশুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্তানের মত পালন করতে থাকে। সেই সূত্রে বিষ্ণুপুরের রাজাদের কেহ কেহ বাগ্দী রাজা বলে থাকেন।

চার: আদিমল্লের আদি নাম সম্বন্ধে।

আদিমল্লের আদি নাম কেহ বলেন গোপাল, কেহ বলেন কার্তিক চন্দ্র, কেহ বলেন রঘুনাথ। আবার 'রঙ্গাবতী' নাটক প্রণেতা বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁর উক্ত নাটকে বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি রাজার নাম ব্যবহার করেছেন বীরমল্ল বলে। কিন্তু রঘুনাথও রাজ্যলাভের পর তাঁর আদিমল্ল নামই বিষ্ণুপুর রাজবংশ, রাজপরিবার ও বিষ্ণুপুর রাজবংশের পুরোহিত ও তাঁর পালনকর্তা মহাপাত্রবংশ কর্তৃক সমর্থিত। তবে তাঁরা বলেন, মহাপাত্র-বংশের আদি-পুরুষ তাঁর পালনকর্তা পঞ্চানন ঘোষাল, অত্যধিক স্নেহের বশে মাঝে মাঝে তাঁকে গোপাল বলেও ডাকতেন।

পাঁচ: আদিমল্লের পালনকর্তা বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুল-পুরোহিত মহাপাত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম।

তাঁর নাম কেহ বলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, কেহ বলেন মনোহর পঞ্চানন। কিন্তু পঞ্চানন ঘোষাল নামই মহাপাত্রবংশ কর্তৃক সমর্থিত।

ছয়: বিষ্ণুপুর ইতিহাসের অলৌকিক জাতীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি-পুরুষ রঘুনাথ বা আদিমল্লের মা যখন বনের মাঝে তাঁকে প্রসব করে মারা যান, তাঁর বিহ্বল পিতা কোন উপায় স্থির করতে না পেরে তাঁকে সেই বনের মাঝেই শুইয়ে রেখে শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে চলে যান; রাত্রিকালে হিংস্র শ্বাপদেরা এসে তাঁর মায়ের মৃতদেহ খেয়ে ফেলে! কিন্তু শিশুর কিছু ক্ষতি হয় না। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচে থাকে। সেই ঘটনাকে অলৌকিক আখ্যা দিয়ে কেহ কেহ তাকে অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত হলেও, সত্যের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমার নিজের জীবনেই একাধিকবার আমি দেখেছি, অতি দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে রাতের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া শিশুকে দিনের আলোয় অক্ষত অবস্থায় কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সেইজন্য

আদিমল্লের জন্মকালের উক্ত ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বা অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আর আমার বিশ্বাস যে-কোন চিন্তাশীল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

উক্ত আদিমল্লেরই জীবনের আর এক ঘটনা—কিশোর বয়সে গোচারণ করতে গিয়ে একদিন বনের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। সেই সময় প্রকাণ্ড এক বুনো সাপ, যে-কোন কারণবশতই হোক, তাঁর কাছে এসে এমনভাবে তার বিরাট ফণা তুলে দাঁড়ায় যার জন্য তাঁর মুখে এসে-পড়া সূর্যের কিরণ সম্পূর্ণভাবে আড়াল হয়ে যায়। এবং সেই অবস্থায় তাঁর পালনকর্তা ব্রাহ্মণ তাঁর খোঁজে গিয়ে সেইদৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যান। তাঁর মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়—ভবিষ্যতে সে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে। কিন্তু অনেকে ঐ ঘটনাকে সাজান ঘটনা বলে সন্দেহ করে থাকেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ এই ঘটনা যে সাজান নয়—সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ—তাঁর নিদ্রিত পিতা আদি-মল্লের মুখ সূর্য কিরণ থেকে আড়াল করবার জন্য বন্য ভুজঙ্গ যেখানে ফণা বিস্তার করেছিল, আদিমল্লের পুত্র মল্লভূমের দ্বিতীয় অধীশ্বর জয়মল্ল, দণ্ডেশ্বরী নামে সেখানে এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই দণ্ডেশ্বরী দেবী সেখানে বর্তমান।

আর এক প্রমাণ, বনের মাঝের সেই দৃশ্য দেখার পর তাঁর প্রতিপালক ব্রাহ্মণ তাঁকে কোন প্রকার উচ্ছিষ্টাদি না দিয়ে বা কোন প্রকার অবহেলা না করে তাঁকে পরমযত্নে পালন করেন। আর ভবিষ্যতে সে রাজা হলে তাঁকে তাঁর পৌরহিত্যে বরণ করবার শপথ করিয়ে নেন।

আর এক ঘটনা। ৬৯৪,৯৫ খৃষ্টাব্দে আদিমল্লের রাজ্যাভিষেকের কাল হওয়ার জন্যে সেই সূত্র নিয়ে কেহ কেহ তাঁর রাজপুত জাতি হতে উদ্ভব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, তার পরবর্তীকালে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে রাজপুত জাতিকে একটি পৃথক জাতিরূপে চেনা যায়। অর্থাৎ তাঁদের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে গুর্জর, প্রতিহার প্রভৃতি বহিরাগত সমরকুশল জাতির আগমন ও তাঁদের সংমিশ্রণে রাজপুতেরা যখন সামরিক জাতিতে পরিণত হয়ে অষ্টম শতাব্দী হতে যখন সামরিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন, তখনই তাঁরা রাজপুত নামে অভিহিত হন।

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অভিধানে পর্যন্ত রাজপুত শব্দের অর্থ বলা হয়েছে রাজপুতানার অধিবাসী। আর বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সঙ্গে রাজপুত জাতির যোদ্ধা প্রসিদ্ধির কোন সম্পর্কই নেই। কারণ —বিষ্ণুপুর রাজ-

বংশের আদি-পুরুষ যোদ্ধার জাতি হিসেবে এখানে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি প্রাচীন রাজপুতানার অধিবাসী এক তীর্থযাত্রীর সন্তান। তাই বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাজপুতানার প্রাচীনত্ব নিয়ে। আর সেই প্রাচীনত্ব যে তার কত গভীর, তা যে কোন ব্যক্তি ভারতের ইতিহাস অন্বেষণ করলেই বুঝতে পারবেন। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে, অর্থাৎ বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্বে মগধের সিংহাসনে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে রাজপুতানা, চিতোর প্রভৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ বেশ ভালভাবে পাওয়া যায়। আর বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ ভারতীয় সভ্যতার আওতায় পরিপুষ্ট, ভারতের তীর্থ প্রভৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীল, সেই রাজপুতানার আদি অধিবাসীর সন্তান। গুর্জর, প্রতিহার প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রিতদের বংশজাত নন। এবং তাঁরা যে রাজপুত, রাজপুতনা থেকে এসেছেন, তার প্রমাণ এই বর্তমানকালেও প্রচুর।

রাজপুতদের মধ্যে শিশোদীয়, চৌহান, রাঠোর, চান্দেল, প্রমার প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বর্তমান। বিষ্ণুপুর মূল রাজবংশের অধিপতিদের রাজত্বকালে তাঁদের অনেক গোষ্ঠী এখানে এসেছেন, এঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছেন। তার প্রমাণ, মহারাণা প্রতাপ সিংহের শিশোদীয় গোষ্ঠীর সন্তান বর্তমান রাজা বাহাদুর মহামান্য কালীপদ সিংহঠাকুর, বিষ্ণুপুর রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দেবব্রত সিংহঠাকুর। এখনও এঁরা রাজস্থানে উদয়পুরের ঠাকুর সাহেব বলে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এঁদের পরস্পর গোষ্ঠির সংযোগ সাধনকারী যে ভাট রাজস্থান থেকে এখানে আসতেন, তাঁদের কাছেও এঁরা ঐ নামে পরিচিত। এঁরা মহারাণা প্রতাপসিংহের শিশোদীয় গোষ্ঠীভুক্ত। এঁদের গোত্র বিজয়পাণি। বিষ্ণুপুর মূল রাজবংশ চৌহান। এঁদের গোত্র রাজর্ষি। তারপর বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান ময়নাপুর রঘুনাথপুরে রাঠোর, দাঁতনে মেদিনীপুরে চান্দেল, হরেকৃষ্ণপুরে প্রমার এবং পুড়া কোঁদায় শিশোদীয় গোষ্ঠী বর্তমান। এবং এখনও এঁরা রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিষ্ণুপুর মূল রাজবংশের সন্তান, বিষ্ণুপুর কেল্লার অধিবাসী মাননীয় বীরেন্দ্রসিংহদেব আত্মীয়তার সূত্র নিয়ে এখনও রাজস্থান যাতায়াত করেন। তাঁর মেশোমশায় রায়বাহাদুর মাননীয় উদিতনারায়ণ সিং শকরপুরা ষ্টেট। তাঁর কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়েছে রাজস্থানের করৌলি ষ্টেটের ঠাকুরনারায়ণ সিংয়ের পুত্র, মুনেন্দ্রনারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে।

তাঁর দুই কন্যা অর্থাৎ রায়বাহাদুর উদিতনারায়ণ সিংয়ের দৌহিত্রী

আশালতা দেবী ও মালতীদেবীর বিবাহ হয়েছে রাজস্থানের কাকারবা ষ্টেট উদয়পুর ও রাতলাস ষ্টেটে। আমার এইসব উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যে কোন সুধী বিষ্ণুপুর কেল্লার অধিবাসী মাননীয় বীরেন্দ্রসিংহদেব, রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় দেবব্রত সিংহঠাকুর ও মহামান্য বিষ্ণুপুর রাজ কালীপদ সিংহঠাকুর মহাশয়ের কাছে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

তারপর দেবকীর্তি। দেবভূমি বিষ্ণুপুর যাকে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের মত মহাপুরুষ পর্যন্ত গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুর অতি পবিত্র স্থান বলে অভিহিত করেছেন। সেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গে দৈবশক্তির কীর্তি এমন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত যে তাকে বাদ দিলে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস শুধু শ্রীহীন নয়, আমার মনে হয় অর্থহীনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তবুও এই প্রগতিবাদী প্রচণ্ড বাস্তববাদের যুগে আজকের দিনের অতিরিক্ত বাস্তববাদীরা তাকে হয়ত অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তা অনুচিত। আমাদের এই সাধারণ জগতের ওপরে, আরও যে এক অগাধ শক্তিসম্পন্ন জগৎ আছে, যাকে আমরা অদৃশ্য শক্তি বা দৈবশক্তি বলে থাকি, সাধনশক্তি দিয়ে যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়, যার জন্য কত রাজা, মহারাজা, রাজার দুলাল, কত রাজকল্প ব্যক্তি, তাঁদের অগাধ সুখ, অপরিমিত ঐশ্বর্যের মোহ পরিত্যাগ করে, সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন, তা যে কত বাস্তব। যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি একটুখানি চিন্তা করে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন।

তবে সেই দৈবশক্তির ওপর বিশ্বাস নিয়ে আমার জন্য সেই সম্বন্ধে অনেক অলীক উপাখ্যানও যে রচিত হয়েছে, তা মিথ্যে নয়। এবং ঐ সম্বন্ধে কিংবদন্তীও অনেক আছে। কিন্তু তার মধ্যে সবই যে মিথ্যা, তাও সত্য নয়। বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ীদেবীর সম্পর্কিত বিষয়। তাঁর এমন সব ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যার জন্য মনের ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে, মৃন্ময়ীদেবীর ঐ অধিষ্ঠান ভূমি কোন মহাসাধকের আশ্রমভূমি। কোন দূর অতীতে তিনি তাঁর সাধন শক্তি দিয়ে ঐ মহাশক্তিকে ওখানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তারপর কতকাল গত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর বোধনের দিন থেকে মহিমাময়ী মা অচলা হয়ে ওখানে বিরাজ করছেন। আর অতীতে মৃন্ময়ীমাকে ওখানে যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তার নিদর্শন মহারাজ জগৎমল্লকে উনি যে প্রত্যাদেশ করেছিলেন, 'ওখানের মাটি খুঁড়লে আমার মুখের এক ক্ষুদ্র আকৃতি পাবি,' যে মুখ আজও মৃন্ময়ীদেবীর বক্ষের মাঝে বিরাজিত, সেই মুখই অতীতের প্রতিষ্ঠিত মূর্তির অংশ বিশেষ।

তারপর দৈবশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কত প্রমাণ রয়েছে। যুগ যুগান্ত ধরে খ্যাত-অখ্যাত, কত সাধক-মহাসাধক, সর্বশক্তির আধার সেই মহাশক্তির কৃপায় সিদ্ধিলাভ করে কত দুঃসাধ্য সাধন করে গেছেন। বিশ্ববিশ্রুত সাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই বিষ্ণুপুরেই একদিন ভাব সমাধিতে মৃন্ময়ীদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যথাস্থানে তার বিবরণ দেওয়া আছে। তিনি ও তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ সেই মহাশক্তির আরাধনা করে তাঁরই কৃপায় সারা বিশ্বভরে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করে গেছেন। যার ফলে অতি বাস্তববাদী পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা পর্যন্ত আজও তাঁদের কল্যাণ মন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। সে ত অলীক নয়, অবাস্তব নয়। চন্দ্র-সূর্যের মতই সত্য।

কিন্তু আজ আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি সেই মহান সত্যকে ভুলতে বসেছেন। কিন্তু আমি তা পারিনি। তার উপরে উল্লিখিত ঐ সমস্ত কথা আমি বললাম।

আর বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও অভিমত দেখেছি, তাঁরা বলেন ইতিহাস বড় নীরস। আমি তাই এই গ্রন্থ বিষ্ণুপুরের প্রামাণ্য ইতিহাস হওয়া সত্ত্বেও, ইতিহাসের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে না গিয়ে, 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী' নাম দিয়ে আমার যথাসাধ্য এই গ্রন্থকে কাহিনীর মত সুখ পাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি।

সাত : রাজধানী বিষ্ণুপুর ও সুপ্রসিদ্ধ মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠা।

কেহ বলেন আদি রাজা আদিমল্লই প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঊনবিংশ রাজা জগৎমল্ল কর্তৃক বিষ্ণুপুর নগর ও মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার তথ্য ও জনশ্রুতিই প্রবল এবং নির্ভুল। প্রতিষ্ঠার কাল ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ, ৩০৩ মল্লাব্দ, বাংলা ৪০৪ সাল।

আট : আদিরাজা আদিমল্লের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল।

কেহ বলেন ৬৯৪/৯৫ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১০১ সাল। কেহ বলেন ৭৯৫ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১২২ সাল। কিন্তু ৬৯৪/৯৫ খৃষ্টাব্দ ও বাংলা ১০১ সালই বিষ্ণুপুর রাজবংশের নিজস্ব অব্দ মল্লাব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভুল।

নয় : আদিমল্লের রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

কেহ বলেন লাউগ্রামের রাজার মৃত্যুর পর তার পুত্রেরা অকর্মণ্য থাকায় রাজহস্তী রাজা নির্বাচনের জন্য, রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করবার সময় রঘুনাথকে পিঠে তুলে নিয়ে গিয়ে লাউগ্রামের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। আর সেখানের অমাত্য ও প্রজাগণ তাকে রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। হাণ্টার প্রভৃতি সাহেবদের সংগৃহীত বিবরণীতেই ঐ জাতীয় কাহিনীর প্রাধান্য বেশী।

কিন্তু যিনি যাই বলুন, অসাধারণ অধ্যবসায়, আদর্শ নিষ্ঠা প্রভৃতি সৎগুণই তাঁর রাজ্য লাভের প্রধান কারণ। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে তাঁর সাহায্যকারী সাঁওতালদের নিয়ে ইন্দ পর্ব অনুষ্ঠান। রাজ্যে আরও বহু জাতির মানুষ থাকা সত্ত্বেও, ঐজন্যই তাদের তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে গেছেন।

দশ : বিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ আনয়ন সম্বন্ধে।

কেহ বলেন ঊনপঞ্চাশৎ নরপতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরহাম্বির মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই কথাই সত্য। কিন্তু 'মল্লভূম কাহিনী'তে আছে, খুব সম্ভব দুর্জনসিংহদেবই উক্ত বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ দুর্জনসিংহদেবই মদনমোহনদেবের শ্রীমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এবং তার আর এক প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, মহারাজ বীরহাম্বির যদি মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন, তাহলে 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে তাঁর রচিত যে পদাবলী দুটি পাওয়া যায় তাতে মদনমোহনদেবের উল্লেখ না করে তিনি কালাচাঁদ বিগ্রহের পায়ে আত্মনিবেদন করলেন কেন? যুক্তির দিক দিয়ে তাঁর ঐ উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও ঐ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যে ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে এবং ঐ সম্বন্ধে যে প্রমাণ আমি পেয়েছি তা এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথমত—আমার মনে হয়, সে পদাবলী যে সময় রচিত হয়েছিল, সে সময় মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে আসেন নি। কিন্তু তাঁর শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্যকে দিয়ে কালাচাঁদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা তাঁর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার প্রথম দিকেই হয়েছিল। তাই সেই সময়ের রচিত পদাবলীর মধ্যে তিনি কালাচাঁদ বিগ্রহের পায়ে আত্মনিবেদন করেছেন।

দ্বিতীয়ত—নামের প্রভেদ হলেও মদনমোহন ও কালাচাঁদ বিগ্রহ একই বস্তু। ভিন্ন নামে সেই পরম পিতার প্রতিমূর্তি। সেই হিসেবে মদনমোহন নাম তাঁর অতি প্রিয় হলেও গুরুদেবকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা কালাচাঁদ বিগ্রহকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে গানের মধ্যে তিনি তাঁরই প্রাধান্য দিয়েছেন। এও হতে পারে।

তৃতীয়ত—মহারাজ বীরহাম্বির কর্তৃক বৃষভানুপুর গ্রাম হতে মদনমোহন বিগ্রহ আনয়নের কাহিনী সত্যাসত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মদনমোহন দেবের পুরোহিত, বিখ্যাত পূজারী বংশের সন্তান, পূজনীয় বংশীবদন পূজারী মশায়ের কাছে যে তথ্য আমি অবগত হয়েছি, তাও এখানে উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, উপাধি আমাদের পূজারী হলেও, আসলে আমরা বিষ্ণুপুর রাজবংশের পুরোহিত মহাপাত্রবংশের সন্তান। সেই জন্য মহাপাত্র ও পূজারী, আমাদের

উভয় পরিবারের গোত্র এক। বাৎস্য গোত্র। আর মহারাজ বীরহাম্বির বৃষভানুপুর হতে বিগ্রহ নিয়ে আসার পূর্বেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে পূজার্চনাদি করতেন। এবং মহারাজ বীরহাম্বির যেদিন মদনমোহন বিগ্রহ নিয়ে আসেন, সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে সময় আমাদের পূজারী বংশের যিনি রাজবাড়ীতে পূজার্চনাদি করতেন, তিনি একদিন বাড়ী ফিরতে দেরী করেন। তাই বাড়ীতে সেদিন সবাই খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমন সময় তিনি বাড়ীতে এসে সকলের সব ভয়-ভাবনার নিবৃত্তি করে বলেন, মহারাজ বীরহাম্বির তীর্থপর্যটন করে ফেরবার পথে মদনমোহন নামে বৃষভানুপুর গ্রাম হতে এক অতি সুন্দর সুঠাম বিগ্রহ নিয়ে এসেছেন। অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা শেষ করে তাঁর সেবা পূজা সারতে দেরী হয়ে গেল। সেই দিক দিয়ে বিচার করলেও বেশ বোঝা যায়, মহারাজ বীরহাম্বির কর্তৃক উক্ত বিগ্রহ আনয়নের কথাই প্রকৃত সত্য। তার আর এক প্রমাণ, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এখানের বৈষ্ণবেরা মদনমোহন দেবের যে বন্দনা গান গাইতেন, তাতেও মহারাজ বীরহাম্বির কর্তৃক মদনমোহন বিগ্রহ আনয়নকেই প্রবলভাবে তাঁরা সমর্থন করতেন।

এগারো: আরও কয়েকটি ভ্রান্তি সম্বন্ধে।

বিষ্ণুপুর হতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদীর পরপারে ৬০৬ মল্লাব্দে মহারাজ পৃথ্বিমল্ল কর্তৃক সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের যে মন্দির তৈরী হয়েছে, তা 'হিষ্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ' গ্রন্থে আছে ৬৪১ মল্লাব্দে। কিন্তু তা ভুল। ৬২৫ মল্লাব্দে পৃথ্বিমল্ল গত হওয়ায় তাঁর পরবর্তী মহারাজ তপঃমল্লের অভিষেক হয়েছে।

তারপর বিষ্ণুপুর কাদাকুলী মহাপাত্র পাড়া মহল্লায় মুরলীমোহন বিগ্রহের মন্দির তৈরী হয়েছে ৯৭১ মল্লাব্দ ও ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে আছে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে। রাধাগোবিন্দ জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১০৩২ মল্লাব্দ ও ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু 'হিষ্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ' ও 'মল্লভূম কাহিনী', উভয় গ্রন্থেই আছে, ১০৩৫ মল্লাব্দ ও ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে।

'হিষ্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ'গ্রন্থে আছে বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি দেবী লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির তৈরী করেছেন মল্লভূমের দ্বিতীয় অধীশ্বর জয়মল্ল। কিন্তু তা নয়। তখনও মন্দির নির্মাণের যুগ আমাদের বাংলাদেশে আসেনি। কিন্তু মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। তাই তিনি শুধু দণ্ডেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বহু পরবর্তীকালে। বাংলা ত্রয়োদশ শতকে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বাংলা ১২৪৮ সাল ও ১১৪৭ মল্লাব্দে। ৫৮ সংখ্যক নরপতি দ্বিতীয় গোপালসিংহদেবের রাজত্বকালে।

তার প্রমাণস্বরূপ যে-কোন সুধী ঐ সমস্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকের লেখা পরীক্ষা করে দেখলেই আমার কথার সত্যাসত্য বুঝতে পারবেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক মাননীয় মাণিকলাল সিংহমশায়ের পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক মধ্য পর্ব' নামক অধ্যায়ে বিষ্ণুপুর রাজবংশ ও তার অধিপতিদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য তিনি করেছেন, তার অধিকাংশই জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি আনয়নকারী অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত। তাই তা নিরসনের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরতে বাধ্য হলাম। এটা তর্ক নয়, সমালোচনা নয়। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসকে যথাসাধ্য ত্রুটিশূন্য করে তাকে সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস।

উপরিউক্ত গ্রন্থের ১২০ পাতায় তিনি লিখেছেন--১২৯৮ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলার বর্তমান বড় জোড়া থানার অন্তর্ভুক্ত ছান্দাড় নামক গ্রামে শীতলমল্ল নামে এক কিংবদন্তীর রাজা ছিলেন। সেই ছান্দাড়ের মল্লরাজবংশ হতেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের উদ্ভব ঘটিয়াছে। যেটা আসল সত্য, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের প্রায় ৪০/৪১ জন নরপতি মিথ্যে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল, বিখ্যাত খড়্গপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গমল্ল, যাদবনগর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা যাদবমল্ল প্রভৃতি তাঁর অভিমতে সব অলীক এবং আরও অনেকের ধারণা, ঐসব ধমল্ল, কাটারমল্ল প্রভৃতি পুরাকালীন শ্রুতিকটু নামের রাজা সব সাজান কাহিনী। কিন্তু যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি একটুখানি চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ঐমত নামের মধ্যেই আসল সত্য নিহিত আছে। কারণ ঐ কাহিনী যদি সাজান মিথ্যে হত, তাহলে ঐ মত অতি পুরাকালীন ঐ সব শ্রুতিকটু নাম না দিয়ে, ভাল গাল ভরা নাম তাঁরা দিতে পারতেন। এমনকি আরও সব গৌরবজনক কাহিনী তার সঙ্গে আরোপ করতে পারতেন। কিন্তু কোন মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা যাননি যা সত্য তাই তাঁদের কুলপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং সরকার বাহাদুরের ঘরেও ঐ নামই তাঁরা দিয়েছেন। আর ঐ মত নাম যে সত্য, তার প্রমাণ, সর্বজন স্বীকৃত বীরহাম্বিরের দিকে দৃষ্টি দিলেই যে কোন সুধী তা দেখতে পাবেন। তাঁর পিতার নাম ধাড়িমল্ল, পুত্রের নামও ধাড়ি। একবারে ঐ সমজাতীয় নাম!

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে বহিরাগত গুর্জর প্রতিহার প্রভৃতি সমর কুশল জাতির আগমন ও তাদের সংমিশ্রণে রাজপুত

জাতির নব রূপায়ণ হয়, তাতে তাঁদের অনেক কিছুর হয়ত পরিবর্তনও হয়। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার জন্য এঁদের তা হয় না। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চলে আসে এঁদের পুরাকালের ধারা। তার প্রমাণ বীরহাম্বিরের পিতা ও পুত্রের ঐমত পুরাকালীন নাম। আর ঐ থেকে বেশ বোঝা যায়, কত পুরাকালে রাজপুতানা থেকে এসেছিলেন। তারপর বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। হয় তাঁদের নব রূপায়ণ। শিল্প, সংস্কৃতির তুফান আসে মল্লভূমে। আসে অপরূপ মানবিকতা। আর তার সঙ্গে আসে যাঁদের নামের মধ্যেও পরিবর্তন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে আসে সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবীয় নাম। গোপালসিংহ, কৃষ্ণসিংহ, গোবিন্দসিংহ, চৈতন্যসিংহ, নিমাইসিংহ প্রভৃতি। কিন্তু তাহলেও রাজপুত আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতির কোন পরিবর্তন তাঁদের হয় না। আদি হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা চলে এসেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। আর তার ভেতর দিয়ে সত্য যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে চলে এসেছে তার স্বভাবসিদ্ধ গতিতে। তবুও উক্ত গ্রন্থের ১৫৮ পাতায় কিংবদন্তির রাজা শীতলমল্লকে ১ম নৃসিংহ বাহন নামে অভিহিত করে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের মল্ল ও সিংহদেব উপাধির স্থলে তাঁদের বাহন শব্দ যুক্ত করেছেন। যার সামান্যতম ছোঁয়াচও বিষ্ণুপুর রাজবংশের কোথাও কারও নেই। এবং তার প্রমাণও তিনি কিছু দিতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, এই হবে, আর ঐ হবে।

আবার যে বিষ্ণুপুর রাজবংশের সারা রাজ্যে অজস্র দেবমন্দির, দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোথাও একটি মাত্রও নাগদেবতা বা তাঁর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়নি ; যাঁদের কুলদেবী মৃন্ময়ী, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মৃন্ময়ী ; ১৪১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, তাঁরা নাগ উপাসক, নাগ বংশীয় চেদী। তার কারণ দেখান হয়েছে, মল্লরাজাদের রাজ্যাভিষেক এবং বাৎসরিক রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান ইন্দ্রপর্বের দিন ও অভিষেক মঞ্চে উপবিষ্ট রাজার মাথায় অনন্তবিষ্ণুর স্নানজল বর্ষিত হওয়ার মধ্যে উক্ত নাগরাজ্যের সংস্কার প্রতিফলিত। এখানে প্রথম কথা, নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক ও বাৎসরিক রাজ্যাভিষেক উৎসব কোনটিই ইন্দ্রপর্বের দিন হয় না। নূতন রাজার অভিষেক হয় তাঁর পূর্ববর্তী রাজার মৃত্যুর পরই। আর বাৎসরিক অভিষেক উৎসবের দিন পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যা অভিষেক যাত্রার দিন। তাই তাকে পুষ্যা অভিষেক বলা হয়।

তারপর অনন্তবিষ্ণুর স্নানজল রাজার মাথায় বর্ষিত হওয়াকে তিনি চেদী সংস্কার বলেছেন। কিন্তু ১৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, সেই অনন্তবিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এবং ১২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বাঁকুড়া জেলায় মল্লরাজবংশের

আগমন আর তাঁদের প্রতিষ্ঠা কাল ১২৯৮ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে। তাহলে তাঁরই কথা মত উক্ত সময় হতে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অনন্তবিষ্ণুব প্রতিষ্ঠা কাল প্রায় আড়াই শত বৎসরের পরবর্তীকাল। তাহলে তার মধ্যবর্তী দীর্ঘ আড়াই শত বৎসর চেদী সংস্কার পালন করবার জন্য তাঁর কথিত মল্লরাজারা অনন্তবিষ্ণুর স্নান জল পেতেন কোথায়? তারপর বিষ্ণুপুর রাজবংশ যদি চেদী হতেন, সেটা তাঁদের অগৌরবের নয়। তাহলে সে পরিচয় গোপন করে, রাজপুতানার সামান্য এক তীর্থযাত্রীর সন্তান বলে নিজেদের তাঁরা প্রতিপন্ন করতে যাবেন কেন?

এই থেকে বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হয় তাঁরা সত্যের উপাসক। কোন মিথ্যাচার বা ধাঁওতাবাজীর পক্ষপাতী তাঁরা নন। আর তাই বেশ বোঝা যায়, আদি হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাঁদের যে মূল কাহিনী, তা সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তারই জন্য তাঁদের শাসিত রাজ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, সুখ, সমৃদ্ধি, মানবতা সবকিছু নানাদিক দিয়ে অনন্য। তারপর ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তাঁর মতে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠা এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অনন্তবিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁরই নামে বিষ্ণুপুরের নাম হয়েছে বিষ্ণুপুর। তাহলে তার মধ্যবর্তী দীর্ঘ ১০ বৎসর কাল রাজধানী জায়গা, জনসমাগম যেখানে খুবই বেশী, সেই নগরের নাম কিছু ছিল না? সেকালের জনসাধারণ কি দীর্ঘ ১০ বৎসর কাল 'ইহা' 'উহা' বলে তাকে অভিহিত করতেন?

তারপর এখানের ইন্দপর্বকে বলেছেন তিনি চেদী সংস্কার। কিন্তু তার মূল অনুসন্ধান করে দেখলেই যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবেন, ওটা সংস্কার নয়। মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাঁওতালেরা যে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছে, বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের দিক থেকে ওটা তাদেরকে দেওয়া তার পুরস্কার। তার প্রমাণ, রাজ্যে আরও বহু জাতি থাকা সত্ত্বেও, উক্ত পর্বে সাঁওতালদের পরিপূর্ণভাবে প্রাধান্য দেওয়া। আর তার সঙ্গে প্রবর্তন করা, উক্ত পর্বে বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে সাঁওতাল সর্দারদের হলদে রংয়ের পাগড়া উপহার দেবার প্রথা। সরকার বাহাদুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত যখন ইন্দপর্ব অনুষ্ঠিত হত তখন আমি নিজে দেখেছি—অগণিত সাঁওতাল নর-নারী বহু দূর দূরান্তর থেকে উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র কাড়া, নাগড়া, মাদল, বাঁশের বাঁশী প্রভৃতি নিয়ে বিষ্ণুপুরে আসত। তাদের ভাষায় মেয়েরা সব গাইত, তার সঙ্গে নাচত, আনন্দ করত। সেই সময় বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে তাদের সর্দারদের হলদে রংয়ের পাগড়ী উপহার দেওয়া হত। চেদী রাজ্যেও কি তাই হয়? সেখানে কত সাঁওতাল আছে?

এখানের বিখ্যাত মহাপাত্রবংশের সম্বন্ধেও তিনি ঐমত কথা বলেছেন। উড়িষ্যায় মহাপাত্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রাহ্মণ হিসেবে এখানের মহাপাত্র মহাশয়দের সঙ্গে তাঁদের রীতিনীতির কিছুটা মিল থাকা স্বাভাবিক। সেই সূত্রে তিনি বলেছেন, এখানের মহাপাত্রবংশ সেখান থেকে এসেছেন। তাঁরা উড়ে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে-কোন ব্যক্তি তাঁদের সম্বন্ধে একটুখানি অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন—সেটা কত বড়। শুধু উড়িষ্যা কেন, বিষ্ণুপুরের মহাপাত্রদের সঙ্গে কোন রাজ্যের কোন মহা অমাত্যদের যুক্ত করার চিন্তা করা পর্যন্ত যায় না। সাধারণ অমাত্য পর্যায়ের দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে এ'রা স্বতন্ত্র। একাধারে এ'রা বিষ্ণুপুর রাজের প্রধান অমাত্য, প্রধান পুরোহিত, সর্বোপরি বিষ্ণুপুর রাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করার অধিকারী, এবং তা কারও দয়ার দান নয়। সম্পূর্ণভাবে তা তাঁদের অর্জিত সম্পদ। বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ বা আদিমল্লকে পুত্র-নির্বিশেষে পালন করা ও মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার পুরস্কার। আদি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে তাঁদের সেই রীতি। আজও তাঁরা বিষ্ণুপুররাজের পৌরহিত্য করেন, এবং বিষ্ণুপুররাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজকার্য পরিচালনার অধিকার আজও তাঁদের বর্তমান। উড়িষ্যার মহাপাত্র মহাশয়রা কি এই মত সব অধিকারে অধিকারী ?

তারপর আর একদিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিচারের বিষয়। মাণিকবাবুর কথিত চেদী রাজ্য কোন এক সাধারণ রাজ্য নয়। মহাভারতের যুগের এক উন্নত সমৃদ্ধিশালী প্রতিষ্ঠাবান রাজ্য। মাণিকবাবুরই কথা মত যেখানের রাজা হয়েছিলেন পাণ্ডব বংশজাত ত্রিভুবন খ্যাত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র মহাবলশালী বভ্রুবাহন। তাঁর কথা মত সেই রাজ্য থেকে চেদীগণ উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে এসে বাঁকুড়া জেলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর কথা মত সেইমত শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান এবং ঐমত প্রাচীন প্রসিদ্ধিবান রাজ্যের যাঁরা অধিবাসী। প্রধান অমাত্য দূরের কথা, পৌরহিত্য করবার মত কোন ব্যক্তিও তাঁদের মধ্যে মিলল না ? বাংলাদেশে রাজত্ব করতে এসে, তার জন্য উড়িষ্যা থেকে এক উড়ে ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসতে হল ?

দ্বিতীয়ত—তাঁরা যদি উড়িষ্যা থেকে আসা উড়ে ব্রাহ্মণ হতেন, তাহলে উড়িয়া আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তাঁদের মধ্যে সামান্য কিছু পরিমাণও থাকত। যেমন আছে বিষ্ণুপুর রাজবংশ ও রাজপরিবারের মধ্যে। দীর্ঘ বারশ বৎসরেরও অধিক কাল রাজপুতানা থেকে এসে বাংলাদেশে বাস, চারশ

বৎসরেরও অধিককাল বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পরও বর্তমান কাল পর্যন্ত রাজপুত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বর্তমান। আর তা শুধু বিবাহাদি বৃহৎ আচার, অনুষ্ঠানের মধ্যেই নয়। দাদাজী, নানাজী, ভাবিজী প্রভৃতি সম্বোধনের ভেতর দিয়ে নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক জীবনেও সে আচার আচরণ তাঁদের পরিস্ফুট। কিন্তু মাণিকবাবুর কথা মত উড়িষ্যা থেকে আগত এখানের মহাপাত্র মহাশয়দের মধ্যে উড়িয়া আচার-বিচারের সামান্যতম ছোঁয়াচও নেই। সব কিছুর মধ্যেই তাঁদের বাঙ্গালীর আচার বিচার। তাই যে কোন দিক দিয়েই বিচার করে দেখলে যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝতে পারবেন মাণিকবাবুর ধারণা কত ভুল, কত অবাস্তব।

মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত ঐমত। তিনি বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবা, যাঁর প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপুর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও তিনি বলেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু পরবর্তী-কালে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঊনপঞ্চাশৎ নরপতি বীরহাম্বিরের রাজত্বকালে, বিষ্ণুপুর প্রতিষ্ঠার বহু পরবর্তী সময়ে, এবং তা প্রতিষ্ঠা করেছেন বীরহাম্বির তাঁর বৈষ্ণবগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশে। অথচ তার কোন প্রমাণ তিনি দেননি, বা দিতে পারেননি। এবং বিচারের দিক দিয়েও তা অযৌক্তিক।

প্রথমত বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রী, রাজকুলদেবীর ঐমত বহু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিতা হওয়া অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত ঐমত শাক্ত দেবীর প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণব গুরুর আদেশ দেওয়া এবং বৈষ্ণব শিষ্য কর্তৃক তা পালন করা, দুইই অসামঞ্জস্য মূলক। তৃতীয়ত বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনিবাস আচার্য্যের ঐমত শাক্ত দেবীর প্রতিষ্ঠার আদেশ দেবার কারণই বা কি থাকতে পারে? তাই সব কিছু দিক দিয়ে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়, ঐ অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক উক্তি সম্পূর্ণ-ভাবে অবাস্তব।

অন্যদিকে মহারাজ জগৎমল্ল কর্তৃক একই সঙ্গে বিষ্ণুপুর নগর ও মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার তথ্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি এত প্রবল যাকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়। কারণ সাধারণ ব্যক্তি হতে আরম্ভ করে বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত বলেন কিংবদন্তীর প্রচণ্ড মূল্য আছে।

বিচারের দিক দিয়েও দেখা যায়, মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর শ্রীমন্দির নির্মিত হয়নি। হয়েছে তার বহু পরবর্তীকালে। কারণ সে সময় মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রবর্তন এখানে হয়নি। কিন্তু বীরহাম্বিরের পূর্ববর্তী সময়েই তা শুরু হয়েছে। সারেশ্বর, শৈলেশ্বরের শিবমন্দির, গোকুলচাঁদ জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির

তখন নির্মিত হয়েছে। মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠা উক্তসময়ে হলে, বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হিসেবে শ্রীমন্দিরও তাঁর নির্মিত হত সেই সময়েই। কিন্তু তা হয়নি। মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার বহু পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে তাঁর শ্রীমন্দির। বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিদেবী লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী দেবীর অবস্থাও তাই। তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে আরও দূর অতীতে। তাই উভয় দেবীরই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু পরবর্তীকালে।

কিন্তু ঐ দূর অতীতে তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কেহ কেহ তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বলেন, মূর্তিপূজার প্রচলন তখনও হয়নি। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। কারণ উন্নত পর্যায়ের হলেও, বাংলাদেশ ছিল অনার্য অধ্যুষিত ভূমি। আর্যদের ধর্ম, সংস্কৃতির অঙ্গ যেমন যাগযজ্ঞ, অনার্যদের সেইমত পূজা। আর পূজা অর্থে মূর্তি পূজাই। তাই বাংলাদেশে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না বলা চলে না। আর মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তি বহুল প্রচারিত রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধনে পূজিতা মহিষমর্দিনী দশভূজা দেবীমূর্তি। ইতিহাসে দেখা যায় সেই রামায়ণ রচিত হয়েছে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে। দশম শতাব্দীতে মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার ৯ শত বৎসর পূর্বে। তাই ঐমত সন্দেহ প্রকাশ করা অস্বাভাবিক।

আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি কিংবদন্তীর একটা প্রচণ্ড মূল্য আছে! খুবই খ্যাতিমান ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত তা স্বীকার করেন। আর সেই কিংবদন্তী সম্পূর্ণভাবে মহারাজ জগৎমল্ল কর্তৃক বিষ্ণুপুর নগর ও মৃন্ময়ীদেবী প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে। মাণিকবাবু তাঁর গ্রন্থের ২৪৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবকে হত্যা করে গোপালসিংহদেব রাজা হন। কিন্তু এটা যে শুধু অবাস্তব তাই নয়, গোপালসিংহদেবের মত ব্যক্তিকে ঐমত অপবাদ দেওয়া ঘোরতর অন্যায়ের পর্যায়ভুক্ত।

প্রথম কথা, ঐভাবে তাঁকে রাজা হতে হবে কেন? যতদূর জানা যায়, লালবাঈকে নিয়ে রঘুনাথসিংহদেবের অনাচারের জন্য তাঁকে অস্বীকার করে গোপালসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার জন্য রাজ্যবাসী প্রজা সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে সম্মতি দেওয়া দূরে থাক, তা বিফল হয়ে যায় গোপালসিংহদেবের প্রচণ্ডতমভাবে বাধা দেওয়ার ফলে। আর তার পরবর্তী জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলেও যে কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝতে পারবেন কিরূপ অপরূপ চরিত্রের ব্যক্তি তিনি ছিলেন। রঘুনাথসিংহদেব অপুত্রক থাকার জন্য, রাজসিংহাসনের অধিকারী হয়েও রাজসিকতার দম্ভ

বিন্দুমাত্রও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন আমিত্ব বর্জিত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ওপর সমর্পিত প্রাণ এক মহানপুরুষ! গৃহী হয়ে রাজা হয়েও তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাই তাঁকে বলা হয় রাজর্ষি। আর তিনি যে উক্ত অপবাদ হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহারাণী চন্দ্রপ্রভা, তাঁর 'পতিঘাতিনী সতী' আখ্যা।

রাজা অনাচারী হওয়া সত্বেও, জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধাচারী হয়ে গোপালসিংহদেব তাঁর সর্বনাশা আদেশ হতে প্রজাদের রক্ষা করতে অস্বীকার করায়, তাদের রক্ষার জন্য নিরুপায় মহারাণী রাজকর্মচারীদের আদেশ দেন, ছলে, বলে, কৌশলে যে কোন প্রকারে হোক প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য। যার ফলে আততায়ীর হাতে আহত হয়ে, আত্মরক্ষার আশায় পলায়ন করতে গিয়ে, হাওয়ামহলের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে, নীচে অবস্থিত হরিণ পিঞ্জরের ওপর পড়ে গিয়ে, ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় রঘুনাথসিংহদেব মারা যান। স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহারাণী চন্দ্রপ্রভা জীবন্ত মৃত্যুবরণ করে 'পতিঘাতিনী সতী' নামে অভিহিতা হন। আজও উক্ত নামে ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়া হয়ে আছেন। এখনও তাঁর সেই আত্মোৎসর্গের স্থান 'সতীকুণ্ড' নামে অভিহিত।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ বা আদিমল্ল শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনকামী পুরীগামী এক তীর্থযাত্রীর সন্তান। সময় তখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। তাই সেই সূত্রে উক্ত সময়ে জগন্নাথদেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। তিনি পৌরাণিক দেবতা। পুরাণে জগন্নাথলীলায় দেখা যায়, কৃষ্ণলীলার পরই জগন্নাথলীলা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর প্রতিষ্ঠাতা। এখনও তাঁর সেই কাহিনীর সাক্ষ্য আঠারনালা প্রভৃতি সেখানে বর্তমান। আর সাধারণ দিক দিয়ে বিচার কবলেও দেখা যায়, সারা ভারতব্যাপী যাঁর প্রসিদ্ধি, তাঁর প্রাচীনত্ব কত গভীর! স্বল্প দিনে ঐমত খ্যাতি অসম্ভব। তাই তিনি যে পুরাকালের অতি প্রাচীন দেবতা, তা বেশ ভালভাবেই বলা যায়। তবে বর্তমান কালের তাঁর যে সুবৃহৎ শ্রীমন্দির, তা হয়ত তাঁর প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের। কিন্তু তাও খুবই পরবর্তীকালের হওয়ার কোন কারণ নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে মন্দির তৈরী আরম্ভ হয়েছে। সম্রাট অশোক তৈরী করেছেন বৌদ্ধস্তূপ। দক্ষিণ ভারতে নির্মিত হয়েছে মন্দির।

এতসব আলোচনা করে গ্রন্থের কলেবর বাড়াতে আমি যেতাম না। কিন্তু নামে কাহিনী হলেও এটা ইতিহাস। তাই যথাশক্তি একে সন্দেহশূন্য করে,

ভালভাবে প্রকাশ করবার জন্য আমার এই প্রয়াস। সেইজন্য শুধু পুরাণ ইতিহাসই নয়, জনসাধারণের বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য সম্বন্ধেও প্রয়োজনমত অল্প-বিস্তর বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ এটাই এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি। এর জন্য কারও মনে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, করজোড়ে তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষে করছি। নিরুপায় জেনে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

আর এক কথা— ইতিহাস রূপকথা নয়, গল্প উপন্যাস নয়, সত্যের প্রকাশ। তাই শুধু ঐ সমস্ত আলোচনাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ঐ বিপদের সম্মুখীন হয়ে, অল্প-বিস্তর বিপদে পড়ে, আমার যথাশক্তি আমি অনুসন্ধান করেছি। তাতে যা পেয়েছি, তাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছি।

সবশেষে আমার নিবেদন, বিষ্ণুপুর ইতিহাসের মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়াবার জন্য ও লোকচক্ষে তাকে সহজ সরলভাবে উপস্থিত করবার আশায় ভারতের ইতিহাস স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর দিয়েছি। তাতে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, ভুল করেছি কি ঠিক করেছি, তার বিচার করবেন শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ।

তবে আমার নিজের দিক থেকে আমি নিঃসন্দেহ। সেখানে ফাঁকিবাজি বা গোঁজামিল বলতে আমার কিছু নেই। কারণ এ আমার সাধারণ বিলাস বা পেশা নয়। এ আমার নেশা। তাই কোন বাধাকেই আমি বাধা বলে মানিনি। বর্তমান কাল হতে প্রায় ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বিষ্ণুপুর যখন সত্যিকার বন বিষ্ণুপুর ছিল, ঐতিহাসিক ধ্বংস স্তূপও ছিল প্রচুর, এবং সেই সমস্ত স্থান ছিল সেই মত বিপদসঙ্কুল, আর দুর্গম। বিষধর সাপ, বাঘ প্রভৃতি মূর্তিমান মৃত্যু যখন থাকত তার মধ্যে ওত পেতে, ধ্বংসস্তূপ থেকে পড়ে গিয়ে এবং ধ্বংসোন্মুখ বস্তু মাথার ওপর ধ্বসে প'ড়ে শুধু জখম নয়। মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল যখন খুবই বেশী, নেশার বশবর্তী হয়ে, তখনও কোন বাধা আমি মানিনি। আর তাই বহু সাবধান হওয়া সত্ত্বেও, দুবার বিষধর সাপ পড়েছে ওপর থেকে। একবার পিঠে, দ্বিতীয়বার মাথার ওপর। কিন্তু ভয় পাওয়া ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি তাতে হয়নি। বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়েছে। কিন্তু তা তার সামনের দিকে নয়। পিছন দিক থেকে। তাই খুবই ভয় পাওয়া ব্যতীত তাতেও কিছু হয়নি। তবে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত লেগে বেশ কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তবুও তাতেও আমি আনন্দিত। আমার যা জানবার দরকার, তা অনেক কিছুই আমি জেনেছি। আর লিখেছি ঠিক সেই ভাবেই। পাখার নীচে বসে, পরের মুখের কথা শুনে, কল্পনার জাল বুনে বা লাইব্রেরীর গ্রন্থে সঠিক বেঠিক যা আছে, তাই দেখে এই গ্রন্থ আমি লিখিনি।

কথায় বলে "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। মহা মনীষীদেরও অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে। যত বড় নাম করা ব্যক্তিই হোন, অন্ধ অনুসরণ আমি কারও করিনি। সংগৃহীত তথ্যকে প্রয়োজনমত স্থান ও ঐমত ব্যক্তি প্রভৃতির কাছে যাচাই এবং নিজের বিচার মনের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখে যতদূর সম্ভব নিঃসন্দেহ হয়ে এই গ্রন্থ আমি লিখেছি। বিশেষ করে আমার যথাশক্তি এর সবকিছু দুর্বোধ্যতাকে দূর করে, একে সহজ বোধ্য করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে কতদূর কৃতকার্য হয়েছি, তার বিচার করবেন শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ।

কোন সাহিত্য পত্রিকার সাহায্য না পাওয়ার জন্য, এর বিষয়বস্তু ধারাবাহিক-ভাবে কোলকাতার সিনেমা পত্রিকা 'রূপমঞ্চে' বের হয়েছিল। ইতি—

বিনীত—

শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া,

আশ্বিন, ১৩৮৬

সূচীপত্র

॥ বিষ্ণুপুর ॥

কত মহিমার জন্মদাত্রী তুমি মা বিষ্ণুপুর।
আজিও তব কীর্তিসুবাসে পূরিত বিশ্বপুর।
কতকাল ধরে মানুষের তরে
সাধিয়াছ শুভ কত।
সাক্ষ্য তাহার সাত সরোবর
সদাব্রত আদি যত।
জীবেরে তুমি দেখিয়াছ শিব, সবারে বেসেছ ভাল,
তোমার মহান প্রেমের মন্ত্রে নাশিয়াছ সব কালো।
মানুষের হিতে জননী তোমার
অপরূপ অবদান!
উদার হৃদয়ে গাহিয়াছ তুমি
মানুষের জয়গান।
সপ্ত পরিখা বেষ্টিতা তুমি, মাঝখানে দ্বীপময়ী,
অতীত গরবে ভূষিতা হয়ে রহিয়াছ মাতঃ অয়ী।
একদা তোমার নৃপতি বীরের
অতুল ভকতি বলে,
ত্রিদিব জীবন মদনমোহন
আসিল তোমার কোলে।
পূত করিতে তোমার পুব ধরা দিল নিজে চিরমধুর,
বক্ষ তোমার ভরিল পুণ্যে সকল অশুভ হইল দূর।
দেব উপাধিতে হইল ভূষিত
তোমার অধিপতি,
তোমার নৃপের অমিত প্রতাপ
লভিল সিংহ খ্যাতি।
মোগল পাঠান কত অরাতির সুবিশাল সেনাদলে
শস্ত্র তোমার শায়িত করিল বারে বারে অবহেলে।

কামান তোমার দলমর্দন
বরষি ভীষণ অনল
একদা দলিল বাংলার ত্রাস
ভয়াল মারাঠাদল ।
আরও কত কহিব মাতঃ তোমার কীর্তি কথা
চিন্ময়ী দেবী মৃন্ময়ী তব বক্ষেতে প্রেমে গাঁথা ।
প্রেমেতে তুমি নদীয়া জননী,
বীরত্বে রাজপুতানা ।
সঙ্গীতে তুমি মা দ্বিতীয়া দিল্লী
সার্থক তব সাধনা ।
অঙ্গে তোমার বৃন্দাবনের সুমধুর মাধুরিমা
চারিদিকে দেব দেউল তোমার প্রচারিছে মহিমা !
মহা মহিমায় মণ্ডিতা তুমি,
তুমি মহিমাময়ী !
বক্ষ তোমার তীর্থজননী
তুমি মা পুণ্যাশ্রয়ী ।
বঙ্গবীরের অমরকীর্তি বাঙ্গালীর জয়গাথা,
আজিও তোমার বক্ষ ব্যাপিয়া বিরাজে বীরমাতা ।
শত গরিমার লীলাভূমি তুমি
মল্লভূম রাজধানী ।
বিশ্ব ভরিয়া শুনিতেছি আজও
তোমার সুযশবাণী ।
ধর্ম তোমার মর্ম ছিল মা, ছিল মহান সংস্কৃতি ।
শিল্প ছিল, সাহিত্য ছিল, ছিল মা গো ন্যায়-নীতি ।
দেশ-বিদেশের কত সুধী আসি
করেছে তোমারে নতি,
বলে গেছে তারা তুমি অনন্যা,
তুমি মা অমরাবতী ।
প্রজার ধর্ম রাখিতে জননী বলি দিয়া প্রিয় পতি,
লভিলেন খ্যাতি মহারাণী তব পতিঘাতিনী সতী ।

তুলনা তোমার নাহিগো মাতঃ
তুমি অতুলনীয়া !
সুযশ ধন্যা তুমি গো জননী
বিশ্বের বরণীয়া।
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একদা বক্ষে তব
মৃন্ময়ী মায়ে চিন্ময়ীরূপে হেরিলেন অভিনব।
কত সাধকের পদরেণু মাখা
তুমি মা পুণ্যভূমি।
বাংলা মায়ের বক্ষ উজলি
রহিয়াছ আজও তুমি।

প্রথম অধ্যায়

বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি রাজার জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ, বাংলা প্রথম শতক।

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় অবস্থিত লাউগ্রামের সমীপবর্তী বনপথ। বিশাল অরণ্য! যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু অন্তহীন বন, হিংস্র শ্বাপদের বাসভূমি। তাই দিনের আলোতেও সেখানে বিরাজ করত রাতের বীভৎসতা, মূর্তিমান মৃত্যু।

তবুও মানুষ সেখানে যেত। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে বনসম্পদ সংগ্রহের জন্য আসত গ্রামবাসীর দল। বনের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেত সাধারণ যাত্রী। আর যেত ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত পুরীগামী পুণ্যার্থীর দল। তেমনি একদল যাত্রীর যাত্রাপথের কথা নিয়েই এই 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'র আরম্ভ।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, সামনে বিরাট উৎসব! শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মেলা। দিনের শেষের মাতাল বাতাস বইছে সনসন রবে। বিদায়-বেলার সূর্য তার আবীর মাখা মূর্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। আসন্ন সন্ধ্যা আসছে তার ছায়া-শীতল বুক নিয়ে। এমন সময় সেই দুর্গম বনপথ দিয়ে চলেছে একদল যাত্রী। চোখে মুখে তাদের পথ চলার ক্লান্তি, সমস্ত শরীর ধূলিতে সমাচ্ছন্ন। তবুও তাদের চলার বিরাম নেই।

মুখে পুরুষোত্তমের নাম, বুকে তাঁর দর্শন পাগল মনের প্রবল পিপাসা এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের সামনের দিকে। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিলেন—কেউ বলেন রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর, কেউ বলেন মৈনপুরী ষ্টেটের এক রাজপুত দম্পতি। স্ত্রী ছিলেন আসন্নপ্রসবা। তাই সেই পথের মাঝেই প্রসব-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এক গাছের গোড়ায় বসে পড়েন তিনি। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন তাঁদের

মাথায়! যাত্রীর দল থমকে দাঁড়ায়। প্রমাদ গণেন তাঁর স্বামী। সকলে মিলে তাঁকে অনুরোধ করেন যে-কোন প্রকারে হোক সেই বনভূমি পার হয়ে কোন লোকালয়ে উপস্থিত হবার জন্য।

কিন্তু তা সম্ভব হয় না। আরও অধিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অস্থির হয়ে পড়তে থাকেন তিনি। তাই নিরুপায় হয়ে যাত্রীর দল চলে যায়। আর সেই অসহায় দম্পতি পড়ে থাকেন সেই গভীর অরণ্যে। আকুল হয়ে ডাকতে থাকেন তাঁরা অকূলের কাণ্ডারী ভগবানকে।

কিন্তু ভাগ্য যখন বিরূপ হয়, দুর্ভাগ্য যখন তার চরম আঘাত হানতে শুরু করে, তখন কেউ রক্ষা করতে পারে না। এঁদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। সমস্যা হয়ে ওঠে আরও গভীর, আরও ভয়াল! তাঁদের সেই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে সেই দুর্গম অরণ্যের মাঝে এক দেবকান্তি পুত্র প্রসব করেন সেই নারী। আর দুর্ভাগ্যবশত, তার অব্যবহিত পরেই মারা যান তিনি।

তখন স্থির থাকতে পারেন না রাজপুত! চীৎকার করে ওঠেন উন্মাদের মতন! বলেন পুরুষোত্তম, এই তোমার মনে ছিল?

কিন্তু কে তাঁকে উত্তর দেবে? কে দেবে সান্ত্বনা? সেই ভয়াল অরণ্যের মাঝে গুমরে মরে তাঁর সেই আক্ষেপ ভরা বাণী। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হন তিনি, মন ফিরে আসে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়। তখন স্থির করেন তিনি তাঁর সঙ্কল্প। সঙ্গের ঝোলা থেকে ভূর্জপত্র প্রভৃতি বের করে লেখেন এক লিপি। তারপর সেই লিপি ও জয়শঙ্কর নামক তাঁর নিজের মন্ত্রপূত তরবারি প্রভৃতি সবকিছুসহ, সেই শিশুকে সেখানের এক গাছের গোড়ায় শুইয়ে রেখে, তাকে ভগবানের ওপর সঁপে দিয়ে শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে চলে যান। আর ফিরে আসেন নি।

এদিকে সেই শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াল অরণ্যের মাঝে পড়ে থাকে সেই মাতৃ-হারা, পিতৃ পরিত্যক্ত শিশু, আর তার মায়ের মৃতদেহ। ক্রমে দিনের আলো নিভে যায়, আসে রাত্রি। সেই রাতের অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদেরা এসে তার মায়ের মৃতদেহ খেয়ে ফেলে। কিন্তু যে-কোন কারণবশতই হোক শিশুর কিছু ক্ষতি করে না বা করতে পারে না। উপরন্তু সেই গাছের ওপরের এক মধুচক্র থেকে শিশুর মুখে মাঝে মাঝে ঝরে পড়তে থাকে মধু। আর তাই খেয়ে বেঁচে থাকে সেই মাতৃহারা শিশু। রহস্যময়ী প্রকৃতির সে যেন এক বিচিত্র লীলা। তার সবকিছু দিয়ে যেন সেই অনাথ শিশুকে রক্ষা করে সে।

তারপর রাত্রি গত হয়ে যায়। দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সারা বনভূমি। তখন সেখানে কাঠ কুড়োবার জন্যে আসে এক বাগ্দীর মেয়ে। চোখে

পড়ে তার সেই অপরূপ শিশু! মুগ্ধ হয়ে যায় সে! সেদিনের মতন কাঠ কুড়োন তার আর হয় না। জেগে ওঠে মনে তার মায়ের মমতা। তরবারি, পরিচয়-লিপি প্রভৃতি সবকিছুসহ শিশুকে নিয়ে যায় সে নিজের আলয়ে। সন্তান-সন্ততিহীনা মা তার মাতৃহৃদয়ের সবটুকু মমতা দিয়ে তাকে পালন করতে থাকে।

পঞ্চানন ঘোষাল নামে সেখানের এক মহৎ প্রাণ, উদারচেতা ব্রাহ্মণ সাহায্য করেন তাকে। শিশুর নাম রাখা হয় রঘুনাথ। তাকে কেন্দ্র করে তার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের কত সাধ, কত আশা জেগে ওঠে। মনে মনে কত সুখের স্বপ্ন রচনা করে সে।

কিন্তু সে সাধ, সে আশা তার সফল হয় না। তখন রঘুনাথ সবে মাত্র কিশোর। সেই অবস্থায় মেয়েটির শরীর ভেঙ্গে পড়ে। রঘুনাথ, পঞ্চানন ঘোষাল, সকলের সব চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। সব আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হয় তাকে পরলোকের পথে। যাবার সময় তরবারি, পরিচয়-লিপি প্রভৃতি সবকিছুসহ রঘুনাথকে সঁপে দিয়ে যায় সে ব্রাহ্মণের হাতে। তিনি নিযুক্ত করেন তাকে তাঁর গোচারণের কাজে। তারই গৃহে প্রাতপালিত হতে থাকে সেই অনাথ সন্তান।

কিন্তু তাহলেও সিংহ শিশু সে। তাই সেই অবস্থাতেও বিকাশ হয় তার সেই শৌর্যের। গোচারণ করতে গিয়ে আরও সব রাখাল বালকদের নিয়ে আরম্ভ করে সে শক্তির সাধনা। শরীর চর্চা, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি সবকিছু। সেই হয় তার সব চাইতে প্রিয় কাজ। প্রবাদ আছে—তার সঙ্গে সংযোগ হয় দৈবের। এক দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে সাহায্য করেন তাকে সেই শক্তি সাধনায়। তাই দিনের পর দিন শরীব চর্চা, যুদ্ধবিদ্যা, সবকিছুতেই নিপুণ হতে থাকে সে। আর সেই থেকে তার জীবনে নানা প্রকার বিস্ময়কর ঘটনারও হতে থাকে সমাবেশ। তার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ঘুমন্ত অবস্থায় প্রকাণ্ড এক বন্যভুজঙ্গ কর্তৃক বিরাট ফণা দিয়ে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখকে সূর্যকিরণ থেকে আড়াল করে রাখা।

গরু নিয়ে গিয়ে একদিন বনের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে সেই প্রিয়দর্শন কিশোর। মুখে তার সূর্যের কিরণ পড়ে কোমল ক্লান্তিমাখা মুখখানাকে করে তোলে যেন মায়াময়। সেই সময় যে-কোন কারণবশতই হোক, প্রকাণ্ড এক বুনো সাপ সেখানে এসে এমনভাবে তার ফণা তুলে দাঁড়ায়, যার জন্য ঘুমন্ত রঘুনাথের মুখে এসে পড়া সূর্যের কিরণ সম্পূর্ণভাবে আড়াল হয়ে যায়। এদিকে বেলা শেষ

হয়ে আসে, তবুও রঘুনাথ আসে না দেখে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ। যান তার খোঁজে। তখন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। অস্তাচলের আলো প্রায় নিভে এসেছে। পাখীর দল গাছে গাছে শুরু করেছে তাদের দিনের শেষের জলসা। বুকে এক অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কা নিয়ে ব্রাহ্মণ ক্রমাগত এগিয়ে যান বনের মধ্যে। গিয়ে দেখেন সেই বিস্ময়কর দৃশ্য। স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। অন্তরে ভয়ও লাগে। মনে হয়, ঐ সাপের কামড়ে মারা গেছে বুঝি রঘুনাথ। না-হলে সে সময়ে ওখানে সে ওভাবে পড়ে থাকবে কেন। কিন্তু তবুও দূর থেকে ভগ্নকণ্ঠে ডাকেন তাকে। তখন সাপ তার ফণা গুটিয়ে চলে যায়, আর রঘুনাথ উঠে বসে। দেখে দিনের সব আলো নিভে গেছে। তিমিরবরণা রাত্রি আসছে তার তামসী মূর্তি নিয়ে। তাই দেরী না করে দ্রুত চলে আসে সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। আর সেই থেকেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তার। সেদিন থেকে ব্রাহ্মণের অন্তরে পরিবর্তন আসে প্রচণ্ডভাবে। রঘুনাথের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। ব্রাহ্মণ তাকে পালন করতে থাকেন পরম যত্নে। গৃহের পরিজনদের বলে দেন, কোনদিনের জন্য রঘুনাথের প্রতি কোন অবহেলা করা, বা কোন উচ্ছিষ্টাদি যেন তাকে দেওয়া না হয়। কারণ, বনের মাঝের সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখার পর থেকে ব্রাহ্মণের অন্তরে শুরু হয় এক প্রচণ্ড আলোড়ন। মনে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় —ভবিষ্যতে এই কিশোর রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হবে। তাই একদিন রঘুনাথকে তিনি শপথ করিয়ে নেন,—ভবিষ্যতে সে রাজা হলে তাঁকে তার পৌরোহিত্যে বরণ করবে। তারপর রঘুনাথের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে আরও এমন সব ঘটনার সমাবেশ হতে থাকে, তা যেমন আশ্চর্যজনক, তেমনি অভিনব! সেসময় ওখানের মধ্যে সব চাইতে বড় রাজা ছিলেন প্রদ্যুম্নপুরের নৃসিংহদেব। ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষ্যে একদিন সেই প্রদ্যুম্নপুর রাজবাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ আসে পঞ্চানন ঘোষালের। অত্যধিক স্নেহের বশে রাজবাড়ীর সমারোহ দেখবার জন্য রঘুনাথকেও নিয়ে যান তিনি সঙ্গে।

আর অতি প্রিয়দর্শন কিশোর বলেই বোধহয়, তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে রাজা নৃসিংহদেবের। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রঘুনাথকেও তিনি খাবার দেবার আদেশ দেন। ব্রাহ্মণেরা বসেন প্রাসাদের ওপরে, আর রঘুনাথকে খাবার দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে। রাজা নিজে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন সবকিছু। এমন সময় শুরু হয় এক বিপর্যয়। দিন ছিল মেঘলা। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তার জন্য রঘুনাথ ভিজে যায়; আর তার খাবার জিনিসও নষ্ট হবার উপক্রম হয়। তাই দেখে

স্থির থাকতে পারেন না নৃসিংহদেব। মহান্ হৃদয় স্নেহপ্রবণ রাজা নিজে রঘুনাথের মাথায় ছাতা ধরে রক্ষা করেন তাকে সেই বৃষ্টিধারা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ। বলেন, করলেন কি মহারাজ! রাজা মাথায় ছাতা ধরলে, তাকে যে রাজা হতে হয়?

রাজাও সানন্দে বলে ওঠেন, তাই যেন হয়। এই প্রিয়দর্শন কিশোর ভবিষ্যতে যেন রাজ্যেশ্বরই হয়।

পঞ্চানন ঘোষালের প্রচ্ছন্ন আশা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এমন কি রঘুনাথের রাজ্যলাভ সম্বন্ধে তিনি একপ্রকার নিশ্চিতই হয়ে ওঠেন।

আর শুধু ঐ নয়। এর পরবর্তীকালেও রঘুনাথের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে, যার জন্য তার রাজ্যলাভ সম্বন্ধে পঞ্চানন ঘোষালের ধারণা হয়ে ওঠে আরও সুনিশ্চিত।

একদিন শেষ রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর, রঘুনাথ তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানের দীঘির মোহনায় মাছ ধরতে যায়। সঙ্গীরা পায় প্রচুর মাছ! আর রঘুনাথের জালে এসে পড়ে তার বিপরীত বস্তু। সে যেখানে জাল পেতেছিল সেখানে জলের চাপ ছিল প্রচণ্ড। আর তার সন্নিকটে কোন কালের কোন রাজার ঐশ্বর্য বোধহয় মাটি চাপা ছিল। জলের প্রবল চাপে মাটি ধ্বসে গিয়ে ক্ষুদ্র আকারের সোনার ইঁট ও রাজকুল দেবতা অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা পড়ে রঘুনাথের জালের ভেতর।

তখনকার দিনে যোজনান্তর অর্থাৎ চার ক্রোশ অন্তর এক একজন রাজা রাজত্ব করতেন এবং সুযোগ পেলে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যসীমা বাড়াতেন। আর তাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তিসম্পন্ন রাজারা তাঁদের ধনসম্পদ ঐভাবে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখতেন। রঘুনাথ সেইমতন জিনিসই পায়। আর তা নিয়ে এসে সে ব্রাহ্মণকে দেখায়। বলে, বহু চেষ্টা করেও একটি মাছও আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। নালার পাশের পাড় ধ্বসে আমার জালে এসে পড়েছে এইসব ক্ষুদ্র আকারের ইঁট আর নুড়ি পাথর।

সবকিছু দেখে অভিভূত হয়ে যান ব্রাহ্মণ। উচ্ছ্বসিত আবেগে জড়িয়ে ধরেন তাকে বুকে। বলেন, দুঃখ করছিস কি? তুই রাজার ঐশ্বর্য পেয়েছিস। আমি উচ্চকণ্ঠে শপথ করে বলছি– ভবিষ্যতে নিশ্চয় তুই রাজসিংহাসনের অধিকারী হবি! তাই ভগবান আগে থেকেই পাঠাচ্ছেন তোকে এই সমস্ত রাজার ঐশ্বর্য। আর যে সৎ হয়, মহৎ হয়, ভগবান এমনি ভাবেই তাকে কৃপা করেন।

এমনি সব অভিনব ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে কিশোর রঘুনাথ পরিণত হয় পূর্ণবয়স্ক যুবকে। আর সেই সঙ্গে দৈহিক শক্তি, যুদ্ধবিদ্যা, সবকিছুতেই হয়ে ওঠে সে দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী। তার শক্তির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আর ঠিক সেই সময়েই ঘটে আর এক ঘটনা, যার জন্য জীবনের গতি তার পরিবর্তিত হয়ে যায়। পূর্বেই উল্লিখিত আছে ওখানের মধ্যে সব চাইতে বড় রাজা ছিলেন তখন প্রদ্যুম্নপুরের নৃসিংহদেব। তাঁর অধীনস্থ যোতবিহারের সামন্ত নৃপতি প্রতাপনারায়ণ হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী। কিছুতেই তাকে দমন করতে পারেন না নৃসিংহদেব। সারা রাজ্য ভরে যায় তাঁর অপযশে।

রঘুনাথের শক্তির খ্যাতি তিনি বিদিত। মনের ধারণাও তার ওপর উচ্চ। তাই তাকেই ভার দেন তিনি সেই বিদ্রোহীকে দমন করবার। আর রঘুনাথও তার অমর্যাদা করে না। আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জন করে সে। তার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণ। বন্দী অবস্থায় আনীত হয় সে প্রদ্যুম্নপুরের রাজদরবারে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন নৃসিংহদেব। আর রঘুনাথের সেই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাকে দেন যোতবিহারের সিংহাসন।

পঞ্চানন ঘোষালের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়। যোতবিহারের রাজপদে অভিষিক্ত হয় রঘুনাথ। কিন্তু সে পদ তার স্থায়ী হয় না। তারপরেই তার জীবনে আসে এমন বিপর্যয় যার জন্য রাজ্যচ্যুত হয়ে আবদ্ধ হতে হয় কারাগারে। বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণ নিহত হয়ে রাজ্য নিষ্কণ্টক হওয়ার পর, তাঁর সেনাপতির ওপর রাজ্যের সবকিছু ভার অর্পণ করে, সপরিবারে তীর্থযাত্রা করেন নৃসিংহদেব। সরলপ্রাণ উদারচেতা রাজার কৃপায় রাজ্যের সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হয় সেনাপতি। কিন্তু সে তার মর্যাদা রাখে না। নৃসিংহদেবের সেই সরলতার সুযোগ নিয়ে স্বপ্ন দেখে সে প্রদ্যুম্নপুরের অধিপতি হবার। তার দুষ্কর্মের সহচরদের নিয়ে আরম্ভ করে সে তার চক্রান্ত।

কিন্তু তাতে সফলতা তার আসে না। তার সেই দুরভিসন্ধির সংবাদ অবগত হয়ে প্রজা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আর রঘুনাথ এমন প্রবলভাবে বাধা দেয় যার জন্য সেনাপতির সঙ্গে আরম্ভ হয় তার সংঘর্ষ। সেই সূত্র নিয়ে যোতবিহারের সিংহাসন থেকে রঘুনাথকে নামিয়ে দেবার ভয় দেখাতে পর্যন্ত সে দ্বিধা করে না। কিন্তু অন্তর তার স্বতন্ত্র উপাদানে তৈরী। সে ন্যায়ের উপাসক। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ তার নেই। তাই স্বেচ্ছায়, ধূলি মুষ্টির

মতন সে-সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যায় রঘুনাথ। সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই সংবাদ। নররূপী দেবতা বলে অভিহিত করে তাকে সকলে। সমস্ত রাজ্য ভরে ওঠে তার জয়গানে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে হয় তাতে সর্বনাশ। তার সেই অভাবনীয় জনপ্রিয়তা দেখে উন্মাদ হয়ে ওঠে যেন সেনাপতি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আবদ্ধ করে সে তাকে কারাগারে।

কিন্তু বেশীদিন সে নিগ্রহ তাকে ভোগ করতে হয় না। রাজকুমারীর অসুস্থতার জন্যে তীর্থ থেকে ফিরে আসেন নৃসিংহদেব এবং সবকিছু অবগত হয়ে নিজে কারাগারের মধ্যে গিয়ে মুক্ত করে দেন তিনি রঘুনাথকে। কিন্তু এমনি তার চরিত্র কিছুতেই যোতবিহারের সিংহাসন তাকে আর গ্রহণ করাতে পারেন না। আর তার জন্য সেনাপতিকে করেন তিরস্কার। বলেন, তোমার জন্যই এই সর্বনাশ!

তাতে লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি তার দুষ্কর্মের সহচরদের নিয়ে উন্মাদ অপবাদ দিয়ে বন্দী করে রাজাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। কিন্তু করবার কিছু নেই। সমস্ত রাজশক্তি তার করতলগত। তাই নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাতে থাকে রাজ্যবাসী প্রজা। কিন্তু রঘুনাথ হয়ে পড়ে যেন দিশেহারা। সে-আঘাত বজ্রের মতন বাজে তার বুকে। কিন্তু সে তখন সম্পূর্ণ অসহায়। তাই ভগবানের নাম নিয়ে খুঁজতে থাকে তার প্রতিকারের উপায়। পূর্ণও হয় তার সেই আশা। অসহায়ের আকুল প্রার্থনা শোনেন যেন দর্পহারী ভগবান। অকস্মাৎ এক দুর্ধর্ষ সাঁওতাল সর্দারের সঙ্গে হয় তার সখ্যতা। তার শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে, তার গুণমুগ্ধ সর্দার সবকিছু দিয়ে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তখন তার দুর্ধর্ষ সাঁওতাল বাহিনী নিয়ে অভিযান আরম্ভ করে রঘুনাথ। সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই সংবাদ। তাকে সাহায্যের জন্য দলে দলে ছুটে আসে রাজভক্ত প্রজা। পাপের শাস্তি আরম্ভ হয় সেনাপতির। বন্দী হয় সে রঘুনাথের হাতে। প্রদ্যুম্নপুরের ভাগ্যাকাশ হতে অপসারিত হয়ে যায় তার সর্বনাশের কালো মেঘ।

কিন্তু তারপরই বাধে আবার বিপর্যয়! পাগল অপবাদধারী রাজা দীর্ঘদিন পাগলের মতন অবস্থায় বন্দী হয়ে থেকে সত্যই যেন পাগল হয়ে যান। সেই পরম আনন্দের দিনে চরম সর্বনাশ করেন তাঁর। বন্দীবাসের সংলগ্ন জলাশয় কানাইসায়রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। সব আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। অপুত্রক রাজা, রাজকুমারীও অবিবাহিতা। তাই সকলে চিন্তা করতে

থাকেন অরাজক রাজ্যে কে আনবে শান্তি শৃঙ্খলা! কে পূর্ণ করবে প্রদ্যুম্নপুরের শূন্য সিংহাসন?

কিন্তু সেভাবে বেশীক্ষণ তাদের অতিবাহিত করতে হয়না। মহারাণী নিজে সমাধান করেছেন সব সমস্যার। প্রদ্যুম্নপুরের পরিত্রাতা রঘুনাথকেই যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে দান করেন শূন্য সিংহাসন। আর তাঁর একমাত্র দুহিতা চন্দ্রকুমারীকেও তিনি তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন। তারপর সতীর বাঞ্ছিত মৃত্যু স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে চলে যান পরলোকের পথে।

তখন ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১০১ সাল। তাঁর পালন-কর্তা পঞ্চানন ঘোষালের নির্দেশ মতন তাঁর সাহায্যকারী সাঁওতালদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার প্রশস্ত দিন ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রপূজা করে প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন রঘুনাথ। আর শুধু যুদ্ধবিদ্যা নয়, দৈহিক শক্তিতেও তিনি মল্লের মতন অসীম শক্তির অধীশ্বর ছিলেন বলে, রঘুনাথের পরিবর্তে সেই থেকে নাম হয় তাঁর আদিমল্ল, তাঁর বংশের নাম হয় মল্লবংশ। এবং তাঁর শাসিত সেই রাজ্য অভিহিত হয় 'মল্লভূম' নামে। আর সেই অবিস্মরণীয় দিনকে স্মরণীয় করবার জন্য সেই থেকে এক অব্দের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার নাম হয় মল্লাব্দ। তখন থেকেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের সব কাজে মল্লাব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বর্তমান-কাল পর্যন্ত তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ফলকে তা উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

কিন্তু তবুও এমন ব্যক্তি আছেন যাঁরা বলেন মহারাজ বীর হাম্বিরের সময় কৃষ্টিমূলক অগ্রগতিকে চিহ্নিত করবার জন্য ঐ সময় থেকে তিনিই উক্ত অব্দ চালু করেছেন। কিন্তু তা যে কত বড় ভুল, যে-কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি একটুখানি চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। বিষ্ণুপুরের কৃষ্টিমূলক অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছে মহারাজ বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পরবর্তী কাল থেকে। কিন্তু তখন তিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' মন্ত্রের উপাসক আমিত্বের অহমিকা বর্জিত পরম বৈষ্ণব। নিজেদের গরিমা বা কৃতিত্বকে ঐভাবে চিহ্নিত করবার সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। আর ঐ জন্যই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চে কোন প্রতিষ্ঠা ফলক তিনি দেননি। সেই ব্যক্তি, পরম বৈষ্ণব সত্যাশ্রয়ী বীর-হাম্বির, ঐ মতন মিথ্যাচারে লিপ্ত হবেন, এ ধারণা আকাশকুসুমের চেয়েও অলীক। মল্লাব্দের বর্ষ গণনার প্রথম দিন ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ ও বাংলা ১০১ সালের ইন্দ্রদ্বাদশী তিথি। আর তার জন্যই ত ঐ দিনে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত দিন উক্ত মল্লাব্দের ঘোষণা করার ব্যবস্থা। এখানের চলতি ভাষায় বলা হয় তাকে 'সন্ পেটা'। এখানের শাঁখারীবাজার মহল্লার

অধিবাসী পণ্ডিত উপাধিধারী কর্মকারেরা ঘোষিত করতেন উক্ত অব্দ। আমি নিজে তা দেখেছি এবং বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তাঁদের দেওয়া আছে। তাঁদের হাতে তাম্রবলয় ধারণের সময় ব্রাহ্মণদের উপনয়নের মতন মস্তক-মুণ্ডন, ব্রহ্মচারীবেশ ধারণ, ভিক্ষাপুত্র বাহির এমন কি সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত দিয়ে, এক বিষ্ণুপূজা ব্যতীত সব পূজার অধিকার তাঁদের দেওয়া আছে। আজও সাধারণভাবে তাঁরা দুর্গাপূজা পর্যন্ত করে থাকেন।

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করার এও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কথিত আছে যোতবিহারের সিংহাসন লাভের পরই তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতন পঞ্চানন ঘোষালকে তাঁর পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন রঘুনাথ। প্রদ্যুম্ন-পুরের আধিপত্য লাভ করে মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন প্রধান পরামর্শদাতার পদে। সেই থেকে ঘোষালের পরিবর্তে উপাধি হয় তাঁর মহাপাত্র। আজও তাঁর বংশধরগণের সেই মহাপাত্র উপাধি বর্তমান।

পঞ্চানন ঘোষাল ছিলেন মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা চাণক্যের মতন। মহারাজ আদিমল্ল তাঁর উপদেশ না নিয়ে কোন কাজ করতেন না। এমনকি রাজ্য বিস্তার প্রভৃতির জন্য যখন তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন, সেই সময় পঞ্চানন মহাপাত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজকার্য পর্যন্ত পরিচালনা করতেন। তাঁর বংশপরম্পরায় চলে আসছে সেই রীতি। আজও মহাপাত্র উপাধিধারী তাঁর বংশধরেরা বিষ্ণুপুর রাজবংশের পৌরোহিত্য করেন এবং বিষ্ণুপুররাজের নির্দেশ মতন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজকার্য সম্পন্ন করে থাকেন।

রঘুনাথ বা আদিমল্ল প্রথমে যোতবিহার নামে যে রাজ্যের অধিপতি হন সেই যোতবিহার রাজ্য দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানায় অবস্থিত।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে, সে-সময় যোজনান্তর এক একজন রাজা রাজত্ব করতেন, আর সুযোগ পেলে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যসীমা বাড়াতেন। রঘুনাথও আদিমল্ল নাম গ্রহণ করে মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তাঁর দুর্ধর্ষ শক্তি দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে মল্লভূমের রাজ্যসীমা বাড়াতে থাকেন।

অনেকে বলেন যোতবিহারের অধিপতি থাকাকালীন অবস্থায় তিনি তাই করেন। তাই তাঁর সেই শৌর্যে শঙ্কিত হয়ে নৃসিংহদেব তাঁর সেই শক্তিকে নষ্ট করবার উপায় খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। তার পূর্বেই এক

সাঁওতাল সর্দারের সঙ্গে রঘুনাথের বন্ধুত্ব হয় এবং নৃসিংহদেবের সেই দুরভিসন্ধির কথা অবগত হয়ে সেই সাঁওতাল সর্দারের সহায়তায় প্রদ্যুম্নপুর দুর্গ আক্রমণ করে সব দুরাশার তিনি পরিসমাপ্তি করে দেন। সেই প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় প্রদ্যুম্নপুরের বাহিনী। আর আত্মরক্ষার আশায় পলায়ন করতে গিয়ে, সাঁওতালদের তীরের আঘাতে আহত হয়ে, অন্তঃপুর সংলগ্ন জলাশয় কানাইসায়রে পড়ে গিয়ে মারা যান রাজা।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? যোতবিহারের অধিপতি থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ত সামন্ত নৃপতি। তখন রাজ্যসীমা বর্ধিত করার অর্থ নৃসিংহদেবেরই রাজ্যসীমা বর্ধিত করা এবং তার অর্থ নৃসিংহদেবেরই কল্যাণ করা। যার ফলে মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ও কাহিনী অমূলক। দ্বিতীয়ত ঐ শেষোক্ত কাহিনী দেবচরিত্র রঘুনাথ ও নৃসিংহদেব উভয়েরই চরিত্রের বিপরীত ভাবাপন্ন, অবাস্তবতার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু প্রথমের কাহিনী তা নয়। উভয়েরই চরিত্রের উপযোগী দেবত্বের প্রভায় উজ্জ্বল। কিন্তু উভয় কাহিনীই সাঁওতালদের নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী। বাউরী, বাগ্দী, মাল প্রভৃতি অন্য কোন জাতিকে নিয়ে নয়।

মহারাজ আদিমল্ল ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭১০ ও ১ থেকে ১৬ মল্লাব্দ পর্যন্ত মাত্র ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর দুর্ধর্ষ শক্তি দিয়ে বহু রাজাকে পরাজিত করে মল্লভূমের রাজ্যসীমা তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে যান।

সে এক স্মরণীয় কাল। ভারতে মুসলিম শক্তির তখনও অভ্যুদয় হয়নি। সারা ভারতবর্ষে তখন হিন্দুর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, সবকিছু দিক দিয়ে হিন্দুসভ্যতা, হিন্দুকৃষ্টি তখন পরিপূর্ণভাবে বর্তমান।

বাংলাদেশের অবস্থাও তখন সম্পূর্ণভাবে আর্যভাবাপন্ন। ইতিহাসে দেখা যায়, ঐ সময়ের বহু পূর্বেই, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এমনকি তার আগের থেকে আর্যেরা যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে এসে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যদের ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তার মধ্যেও মল্লভূমেই তাঁদের প্রভাব প্রথম এবং বেশী হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ মল্লভূমই বাংলাদেশে আসার তাঁদের প্রবেশ পথ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ষোড়শ মল্লাব্দে মহারাজ আদিমল্লের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয়মল্ল, খড়্গমল্ল, জগৎমল্ল প্রভৃতি নরপতিগণ, বিখ্যাত বিষ্ণুপুর নগর ও সুপ্রসিদ্ধা মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

আদিমল্লের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র **জয়মল্ল** মল্লভূমের অধীশ্বর হন। ভারতবর্ষে যখন মুসলিম শক্তির প্রথম অভ্যুদয় হয়—ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের প্রেরিত বাহিনী যখন উপর্যুপরি দুবার পরাজিত হয়ে ফিরে যাবার পর তৃতীয়বার মহম্মদ বিনকাশেম যখন সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। মল্লভূমের দ্বিতীয় অধীশ্বর জয়মল্ল সেই সমসাময়িক।

কিশোর বয়সে গোচারণকালে বনের মাঝে তাঁর নিদ্রিত পিতা রঘুনাথ বা আদিমল্লের মুখ সূর্যকিরণ থেকে আড়াল করবার জন্য বন্যভুজঙ্গ যেখানে ফণা বিস্তার করেছিল, মহারাজ জয়মল্ল দণ্ডেশ্বরী নামে সেখানে এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। সেই দণ্ডেশ্বরী দেবী আজও বর্তমান।

কিন্তু দেবী তখন প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর ও তাঁর নিকটবর্তী আরও তিন দেবতার শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর বহু পরবর্তীকালে। বাংলা ত্রয়োদশ শতকে। ১২৪৮ সালে দণ্ডেশ্বরী দেবীর পঞ্চরত্ন, ১২৫১ সালে দামোদরের পঞ্চরত্ন এবং ১২৫২ ও ১২৫৩ সালে নির্মিত হয়েছে শান্তিনাথ ও রামেশ্বরের শিবমন্দির।

তারমধ্যে উক্ত দণ্ডেশ্বরী দেবীই বিশেষ প্রসিদ্ধা। এই দণ্ডেশ্বরী দেবীর কৃপায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, বিশেষতঃ বদ্ধ পাগল ও সর্পাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি নিরাময় হয়ে থাকে। ঐ দেবীর প্রত্যাদেশ মতন প্রতি বারো বৎসর অন্তর সরলা নামে সেখানে এক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। গত বাংলা ১৩৬৬ সালের ৯ই কার্ত্তিক মহাসমারোহে সেই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহারাজ জয়মল্ল অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ আত্মীয় বৎসল রাজা ছিলেন। নিজের বংশপরিচয় অবগত হয়ে রাজস্থান থেকে নিজের পিতৃব্যপুত্র ও আরও সব আত্মীয় স্বজনদের আনয়ন করে, তাঁদের বাসের জন্য স্বতন্ত্র গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর পূর্বপুরুষদের অধিষ্ঠান ভূমি জয়পুরের নামে তার নাম দেন জয়পুর। আজও সেই জয়পুর গ্রাম বর্তমান।

মহারাজ জয়মল্ল চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দীনুসিংহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, প্রদ্যুম্নপুরের অধিপতি নৃসিংহদেবকে পরাজিত করে জয়মল্ল তাঁর রাজ্য অধিকার করেছিলেন।

কিন্তু তা যে একেবারে ভুল তার প্রমাণ, নৃসিংহদেবের অধীনস্থ সামন্ত থাকা-কালীন অবস্থায় আদিমল্ল যদি মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নৃসিংহদেব তা সহ্য করতেন না। সেই সময়েই তাঁদের উভয়ের মধ্যে এমন সংঘর্ষ বাধত যার ফলে একজন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু মল্লভূম রাজ্য সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়েছিল সম্পূর্ণ ন্যায়ের ভিত্তিতে, রঘুনাথ বা আদিমল্লের অসীম অধ্যবসায়ের ফলে প্রদ্যুম্নপুরে। যোতবিহার রাজ্যের অধিপতি থাকাকালীন অবস্থায় নয়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর, দ্বিতীয় বিষ্ণুপুর। জয়মল্লের সময়ে কোন সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় না। মল্লভূমের রাজ্যসীমা তাঁর পিতা আদিমল্লের প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং ৭২০ খৃষ্টাব্দ ও ২৬ মল্লাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ৯৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আড়াইশত বৎসরেরও অধিককাল মল্লভূমের আরও ১৬ জন নরপতি গত হয়ে যান প্রায় তাঁরই মতন গতানুগতিক অবস্থায়। তার মধ্যে **অষ্টম রাজা শূরমল্ল** বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বগড়ী ভূখণ্ড ও **দ্বাদশ রাজা খড়গমল্ল** উক্ত মেদিনীপুর জেলারই খড়্গপুর ভূখণ্ড জয় করে মল্লভূমের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর নিজের নামে সেখানের নামকরণ করেন 'খড়্গপুর' বলে। বর্তমান সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল খড়্গপুর আজও তাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে। আর চতুর্দশ নরপতি যাদবমল্ল বিষ্ণুপুর নগর থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত যাদবনগর গ্রাম ও সেখানের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। কিন্তু এখন আর সে ঘাঁটির কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যাদবনগর গ্রাম এখনও বর্তমান।

তারপর তার পরবর্তী **জগন্নাথমল্ল, বিরাটমল্ল** প্রভৃতি আরও কয়েকজন নরপতি গত হবার পর ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে **দুর্গাদাসমল্ল** মল্লভূমের অধিপতি হন। শাহীবংশীয় রাজা জয়পালকে পরাজিত করে গজনীরাজ সবুক্তিগীন যখন সিন্ধুনদের পশ্চিমতট পর্যন্ত সেখানের সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন এই দুর্গাদাসমল্ল সেই সমসাময়িক। তারপর ৯৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় উনবিংশ রাজা জগৎমল্লের রাজত্বকাল। সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর গজনীর সিংহাসন অধিকার করে সুলতান মামুদ যখন ভারতবর্ষের দিকে তাঁর শ্যেন দৃষ্টি প্রসারিত করেন এবং পেশোয়ারের নিকট যুদ্ধে বৃদ্ধরাজা জয়পালকে পরাজিত করে তাঁর ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত করেন ইনি সেই সমসাময়িক।

মল্লভূমের বিখ্যাত রাজধানী বিষ্ণুপুরের তখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখনও তার মাটি ছিল দুর্গম বনানীর মাঝে মুখ লুকিয়ে তার আদিম বন্যতায় বিভোর! অসংখ্য বন্যজন্তুর বাসভূমি। তারপর আসে তার আত্মপ্রকাশের দিন। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

বিষ্ণুপুরকে অনেকে বনবিষ্ণুপুর বলে থাকেন। কারণ, বিষ্ণুপুর ভূখণ্ড তখন ভয়াল অরণ্যে পরিণত ছিল। অতিবড় দুঃসাহসী বীরপুরুষও সেখানে প্রবেশ করতে সাহসী হতেন না।

কিন্তু ভগবানের বিচিত্র লীলা! বিষ্ণুপুর রাজবংশের অষ্টাদশ পুরুষগতে উনবিংশ রাজা জগৎমল্ল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মল্লভূমের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে শিকারের অন্বেষণে বের হয়ে একাকী পথভ্রষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হন সেই অরণ্যে। কিন্তু তার গভীরতা দেখে বুক তাঁর কেঁপে ওঠে! নীরবে চিন্তা করতে থাকেন সামনের দিকে আর অগ্রসর হবেন কিনা। এমন সময় ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা। ছিন্ন হয় তাঁর সেই চিন্তাসূত্র! তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয় অপরূপ কান্তি এক মৃগ। মুখে যেন তার যাদু, চোখে যেন কিসের এক মহা আকর্ষণ, যার ফলে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর চলে যায়। বহু আকাঙ্ক্ষিত তাঁর সেই শিকারকে দেখে উদ্যত অস্ত্র হাতে ছুটে যান তার পিছনে। তাকে লক্ষ্য করে অস্ত্রও হানেন। কিন্তু তাতে তার কিছুই হয় না। নিরর্থক হয় তাঁর সব প্রচেষ্টা। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আলেয়ার আলোর মতন কোথায় যেন মিলিয়ে যায় সে।

তখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন, বর্তমানে যেখানে মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ী মায়ের শ্রীমন্দির রয়েছে, সেখানে। সেখানের অরণ্য যেন আরও গভীর আরও ভয়াল! ঘনবৃক্ষ ও লতা-গুল্মের মাঝে মৃত্যু যেন সেখানে ওত পেতে আছে। তাই সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা না করে তিনি ফেরবার সঙ্কল্প করেন। এমন সময় দৃষ্টি পড়ে তাঁর সেখানের বিশাল চারুলতা গাছের ওপর অবস্থিত এক বকের ওপর। তিনি দেখেন এক বক পাখী সেই গাছের ওপর থেকে তাঁর সঙ্গের শিকারী বাজকে দেখে আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে গর্জন করছে! তাঁর সেই বাজও তখন ক্ষুধার তাড়নায় অধীর। সেও তার সেই শিকারকে দেখে শুরু করেছে গর্জাতে। তাই তিনি তার বাঁধন খুলে দেন। প্রচণ্ড উল্লাসে উড়ে যায় সে বকের দিকে। কিন্তু তাতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বককে হত্যা করে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করা দূরে থাক, পক্ষীজাতির বাঘ সেই ক্ষুধাতুর বাজ, বকের নিকটবর্তী হয়েই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে তাঁর

কাছে। তাই সেই বিপরীত অবস্থা দেখে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে যান তিনি খুবই। কিন্তু তারপর বাজের ওপর বিরক্ত হয়ে, আবার পাঠান তাকে তিনি বকের উদ্দেশে।

ফল হয় তাতে আরও বিপরীত। এবার বাজ আর শুধু ফিরে আসে না— বকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসে আর্তনাদ করতে করতে। আর সেই সঙ্গে মৃগের মতন কোথায় মিলিয়ে যায় সেই বকও। বহু চেষ্টা করেও কোথাও পান না রাজা তার খোঁজ। সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যান তিনি। চিন্তার ঝড় বইতে থাকে তাঁর অন্তরে।

এমন সময় ঘটে আরও এক অদ্ভুত ঘটনা! তাঁর চোখের সামনে জেগে ওঠে যেন রূপকথার মায়ালোকের মতন এক ছবি। যেখানে প্রবেশ করতে তাঁর মতন সশস্ত্র-শক্তিমান পুরুষ ভয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছে। সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝে তিনি দেখতে পান এক নারী মূর্তি। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে সমস্ত অন্তর যেন তাঁর আবিষ্ট হয়ে আসে।

তবুও তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেন না। সেই অপরিচিতার উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, কে তুমি অসমসাহসিকা নারী? কি তোমার পরিচয়? কি জন্য একাকিনী এসেছ এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে?

কিন্তু উপেক্ষিত হয় তাঁর সে আদেশ। কোন উত্তরই সে দেয় না। তাই তিনি স্থির থাকতে পারেন না। তার সেই ধৃষ্টতার শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত অস্ত্র হাতে ছুটে যান সেইদিকে। ফল হয় তাতে বিপরীত। রহস্য হয়ে ওঠে আরও গভীর আরও ভয়াল।

প্রবাদ আছে—সেই সময় শুব্ধ বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেদ করে জেগে ওঠে এক অট্টহাসি। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হয়ে যায় সেই মূর্তি। তখন একের পর এক সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয় পান রাজা। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর প্রাণ। তিনি স্মরণ করেন তাঁর ইষ্টদেবীর নাম।

আরও এক অভিনব ঘটনা! সেই সময় জেগে ওঠে এক অভয়বাণী; ওরে অবোধ, এখনও তোর সংশয় দূর হল না? জ্ঞান এল না? ও মৃগ নয়, বক নয়, নারী নয়, আমি! দেবী মৃন্ময়ী। আমি এখানে আছি! তাই এই স্থানের আত্মরক্ষা করবার এক মহাশক্তি আছে। তোদের বংশের ওপর অতি তুষ্টা আমি। তাই তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য শিকারের আকর্ষণে প্রলুব্ধ করে এখানে তোকে নিয়ে এসেছি। এখানে এক সুদৃঢ় গড় তৈরী করে তোর রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে আয়।

বর্তমানে যেখানে মৃন্ময়ী দেবীর প্রতিমা রয়েছে, সেই স্থান নির্দেশ করে তিনি বলেন : ওখানের মাটি খুঁড়লে—আমার মুখের এক ক্ষুদ্র আকৃতি পাবি। তাকে মধ্যে দিয়ে আমার এক প্রতিমা গড়িয়ে ওখানে প্রতিষ্ঠা কর। তোদের প্রভূত কল্যাণ হবে।

তারপর নীরব হয়ে যায় সেই বাণী। অভিভূত রাজা এক অপূর্ব ভাব নিয়ে ফিরে যান প্রদ্যুম্নপুরে। আর তার পরবর্তীকাল থেকে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই অরণ্যকে অপসারিত করে সেখানে গড়ে তোলেন তাঁর স্বপ্ননগরী। আর মৃন্ময়ীদেবীর প্রত্যাদেশ মতন তাঁর নির্দেশিত স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন মৃন্ময়ীমূর্তি। কুশের ঘাস আর গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী হয় প্রতিমা। আর তাঁর বক্ষের মাঝে দেওয়া হয় সেখানের মাটি খুঁড়ে পাওয়া তাঁর মুখের আকৃতি।

প্রতিষ্ঠার কাল ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ, ৩০৩ মল্লাব্দ, বাংলা ৪০৪ সাল। কিন্তু ঠিক কোন সূত্রে, কি কারণবশত তাঁর প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম বিষ্ণুপুর হয়েছে, তার সঠিক বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না।

অনেকেই বলেন—তাঁদের কুলদেবতা বাসুদেব নাম থেকে বিষ্ণুপুর নাম হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কুলদেবতার বাসুদেব বলে নাম পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় অনন্তদেব বলে। তাই মনে হয়, বাসুদেব বলে কোন দেবতার নামে নাম হয়নি। বৈষ্ণবী শক্তির প্রত্যাদেশ মতন নগর গঠিত হয়েছে বলে নগরের নাম হয়েছে বিষ্ণুপুর। এও হতে পারে সাধারণ দৃষ্টিতে শাক্ত হলেও তিনি সব শক্তির আধার। আর এক তথ্য, বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তের যেখানে মদনমোহন দেবের শ্রীমন্দির, রাধাকান্ত জীউয়ের ধ্বংসপ্রায় শ্রীমন্দির, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্‌দের পল্লী প্রভৃতি রয়েছে।

মহারাজ জগৎমল্ল কর্তৃক নগর নির্মিত হবার পূর্বে, বিষ্ণুপুর নামে ওখানে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। পরে জগৎমল্ল কর্তৃক নগর নির্মিত হয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু নাম লুপ্ত হয় না। সেই নামেই সমগ্র নগরের নাম হয় বিষ্ণুপুর। এও হতে পারে। এবং মনে হয়, তাই হয়েছে। ঐ তথ্যই সত্য। কারণ ওখানে অতীতের অস্থায়ী রাজ ভবনের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন কয়েক দশক পূর্ব পর্যন্ত ছিল, আমি নিজে তা দেখেছি। তারপর ওখানের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী রামসুন্দর চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি সেই ধ্বংসাবশেষকে সরিয়ে ওখানে এক কাঠের কারখানা করেন। তাই তার কোন নিদর্শন এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু সেখানের অন্তঃপুর সংলগ্ন যে পুষ্করিণী, তা এখনও বর্তমান। অন্তঃপুরের ভেতরের পুষ্করিণী বলে এখনও তা ভেতর পুকুর নামে পরিচিত।

কথিত আছে—মহারাজ জগৎমল্ল সুন্দর রাজপ্রাসাদ, প্রেক্ষাগৃহ, উদ্যান বাটি, বিরাম কুঞ্জ, প্রশস্ত রাজপথ, দেবালয়, বিদ্যালয়, শস্যাগার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, সেনানিবাস, অশ্বশালা, গজশালা, সুসজ্জিত বিপণি প্রভৃতি তৈরী করিয়ে ও বাইরে থেকে বহু শিল্পী, বণিক, জ্ঞানী, গুণী প্রভৃতিকে বিষ্ণুপুরে আনিয়ে, স্থায়ী ভাবে তাঁদের বাসের ব্যবস্থা করে বিষ্ণুপুরকে প্রাচ্যের এক বিশিষ্ট নগরীতে পরিণত করেন। আর তার পরবর্তী কাল থেকেই শৌর্য, বীর্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে, বিষ্ণুপুর ও তার নরপতিদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, আদি রাজা আদিমল্লই বিষ্ণুপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। জগৎমল্ল শুধু শস্যাগার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, সেনানিবাস, সুরম্য রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি তৈরী করিয়েছিলেন।

কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাহলে জগৎমল্লের পূর্ববর্তী আঠারজন নরপতির রাজত্বকালে রাজধানী ও রাজাদের অপরিহার্য বস্তু, অস্ত্রাগার, ধনাগার, সেনানিবাস, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি কিছুই ছিল না? জগৎমল্লের পূর্ববর্তী আঠারজন নরপতির রাজত্বকালে রাজধানী বলে অভিহিতা হয়েও, বিষ্ণুপুর কি তাহলে ঐ সমস্ত রাজসিক সম্পদ বর্জিত অতি সাধারণ এক গ্রামের মতন ছিল? জগৎমল্লের পূর্ববর্তী নরপতিগণ কি তাহলে ঐ সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় রাজসিক সম্পদ বর্জিত অবস্থায়, সাধারণ গৃহস্থের মতন কাল কাটিয়ে রাজ্যশাসন করে গেছেন?

না, তা নয়। সুন্দরের পূজারী মহারাজ জগৎমল্লই বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তাঁর সৌন্দর্য প্রিয় শিল্পী মন দিয়ে বিষ্ণুপুর প্রতিষ্ঠার সময়েই ঐমতন সুন্দরভাবে তাকে তৈরী করিয়েছিলেন। মহারাজ জগৎমল্ল ৪৩ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে তাঁর অসীম অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দিয়ে ঐ সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করেন।

ইনি গোবিন্দ সিংহের কন্যা চন্দ্রাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। শূন্যপুরাণ প্রণেতা রমাই পণ্ডিত এঁরই সময়ে বিষ্ণুপুরের প্রায় ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, জন্মস্থান নয়, ময়নাপুর ছিল তাঁর কর্মস্থান। যাইহোক তিনি ঐ সমসাময়িক ব্যক্তি। জন্মস্থান যদিও অন্য কোথাও হয়, কর্মস্থান তাঁর মল্লভূম। আর তারই জন্য তাঁর প্রবর্তিত ধর্মঠাকুরের সংখ্যা ছিল এখানে অনেক বেশী। বর্তমানেও তার কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৩১৩ মল্লাব্দে মহারাজ জগৎমল্লের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সুবর্ণযুগ

জগৎমল্লের পরবর্তী অনন্তমল্ল, রামমল্ল, শিবসিংমল্ল হাম্বিরমল্ল প্রভৃতি রাজাগণ ; বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যার প্রচলন ; তার শৌর্য বীর্য ; শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণের বিষ্ণুপুর আগমন ; মণিমঞ্জুষা গ্রন্থ হরণ, বিষ্ণুপুর রাজবংশের 'দেব'-উপাধি লাভ ও বিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ আনয়নের কাহিনী।

মহারাজ জগৎমল্লের পর বিংশ নরপতি **অনন্তমল্ল** বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আনন্দপালের নেতৃত্বে দিল্লী, আজমীর, কনৌজ প্রভৃতি রাজ্যের মিলিত শক্তি যখন উন্দের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলতান মামুদের গতি ভারতের বুকে অপ্রতিহত করে তোলে, মহারাজ অনন্তমল্ল সেই সমসাময়িক। এঁর সময় থেকে ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জীবনমল্লের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দী কাল ১৩ জন নরপতির রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা পাওয়া যায়না। এঁরাও একের পর এক গত হয়ে যান গতানুগতিক অবস্থায়। তার মধ্যে ষটবিংশ রাজা **প্রকাশমল্ল** দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী প্রকাশ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। নদের তীরবর্তী ঐ গ্রাম একসময় বিষ্ণুপুরের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বর্ষাকালে দ্বারকেশ্বর নদের বন্যার সময় নৌকাযোগে ঐ পথে বহু জিনিস আমদানী রপ্তানী হত। কিন্তু এখন আর তার কোন শ্রী-সমৃদ্ধি নেই। বর্তমানে এই গ্রাম অখ্যাত অবজ্ঞাত এক ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়েছে। তারপর ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় মহারাজ **রামমল্লের** রাজত্বকাল।

মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে ইতিহাস প্রসিদ্ধ তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের পরাজয় হয়ে ভারতে যখন স্থায়ী মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, কুতবউদ্দিন আইবক যখন ভারতের প্রথম সুলতানরূপে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি সেই সমসাময়িক। ইনি নন্দলাল সিংহের কন্যা সুকুমারীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি বিষ্ণুপুর দুর্গের প্রভূত উন্নতিসাধন ও বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র ও

প্রচুর সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি করে, বিষ্ণুপুরকে এমন এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন যার জন্য বাইরে থেকে কোন পরাক্রান্ত শক্তিও তখন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে বা তার বিরুদ্ধাচারী হতে সাহসী হত না। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরকাল পরাক্রমের সঙ্গে রাজ্যশাসন করে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৫১৫ মল্লাব্দে তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়।

এঁর পরবর্তী নরপতি **গোবিন্দমল্লের** রাজত্বকাল থেকে ষটত্রিংশ নরপতি **কাটারমল্লের** রাজত্বকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনরায় শুরু হয় নিষ্ক্রিয়তা।

তারপর ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় সপ্তত্রিংশ নরপতি **পৃথ্বিমল্লের** রাজত্বকাল। আলাউদ্দিনের প্রচণ্ড আক্রমণে মেবারের রাজধানী চিতোর যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, অন্য কোন উপায় নেই দেখে মহারাণী পদ্মিনী প্রভৃতি রাজপুত রমনীগণ যখন নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করে জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করতে বাধ্য হন, ইনি সেই সম-সাময়িক। এঁর সময় থেকে মল্লভূমে মন্দিরের যুগ আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দ ও ৬০৬ মল্লাব্দে ইনি বিষ্ণুপুর নগরের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত ডিহর নামক গ্রামের বিখ্যাত সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের শ্রীমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সারেশ্বর শিবের মন্দিরে হত্যা দিয়ে তাঁর স্বপ্নাদ্য ঔষধে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হন। সেখানে প্রতি সোমবার ও আরও সব বিশিষ্ট দিনে বহু ভক্তপ্রাণ নরনারীর সমাবেশ হয়। এবং প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীর মেলা ও চৈত্রের শেষে গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

৬২৫ মল্লাব্দে মহারাজ পৃথ্বিমল্ল পৃথ্বি থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর তার পরবর্তী **তপঃমল্ল, দীনবন্ধুমল্ল,** প্রভৃতি গতানুগতিক অবস্থায় গত হবার পর আসে বিষ্ণুপুর ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় মহারাজ **শিবসিংমল্লের** রাজত্বকাল। ইনি দিল্লীর সুলতান মামুদ তুঘলুক ও দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ কালের সম-সাময়িক। ইনি নিজে সঙ্গীত প্রিয় ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

সুর ব্রহ্ম। সুরের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মের আরাধনার কাজেই তাকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন আর্যেরা। দেব-দেবীর আরাধনার মন্ত্র, তাঁদের স্তোত্র প্রভৃতি বিশুদ্ধ রাগ-রাগিনীর সহযোগে তন্ময় হয়ে নিবেদন করতেন তাঁরা তাঁদের ইষ্টের উদ্দেশে। বাংলাদেশ ছিল অনার্য অধ্যুষিত। পূর্বেই উল্লিখিত আছে ইতিহাসে

দেখা যায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী, এমনকি তারও পূর্বের থেকে আর্যেরা নানা ভাবে বাংলাদেশে এসে সেখানে তাঁদের প্রভাব বিস্তারের কাজ আরম্ভ করে পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তা শেষ করতে সক্ষম হন। ঐসময় থেকেই তাঁদের ধর্ম আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত তাঁদের কৃষ্টির প্রধান অঙ্গ। তাই সেও প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ভাবে। কিন্তু তার প্রয়োগ চলে দেব-দেবীর আরাধনার উদ্দেশে। মহারাজ শিবসিংমল্ল তা ব্যতীত, মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য তাকে বিষ্ণুপুর রাজসভায় স্থান দেন। সেই থেকে তার ধারা চলে আসে অবিচ্ছিন্নভাবে, যার ফলে পরবর্তীকালে তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরকে অভিহিত করে দ্বিতীয় দিল্লী আখ্যায়। এনে দেয় তাকে সর্বভারতীয় খ্যাতির সম্মান। এবং আজও সেই অম্লান-জ্যোতি রেখেছে তাকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে। মহারাজ শিবসিংমল্ল দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল রাজ্যশাসন ও সঙ্গীতের সাধনা করে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ ও ৭১৩ মল্লাব্দে পরলোক গমন করেন।

তারপর ১৪০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত **মদনমল্ল, উদয়মল্ল** প্রভৃতি কয়েকজন নরপতি সাধারণভাবে গত হবার পর ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয় **মহারাজ চন্দ্রমল্লের** রাজত্বকাল। ইনি বাংলার জনপ্রিয় অধিপতি হুশেনশাহ ও প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। সেই জন্য একদিক দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল মানবজাতির এক স্মরণীয় কাল। উক্ত সময়ে ঐ বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় এবং তাঁর প্রবর্তিত মহান বৈষ্ণব ধর্মই বিষ্ণুপুরকে কৃষ্টিমূলক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিখ্যাত করে তোলে। তাকে সর্বভারতীয় খ্যাতির অম্লান সম্মান এনে দেয়। নৈতিক উন্নতির দিক দিয়েও নিয়ে যায় তাকে চরম পর্যায়ে। তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই মহাপুরুষের পরিচয় এখানে দিলাম। এক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য ও অপরূপ! আজ পর্যন্ত জগতে যত মহাপুরুষ, যত ধর্ম প্রচারক জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই উপদেশ ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁদের মত ও পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এমন সহজ, সরল, সুন্দর পথের নির্দেশ আর কেউ দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। ইনি প্রেমাশ্রু ও প্রাণমাতান হরিনাম গানের ভেতর দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করে গেছেন, এত সহজে আর কেউ তা পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর মহান উপদেশ :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরি॥

আর শুধু মুখে বলা নয়, তাঁর জীবনে মনে-প্রাণে তিনি সেই মহান নীতি-বাক্য পালন করে গেছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দিগ্বিজয়ী প্রতিভা, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ও অহমিকার কালিকা লেপন করতে পারেনি। অতি নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি যখন পুরীধামে যান, তখন সেখানকার পণ্ডিত শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে তিরস্কার করেন। বলেন, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্য নও। আমার কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শোন। তারপর সাত-দিন ধরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁকে শোনান।

প্রেমের সাধক সেই তরুণ সন্ন্যাসী, মাথা নত করে বসে নীরবে তা শোনেন। তাই দারুণ সন্দেহ হয় সার্বভৌমের মনে! ব্যাখ্যা শেষে তাঁকে তিনি বলেন, তোমার অগাধ প্রতিভার কথা লোকমুখে আমি শুনেছি। কিন্তু আমার এই দীর্ঘ ব্যাখ্যার সময় একটি কথাও তুমি বলনি। তুমি কি আমার কথা শোননি?

শ্রীচৈতন্য বলেন, শুনেছি। কিন্তু আপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলব? আমি অন্যরূপ বুঝেছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান যেন সার্বভৌম! আপন মনে তিনি বলেন, সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, এই তরুণ তাপস তা অন্যভাবে বুঝেছে!

তারপর শ্রীচৈতন্য যখন ব্যাখ্যা করেন, তখন সব ভুল তাঁর ভেঙ্গে যায়। তিনি বুঝতে পারেন প্রবীণতা, পাণ্ডিত্য সব কিছুই প্রতিভার কাছে ভেসে যায়। শ্রীচৈতন্যের যুক্তির কাছে সব পাণ্ডিত্য লয় হয়ে গিয়ে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ নিসৃত হরিনামের অপূর্ব মহিমায়, তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান, পরাজয়ের গ্লানি সব কিছু দূর হয়ে গিয়ে, তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন, যার জন্যে প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যাভিমানী বৃদ্ধ সেই তরুণ তাপসকে দেবতার আসনে বসিয়ে শ্লোকচ্ছন্দে তাঁর স্তবগান আরম্ভ করেন, শ্রীচৈতন্যের এমন অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে কিছুতেই তাঁর অদর্শন সহ্য করতে পারেন না।

"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরে যায়,
প্রভুর বিরহ বাণ সহা নাহি যায়।"

তারপর ভারতের আর একজন সর্বশাস্ত্র বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীও প্রথমে শ্রীচৈতন্যের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন।

তারপর তাঁর অপরূপ ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে, সেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, সেই তরুণ তাপসকে তিনিও গুরু বলে স্বীকার করেন।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ চুণ্ডিরামতীর্থ, ভারতী গোঁসাই প্রভৃতিরও ঐ একই রকম অবস্থা হয়। আর শুধু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাই নন, ভারতের বিভিন্ন স্থানের কত বারনারী, দস্যু প্রভৃতি দুশ্চরিত্রেরাও তাঁর অপার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সংসারের সবকিছু পরিত্যাগ করে। তার মধ্যে নটিশ্রেষ্ঠা অপরূপ সুন্দরী বারমুখী, ইন্দিরাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, সত্যবাঈ, দস্যুনারোপী, ভীলপন্থ প্রভৃতি অন্যতম।

তারপর ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি, উড়িষ্যার রাজচক্রবর্তী প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত নরপতিগণ পর্যন্ত তাঁর শ্রীমুখ নিসৃত হরিনামের অপার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পিছনে অনুগত সেবকের মত ফিরেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মশায় তাঁর লিখিত 'বৃহৎবঙ্গে'র দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৬৮ ও ৭৬৯ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে লিখেছেন :

"চৈতন্যদেব ভগবানের অপূর্ব হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ স্বরূপ। তিনি শুধু তাঁহার ভগবদ্ভক্তিপ্রবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, সুনির্ম্মল মূর্ত্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোককে পাগল করেন নাই। তাঁহার প্রেম রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, উদ্ধারণদত্ত, নরোত্তম, বীরহাম্বির, চাঁদরায় প্রভৃতি রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিরা তাঁদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকটি এক একজন বুদ্ধের ন্যায়। এই বাংলাদেশে দীপঙ্কর, গোপীচন্দ্র হইতে লালাবাবু চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকল্প ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, জগতের এত স্বল্প পরিসর কোন দেশে বোধহয় এরূপ সংখ্যক রাজর্ষিদের উদয় হয় নাই। কিন্তু এই রাজর্ষিদের দেশেও ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে যতজন রাজতুল্য ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও ত্যাগের দেশ। এ হাটে ক্ষুদ্র কথা বিকায় না। এখানে জীবন-মরণ পায়ের ভৃত্য। কিন্তু তা ধ্বংসের জন্য নহে-প্রেমের জন্য। স্বদেশে অশ্রুর যে বল, অন্যত্র গোলা গুলি ও বারুদের সে বল নাই। চৈতন্য আনন্দাশ্রুর ওপর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তাঁর এই উচ্চ আদর্শ বুঝিতে পারিবে জানি না।"

মনে হয়, বিষ্ণুপুরেও সে সময় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মের ছোঁয়াচ কিছু লেগেছিল। তাই মহাশক্তি মৃন্ময়ীদেবীর উপাসক হয়েও মহারাজ চন্দ্রমল্ল বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ১২ মাইল পুর্বে গোকুল নগর ভূখণ্ডে গোকুলচাঁদ জীউ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং উক্ত গোকুলচাঁদ জীউয়ের নামে সেখানের নামকরণ করেন। আজও তার ধ্বংসাবশেষ সেখানে দেখা যায়।

মহারাজ চন্দ্রমল্ল দীর্ঘ ৪১ বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে রাজ্যশাসন করে ১৫০১ খৃষ্টাব্দ ও ৮০৭ মল্লাব্দে ইহলোক থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর ১৫০১ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন **বীরমল্ল**।

পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর যখন ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, ইনি সেই সমসাময়িক।

বাঁকুড়ার নিকটবর্তী এক্তেশ্বর শিবমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এবং এর পরবর্তীকাল থেকেই আরম্ভ হয় বিষ্ণুপুরের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ।

বীরমল্লের মৃত্যুর পর **ধাড়ীমল্ল** বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কেউ কেউ এঁকে ব্রীড়ামল্লও বলে থাকেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি বিখ্যাত পাঠান সম্রাট শেরশাহ, মোগল সম্রাট হুমায়ুন ও আকবর বাদশাহের সমকালীন। এঁর সময় থেকেই মল্লভূম রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রসিদ্ধ পাঠান শেরশাহ ও দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুন গত হবার পর তাঁর পুত্র আকবর দিল্লীর বাদশাহীতক্তে আরোহণ করেন। কিন্তু তখন তিনি ১৩ বৎসরের কিশোর। তাই তাঁকে নামে মাত্র বাদশাহ রেখে বৈরাম খাঁ নামে এক ব্যক্তি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেইভাবে চলতে থাকে। তারপর বৈরাম খাঁকে মক্কা যাবার আদেশ দিয়ে নিজে রাজ্যের সব কিছু ভার গ্রহণ করেন আকবর শাহ এবং সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যকে তিনি পনেরটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। আর প্রত্যেক সুবায় নাজিম বা সিপাহশালার নামে নিযুক্ত করেন এক একজন সামরিক কর্মচারী।

উড়িষ্যাসহ বাংলাও পরিণত হয় এক সুবায়। আর সেই সময় সেখানে যিনি নাজিম বা সিপাহশালার নিযুক্ত হন, তিনিই সর্বপ্রথম মল্লভূমকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ধার্য করেন তার রাজস্ব।

সেই রাজস্বের পরিমাণ হয় এক লক্ষ সাত হাজার টাকা। অনেকে বলেন এক লক্ষ আশী হাজার টাকা। আর নিরুপায় হয়ে আগ্নেয়াস্ত্রে বলীয়ান মোগলের সেই ঔদ্ধত্য মেনে নিতে বাধ্য হন ধাড়ীমল্ল, কিন্তু তা নামে মাত্র। নিয়মিত ভাবে সেই রাজস্ব আদায় তিনি কোন দিন দেননি। এমনকি মোগল সিপাহী শাস্ত্রীর দল বিষ্ণুপুর থেকে রাজস্ব আদায় করে নিয়ে যাবার সময় নিজের ছদ্মবেশী সৈন্য দিয়ে পথের মাঝে তিনি তা ছিনিয়ে নিতেন।

আর সেই পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার মত শক্তি অর্জনের জন্য,

সর্বপ্রথম বিষ্ণুপুরকে আগ্নেয়াস্ত্রে বলীয়ান করবার স্বপ্ন দেখেন তিনিই। বিপুল অর্থব্যয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে গড়ে তোলেন কামান, বন্দুক প্রভৃতি ভয়াল আগ্নেয়াস্ত্র।

বিষ্ণুপুর রাজদরবারের পূর্বপ্রান্তবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ স্থান এখনও কামান ঢালা নামে খ্যাত। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কামান তৈরীর কিছু কিছু নিদর্শন সেখানে দেখা যেত।

অনেকে মনে এঁর পূর্ববর্তী ত্রয়োবিংশ রাজা রামমল্লের রাজত্বকাল থেকেই বিষ্ণুপুরে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রথম প্রচলন শুরু হয় ইউরোপে, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে। তারপর ভারতবর্ষেও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের অভ্যুদয়ে – ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধে। মহারাজ রামমল্লের রাজত্বকালের তিন শতাব্দীরও অধিককাল পরে। সেইজন্য ধাড়িমল্লের রাজত্বকাল থেকে বিষ্ণুপুরে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রথম প্রচলনের তথ্য ও জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল। আর সেইজন্য তাঁর রাজত্বকাল বিষ্ণুপুর ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল। তারপর তাঁর মৃত্যুর পরেই আরম্ভ হয় বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সব চাইতে গৌরবময় অধ্যায়। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন শৌর্যবীর্য, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সবকিছু সৎগুণের আধার হাম্বিরমল্ল বা বীরহাম্বির।

মহারাজ হাম্বিরমল্ল ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দকে অনেকে এঁর অভিষেকের কাল বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাস অন্বেষণ করলেই সে ভ্রম সংশোধিত হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করার জন্যেই হাম্বিরমল্ল থেকে তিনি বীরহাম্বির আখ্যায় ভূষিত হন। আর বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তবর্তী যে প্রান্তরে দায়ুদ খাঁর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, এখনও সে জায়গা যুঝঘাটি বা দায়ুদঘাটা নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্বে ওখানের ঘাটির মাটির নীচে একটা কামান ও গোলা পাওয়া গিয়েছিল। বিষ্ণুপুর শহরের ফৌজদারী আদালতের সন্নিকটে সিমেন্টের বেদীর ওপর তাকে রাখা হয়েছে। আর ওখানের ঘাটি রক্ষক যাঁরা ছিলেন, তাদের বংশধরদের কাছে শোনা যায়, তাঁরা বলেন, ওখানের মাটির নীচে ঐমত কামান এখনও বহু আছে। সেইজন্য সব দিক দিয়ে বিচার করলে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, হাম্বিরমল্লের সঙ্গে দায়ুদ খাঁর যুদ্ধের তথ্য ও কিংবদন্তী সম্পূর্ণ সত্য।

কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে আকবর শাহের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও তোতরমল্লের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন সেই দায়ুদ খাঁ। আর মহারাজ ধাড়িমল্লের জীবিত কালে হাম্বিরমল্ল যুবরাজ থাকাকালীন অবস্থায় দায়ুদ খাঁয়ের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, আর তাতে জয়লাভ করে তাঁর সিংহাসন লাভের পূর্বেই তিনি বীরহাম্বির আখ্যা লাভ করেছিলেন, এমন কোন ঘটনার আভাস পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি যে নবীন বয়সে রাজ্যলাভ করেছিলেন সে তথ্য এবং জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাই হাম্বিরমল্লের রাজ্যাভিষেকের কাল যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে তা অবিসম্বাদিত সত্য।

ইনি বাংলার বার ভুঁইয়ার অন্যতম। কারণ—বাংলার আরও যে সব ভুঁইয়া রাজা ছিলেন, যেমন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ঈশা খাঁ প্রভৃতি। তাঁদের সকলেরই পতন হয়েছে। কিন্তু এঁর তা হয়নি। এঁর জীবনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম কর্মজীবন, দ্বিতীয় ধর্মজীবন। এবং উভয় জীবনই অতি-বাহিত হয়েছে অপ্রতিহত গতিতে। দুই জীবনই সাফল্যের প্রভায় উজ্জ্বল। আর শুধু তাঁরই নয় মল্লভূমের আরও অন্যান্য নরপতিদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। প্রায় দীর্ঘ একাদশ শতাব্দী ধরে শৌর্য, বীর্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলা-তথা ভারতের বুকে এক অতুলনীয় ইতিহাস তাঁরা রচনা করে গেছেন।

মহারাজ হাম্বিরমল্ল আকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমসাময়িক। এঁর মুক্তহস্ত দান সুদূর বৃন্দাবন ধাম পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইনি বিষ্ণুপুর শৌর্যের মধ্যমণি। বিষ্ণুপুরের দুর্গ ও সামরিক শক্তির ইনি চরম উন্নতি সাধন করেছিলেন। কথিত আছে—শিল্পী জগন্নাথ কর্মকার প্রভৃতিকে দিয়ে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান দলমর্দন ও আরও বহু কামান বন্দুক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। কারণ স্বাধীনতার লীলাভূমি বিষ্ণুপুরকে শুধু পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তার সঙ্গে দেখেছিলেন তিনি বাংলায় এক স্বাধীন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন। তাই নগরকে সুরক্ষিত করবার জন্য তার চারদিকে পরিখার পর পরিখা খনন ও প্রত্যেক পরিখা পাহাড়ের ওপর কামান সাজিয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বিষ্ণুপুরকে করেছিলেন তিনি দুর্ভেদ্য ও অজেয়।

বিপুল অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরশীলতা ও নির্ভীকতা ছিল তাঁর জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য। তাই রাজকর্মচারীদের ওপর নির্ভর করে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন না। নিজে পর্যবেক্ষণ করতেন সবকিছু।

কিংবদন্তীতে প্রকাশ, সেই বিষয় নিয়ে একদিন স্বয়ং মৃন্ময়ীদেবী তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে তিনি দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ পরিদর্শন করছিলেন। তখন নিশুতি রাত, নিরন্ধ্র অন্ধকার। নিস্তব্ধ ধরণী তন্দ্রায় মগ্ন। মাঝে মাঝে শোনা যায় শুধু রাত্রির পাখীর কণ্ঠস্বর, আর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে ভেসে আসে হিংস্র শ্বাপদের ভয়াল গর্জন। এমন সময় তিনি দেখতে পান, খচ্চরের ওপর আরোহণ করে এক নারী মন্থর গতিতে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ পার হয়ে চলেছেন বাইরের দোরের দিকে। কিন্তু তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই। অতন্দ্র প্রহরী তন্দ্রায় আতুর! হাতের প্রহরণ তাদের খসে পড়ছে। তাই নিজেই চিৎকার করে ওঠেন তিনি। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন, কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? গভীর রাতে এই বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করে কোথায় চলেছ?

কিন্তু কে তার উত্তর দেবে? উপেক্ষিত হয় তাঁর সে আদেশ। পূর্বের মতই নীরবে চলতে থাকেন সেই নারী।

জেগে ওঠে তাঁর ক্ষত্রিয় শৌর্য স্থির থাকতে পারেন না রাজা। তাঁকে লক্ষ্য করে অস্ত্র হানেন তার সেই ধৃষ্টতার শাস্তি দেবার জন্য।

রহস্য হয়ে ওঠে তাতে খুবই গভীর, খুবই ভয়াল! তাঁকে লক্ষ্য করে যত অস্ত্র তিনি হানেন, সে অস্ত্র তাঁকে আঘাত করা দূরে থাক, তাঁর নিক্ষিপ্ত সব অস্ত্র যেন খেয়ে ফেলতে থাকেন সেই রহস্যময়ী।

বুক তাঁর কেঁপে ওঠে। সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে যেমন হন তিনি অভিভূত, তেমনি হন আতঙ্কিত। স্মরণ করেন তাঁর চির আরাধ্যা মৃন্ময়ীদেবীর নাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে তাতে এক অদ্ভুত ঘটনা। অন্তর্ধান করেন সেই মূর্তি। আর রাত্রির নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে জেগে ওঠে এক অভয়বাণী: ওরে অবোধ, যাকে তুই স্মরণ করছিস্, আমিই সেই আরাধ্যা তোর দেবী মৃন্ময়ী। চলেছি আমি মহামারী মূর্তিতে। কিন্তু ভয় নেই। যতদিন আমার ওপর তোদের ভক্তি, শ্রদ্ধা থাকবে ততদিন এই কেল্লার মধ্যে আমার মহামারী মূর্তি কখনও প্রকট হবে না। তারপর নীরব হয়ে যায় সেই বাণী। নির্ভীক রাজা দৈববাণী উদ্দেশে প্রণাম করে চলে যান নিজের গন্তব্য স্থানে।

এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে অনেকে হয়ত অনেক কিছু বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর কেল্লার মধ্যে মহামারীর ধ্বংস লীলা কখনও দেখা যায়নি। আর সেই থেকে মহামারী খচ্চরবাহিনী দেবীর পুজাও

চলে আসছে নিয়মিতভাবে। এঁর পূজা পদ্ধতি অদ্ভুত। শারদীয়া মহাপূজার মহাষ্টমী গতে, মহানবমীর গভীর রাতে, পূজারী ব্রাহ্মণকে পিছন দিক থেকে করতে হয় উক্ত খচ্চরবাহিনীদেবীর অর্চনা।

মূর্তি থাকেন গোপনে বিষ্ণুপুরের রাজ অন্তঃপুরের লক্ষ্মীঘরে। দেবীর প্রত্যাদেশ মত বৎসরে সেই একদিন মাত্র পটে আঁকা সেই মূর্তি অন্তঃপুর থেকে বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ী মায়ের শ্রীমন্দিরে নিয়ে এসে ঐভাবে পূজা করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ আর বিষ্ণুপুরের মহারাজা ব্যতীত সেই মূর্তি অন্য কারও দর্শন করা নিষিদ্ধ। বহুদিনের আঁকা সেই মূর্তি-পট অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। তাই কয়েক বৎসর পূর্বে সেই মহামারী খচ্চরবাহিনীদেবী ও আরও দুখানি ছবি অষ্টাদশ ভুজা ও দশভুজার পট সংস্কার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কেশব ফৌজদার তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে পরিণত করা তাকে সম্ভব হয়নি। মহামারী খচ্চরবাহিনীদেবীর অঙ্গরাগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকা প্রাপ্ত হয়ে 'বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে' বলে চীৎকার করতে করতে তাঁর নিজের বাড়ীর অভিমুখে ছুটতে থাকেন সেই শিল্পী। কিন্তু ততদূর যাবার সামর্থ্য তাঁর হয় না। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গদ্বার বড় পাথর দরজার কাছে এসেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে মারা যান তিনি। এবং এটা কিংবদন্তী নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সেই কারণেই অবশিষ্ট পট দুখানির সংস্কার করতে আর কেউ সাহসী হননি।

মহারাজ হাম্বিরমল্ল প্রথম জীবনে যেমন ছিলেন দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী যোদ্ধা তেমনি ছিলেন রণনীতি বিশারদ। তাঁর নামে স্বভাবতই শত্রুরা ভয় পেত। কিন্তু তবুও তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ও মধ্যবর্তী সময়ে বহুযুদ্ধে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়েছিল। আর তারই এক বিজয় গৌরব হাম্বিরমল্ল থেকে ভূষিত করে তাঁকে বীরহাম্বির নামে।

তখন কররাণী রাজবংশের সুলতান সোলেমান কররাণী বাংলা ও বিহারের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর সেনাপতি কুখ্যাত কালাপাহাড়ের অত্যাচারে সমস্ত হিন্দুজাতি সন্ত্রস্ত।

কথিত আছে --উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে মল্লভূমের সীমান্তবর্তী পথ দিয়ে সৈন্য চালনা করবার জন্যে হাম্বিরমল্লের কাছে অনুমতি চেয়েছিল সে। আর তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। কারণ মুকুন্দদেব মল্লভূমের সঙ্গে কোনদিন সৎব্যবহার করেননি। তাঁর বাহিনী

মল্লভূমের সীমান্তবর্তী গ্রামে মাঝে মাঝে হানা দিয়ে প্রচুর ক্ষতি করত। তাই কালাপাহাড়কে তিনি বাধা দেননি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য, কালাপাহাড়ের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে তার সেই অন্যায়ের শাস্তি হোক। আর মুকুন্দদেবের সঙ্গে যুদ্ধে কালাপাহাড়ের শক্তি ক্ষয় হয়ে উভয় শত্রুরই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হোক।

রণনীতি, রাজনীতি উভয় দিক দিয়েই কৌশল তাঁর অতি সুন্দর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে কালাপাহাড়। মল্লভূমের সীমান্ত দিয়ে সৈন্য চালনা করবার অনুমতি পেয়ে হানা দেবার চেষ্টা করে সে বিষ্ণুপুরের ওপর। আন্তরিক ইচ্ছা তার, পিছনে মল্লভূমের মত শক্তি রেখে উড়িষ্যার পথে তিনি যাবেন না।

কিন্তু সে আশা তার সফল হয় না। বিষ্ণুপুরের কোন ক্ষতিই সে করতে পারে না। সুচতুর হাম্বিরমল্ল অতি অল্প আয়াসেই তার সেই দুরভিসন্ধির পরিসমাপ্তি করে দেন। কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে তারা উড়িষ্যার পথে।

এদিকে সেই সংবাদ গিয়ে পৌছোয় সোলেমানের দরবারে। এবং হাম্বিরমল্লের বাংলায় স্বাধীন আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের সংবাদও পৌছোয় সেখানে। তাই তিনি বিশাল বাহিনী ও বিপুল রণসম্ভাব দিয়ে পুত্র দায়ুদ খাঁকে পাঠান বিষ্ণুপুরে। প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য ও সেই মত রণসম্ভার নিয়ে অতর্কিত দায়ুদ খাঁ এসে ছাউনি ফেলেন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী রাণীসাগর নামক গ্রামে।

মহারাজ হাম্বিরমল্ল তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই আকস্মিক সঙ্কটে কিছু বিব্রত হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু তাঁর চির আরাধ্যা মৃন্ময়ীদেবীর কৃপায় সে ত্রুটি তাঁর পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি এমন শোচনীয়-ভাবে তাদের ধ্বংস করেন যে পাঠান সৈন্যের মৃতদেহ স্তূপে পূর্ণ হয়ে যায় যুঝঘাটি ও মুণ্ডমালাঘাটের প্রান্তর। অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাণমাত্র সম্বল করে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন দায়ুদ খাঁ। কিন্তু সেই শোচনীয় পরিণতি তাঁর হয় না। মহানুভব হাম্বিরমল্ল সসম্মানে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। পৌছে দেন তাঁকে নিরাপদ স্থানে।

কথিত আছে—সেই পাঠান-মুণ্ডমালা অসুর নাশিনী মৃন্ময়ীদেবীকে উপহার দিয়েছিলেন হাম্বিরমল্ল। আর সেই দুঃসাধ্য সাধন করার জন্যে হাম্বিরমল্ল থেকে ভূষিত হন তিনি বীরহাম্বির নামে। আবার অনেকে বলেন—তাঁর সেই বীরত্বে-মহত্বে মুগ্ধ হয়ে, দায়ুদ খাঁই তাঁকে ভূষিত করেন উক্ত আখ্যায়।

মুণ্ডমালাঘাট বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত শেষ পরিখার পরপারে দেউলি ও চাকদহ নামক গ্রামের মধ্যবর্তী এক প্রান্তর। সেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ

এত যুদ্ধ হয়ে গেছে যার জন্যে সেখানকে বিষ্ণুপুরের নরপতিদের স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে। তার মূক মৃত্তিকায় এখনও যেন শোনা যায় কতবীরের কীর্তিগাথা। কত স্বদেশ প্রেমিকের মহান আত্মত্যাগের কাহিনী।

কিন্তু মুণ্ডমালাঘাট নাম হয়েছে সেখানে অন্য কারণবশত। সেখানে পরিখা পাহাড়ের ওপর এক ভয়ঙ্করীকালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর শত্রুর মনে ভয় জাগাবার জন্যে তাঁর কণ্ঠে সত্যকার নরমুণ্ডের মালা দেওয়া থাকত। তাই ওখানের নাম মুণ্ডমালাঘাট। এর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ পরিখা পাহাড়, উত্তর ও পশ্চিমে বিড়াই নদী এবং পূর্বে বিখ্যাত দ্বারকেশ্বর নদ ও বিড়াই নদীর সঙ্গমস্থল উক্তস্থানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছ। আর ঐ মুণ্ডমালাঘাটেরই পশ্চিম দিকে অবস্থিত স্থানের নাম যুঝঘাটি। এবং দায়ুদ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে অনেকে সেখানকে দায়ুদঘাটা বলে থাকেন। বর্তমানে সেখানের পরিখার ভেতর দিয়ে বিড়াই নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। তাই সেখানের বিড়াই নদীকে খানা বিড়াই বলা হয়।

কথিত আছে—দায়ুদ খাঁর সেই অতর্কিত আক্রমণ বিব্রত হওয়ার জন্য তারপরই মহারাজ বীরহাম্বির মল্লভূমের সীমান্ত থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুর পর্যন্ত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য ও সংকেত সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তার জন্যে বিষ্ণুপুর থেকে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬ মাইল পর পর উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করান। এখানের চলতি ভাষায় বলা হয় তাকে মাচান। এখনও মল্লভূমের স্থানে স্থানে সেই মাচানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বাঁকুড়া সহরের মাচানতলা মহল্লায় উক্ত মাচানের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। আর তাই সেখানের নাম মাচানতলা মহল্লা।

কেউ কেউ বলেন টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থার জন্যে ঐ সমস্ত মাচান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তা ভুল। তাঁরা তার ব্যবস্থা করলে তাঁদের সে সময়ের হেড কোয়ার্টার কলকাতা থেকে আরম্ভ করে তাঁদের প্রয়োজন মত আর ওসব অন্যান্য দিকে তা সম্প্রসারিত করতেন। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তাঁতিপুকুর নামক জায়গা থেকে মল্লভূমের সীমান্তের দিকে তার অগ্রগতি হবে কেন?

তবে টেলিফোন, টেলিগ্রাম আবিষ্কৃত হবার পূর্বে, মাচানের কার্যকরী বিবরণ অবগত হয়ে তাঁরা হয়ত পরীক্ষামূলকভাবে দেখবার জন্যে, ওর মেরামতি ইত্যাদি কিছু করেছিলেন। এ হতে পারে।

দায়ুদ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ মহারাজ বীরহাম্বিরের জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

তা একদিক দিয়ে যেমন আনন্দের ও গৌরবের, আর এক দিক দিয়ে সেইমত দুঃশ্চিন্তা ও কঠোর কষ্ট স্বীকারের।

কিন্তু তবুও তাতেই তার নিবৃত্তি হয় না। তাঁর জীবনে আসে আরও জটিল আবর্ত। মোগল, পাঠান, দুই দুর্ধর্ষ শক্তির চাপে রাজ্য তাঁর ছারখার হবার উপক্রম হয়। তখন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ। এক মহারাণা প্রতাপ সিংহ ব্যতীত সারা ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত রাজশক্তি তখন মোগলের পদানত। সারা ভারতে মোগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মত শক্তি তখন ছিল না বললেও চলে। কিন্তু ভারতের পাঠান শক্তি মোগল আধিপত্যকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তখনও তাদের মধ্যে মোগল বিদ্বেষ ছিল প্রবল।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর পতনের পর ছাই চাপা আগুনের মত প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করছিল তারা সুযোগের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার দুর্ধর্ষ পাঠান কতলু খাঁর নায়কত্বে তারা দলবদ্ধ হয় বিপুলভাবে।

সম্রাট আকবর শাহের সেনাপতি মানসিংহ ও তাঁর পুত্র জগৎসিংহ তখন বিহারের বিদ্রোহীদের দমন করে উড়িষ্যা জয় করবার উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ডের পথে রওনা হন। ভাগলপুর বর্ধমান প্রভৃতি অতিক্রম করে বর্তমান হুগলী জেলার জাহানাবাদ নামক স্থানে এসে ছাউনী ফেলেন। কতলু খাঁ তখন তার প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্তী ধরপুর নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেই সংবাদ অবগত হয়ে তিনি তাঁর অন্যতম সেনাপতি বাহাদুরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্যসহ পাঠান রাইপুরে। অনেকে বলেন কোতুলপুর ভূখণ্ডে। কিন্তু কোনটা ঠিক আজকের এত দূরবর্তী দিনে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে কতুল খাঁর নাম থেকেই কোতুলপুর ভূখণ্ডের কোতুলপুর নাম, সেখানে তাঁর সমাধি থাকা প্রভৃতি তথ্যের ওপর নির্ভর করে, কোতুলপুর ভূখণ্ডে তাঁর আসার সংবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করা যেতে পারে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যানভাগও উক্ত কোতুলপুর ভূখণ্ডে তাঁর ছাউনী ফেলার মতবাদকেই সমর্থন করে। উভয়পক্ষ ঐমত নিকটবর্তী হওয়ার জন্যই সংগ্রাম তাঁদের আসন্ন হয়ে ওঠে। কতলু খাঁ তাঁর সেনাপতিকে আদেশ দেন মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করবার জন্য। গুপ্তচরের কাছে সেই সংবাদ অবগত হয়ে মহারাজ মানসিংহও তাঁর পুত্র জগৎসিংহের ওপর ভার অর্পণ করেন, তাদের সেই দুরাশার পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য।

কিন্তু সংগ্রামের পরিবর্তে ধূর্ত পাঠানের দল ছলের আশ্রয় নেয়। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠায় তারা জগৎসিংহের কাছে। আর তাদের সেই দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে, তাতে সম্মতি দেন জগৎসিংহ। ভরপুর হয়ে থাকেন মদের নেশায়। এদিকে মহারাজ বীরহাম্বির ছিলেন তখন বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় দশ মাইল পূর্বে তাঁর কুম্ভস্থল দুর্গে। সেখান থেকে গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন তিনি মোগল পাঠান উভয়েরই। উভয়পক্ষের শিবিরেই গুপ্তচর নিযুক্ত করা ছিল তাঁর প্রচুর। তাই পাঠানদের সেই দুরভিসন্ধি অবগত হয়ে সতর্ক হবার জন্য অনুরোধ করেন তিনি জগৎসিংহকে। কিন্তু নিজের শক্তির অহমিকায় অন্ধ হয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আর তার জন্য হয় তাঁর সেই অদূরদর্শিতার শাস্তি। সেই অসতর্ক অবস্থায় পাঠানদের অতর্কিত আক্রমণে বন্দী হন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পাঠানের দল হয়ে ওঠে উল্লসিত। মনে মনে কত সুখের স্বপ্ন রচনা করে তারা।

আর মোগলবাহিনী হয়ে পড়ে নিরুৎসাহ ও ম্রিয়মাণ! সেই দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে তাদের বুকে। আর মহারাজ মানসিংহ হয়ে পড়েন যেন দিশেহারা। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিতে থাকেন নিজেকে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পান না সেই বিপদ মুক্তির। মহারাজ বীরহাম্বির তখনও তাঁর কুম্ভস্থান দুর্গে। সবকিছু সংবাদ নিতে থাকেন তিনি সেখান থেকে। বন্দী জগৎসিংহকে পাঠানেরা যে কোথায় রেখেছে সে সংবাদও তাঁর কাছে গোপন থাকে না। তাঁর অতি করিৎকর্মা গুপ্তচরের দল সব কিছু জানিয়ে যায় তাঁকে। তাই নিজের কর্তব্য স্থির করেন তিনি। পাঠানদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। জগৎসিংহের উপেক্ষার জন্য তাঁর প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে প্রকৃত বীরের মত, মহানের মত, আচরণ করেন তিনি। তাঁর অপরিসীম শৌর্য দিয়ে পাঠান শিবির থেকে বন্দী জগৎসিংহকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন বিষ্ণুপুরে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মোগলদের বুক থেকে পাষাণ ভার যেন নেমে যায়। বিষ্ণুপুরকে গ্রহণ করে তারা প্রধান বন্ধুরূপে। মহারাজ মানসিংহ নিজে বিষ্ণুপুরে এসে মহারাজ বীরহাম্বিরের কাছে জানিয়ে যান তাঁর কৃতজ্ঞতা। কথিত আছে—সেই সময় বিষ্ণুপুরের সব কিছু দেখে এমন মুগ্ধ হন তিনি, যার জন্য দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহ আকবরের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে বিষ্ণুপুরের প্রশংসা করেন। আর সেইজন্য মোগলশক্তি বিষ্ণুপুরের ওপর প্রসন্ন হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে।

কিন্তু পাঠান কতলু খাঁ পরিণত হন প্রচণ্ড শত্রুতে। সেই আক্রোশবশতঃ বিষ্ণুপুরের অধীনস্থ সামন্ত সর্দার গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় তারা সেখানের সব কিছু। তাই বর্তমানে সেখানের গড়ের ক্ষুদ্র পরিখা পাহাড় ও তার নীচে মজে যাওয়া পরিখা ভিন্ন অতীতের নিদর্শন সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না।

এই গড়মান্দারণকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যান ভাগ রচনা করেছেন। গড়মান্দারণ বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ৩২ মাইল উত্তরে বর্তমান হুগলী জেলায় অবস্থিত।

ঐ গড়মান্দারণ ধ্বংস করার পরই পাঠানদের চরম সর্বনাশ হয়। কতলু খাঁ মারা যান। তাঁর নশ্বরদেহ কবরস্থ করা হয় কোতুলপুর ভূখণ্ডের বুকে। কিন্তু কিসে মারা যান তার সঠিক বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। তবে সেই সর্বনাশা সঙ্কটে পাঠানেরা এমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, যার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ পরিত্যাগ করে কতলু খাঁর পুত্র নাসির খাঁ মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। সে সন্ধির শর্ত হয়, যে সমস্ত ব্যক্তি পাঠানদের বিরুদ্ধাচরণ করে মোগলদের সাহায্য করেছে পাঠানেরা তাদের ওপর কোনপ্রকার প্রতিরোধমূলক আচরণ করতে পারবে না। আর জগন্নাথদেবের মন্দির সহ সমস্ত পুরী জেলা মোগল বাদশাহকে ছেড়ে দিতে হবে। অগত্যা সেই শর্তই স্বীকার করে নিয়ে পাঠানেরা উড়িষ্যার পথে চলে যায়। আর মানসিংহ যান তাঁর গন্তব্য স্থানে; এবং নিজের অসীম শৌর্য দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারাজ বীরহাম্বির যে পাঠানদের কবল থেকে জগৎসিংহকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার পরবর্তীকালে।

৯৯৯ বঙ্গাব্দে মানসিংহ বীরহাম্বিরকে কিল্লাজাত মহলের অন্যতম জমিদার বলে গণ্য করে তাঁকে বারোটি জমিদারী এবং উনত্রিশটি কিল্লা প্রদান করেন। উক্ত জমিদারী তমলুক, মহিষাদল, বামনভূম, রাইপুর প্রভৃতি। ঐ সঙ্গে সম্রাট আকবর শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাজ বীরহাম্বিরকে কামান তৈরী করারও অনুমতি দেন। কিন্তু তাহলেও তাঁর পিতা ধাড়িমল্লের সময়েই যে কামান বন্দুক প্রভৃতি তৈরী আরম্ভ হয়েছিল, আর বেশ কিছু পরিমাণ তৈরী হয়েছিল, এ কথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। না হলে তার প্রায় দুই দশক পূর্বে, মহারাজ হাম্বিরমল্ল তীর তলোয়ার নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রে বলীয়ান দুর্ধর্ষ দায়ুদ খাঁকে ঐ মত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পারতেন না, যার বিজয় গৌরব হাম্বিরমল্ল থেকে তাঁকে বীরহাম্বির আখ্যায় ভূষিত করে।

মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করে পাঠানেরা উড়িষ্যার পথে চলে যায়, কিন্তু

তাদের সন্ধির শর্তের মর্যাদা তারা রাখে না। তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সব চাইতে বড় কারণ বিষ্ণুপুরের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার তারা বিষ্ণুপুরে হানা দেয়। কিন্তু সে আশা তাদের সফল হয় না। সুকৌশলী বীরহাম্বির অতি অল্প আয়াসেই তাদের সব দুরাশার পরিসমাপ্তি করে দেন। তাদের একটি প্রাণীকেও উড়িষ্যার বুকে ফিরে যেতে হয় না।

প্রবাদ আছে কতলুখাঁর নাম থেকেই কোতুলপুর ভূখণ্ডের নাম হয় কোতুলপুর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেখানে কতলু খাঁর সমাধি চিহ্ন দেখা যেত। মহারাজ বীরহাম্বিরের কাছ থেকে সেই চরম আঘাত পাওয়ার পর থেকে পাঠানেরা আর কোনদিন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। বিষ্ণুপুরের সে এক গৌরবময় দিন। কিন্তু তারপরই আরম্ভ হয় বিষ্ণুপুর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। তার ক্ষাত্রশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। দুর্ধর্ষ বীরহাম্বির মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শান্ত-সমাহিত হয়ে আসেন এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে। সে এক বিচিত্র ঘটনা যার ছোঁয়াচ লেগে বিষ্ণুপুর হয়ে ওঠে অনন্য, অবিস্মরণীয়! তার বুকে আসে সংস্কৃতির জোয়ার। আসে অবিশ্রান্ত মানবতা। যত কিছু বিপর্যয়ের নিবৃত্তি হবার পর মহারাজ বীরহাম্বির পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নকে সফল করবার জন্য। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় না। তাঁর জীবনে এক নূতন আলোকের সন্ধান পেয়ে তিনি ধাবিত হন সেইদিকে।

মহারাজ বীরহাম্বিরের সভায় দেবনাথ বাচস্পতি নামে একজন অভ্রান্ত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি অবগত হন, বিষ্ণুপুরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী পথ দিয়ে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি শকট বোঝাই মহামূল্যবান রত্ন পার হয়ে যাবে।

রাজা জানেন—তাঁর গণনা অভ্রান্ত। তাই মনে মনে তিনি স্থির করেন, সেই সমস্ত রত্ন আত্মসাৎ করে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের কাজে উৎসর্গ করবার জন্য। তাই জ্যোতিষীর কথা মত তাঁর নির্দেশিত স্থানে তিনি সৈন্য নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তার সঙ্গে আদেশ দেন, কোন প্রকার খুন, জখম, বা জুলুম জবরদস্তি না করে কৌশলে কাজ উদ্ধার করবার জন্য।

সৈন্যেরাও তার ব্যতিক্রম করে না। আদেশ তাঁর শিরোধার্য করে জ্যোতিষীর নির্দেশ দেওয়া জায়গায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে তারা সেই অনাগত রত্ন রাজির প্রতীক্ষায়।

তারপর আসে সেই দিন। তাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে যায় কয়েকজন

ব্রজবাসী লাঠিয়াল ও বৈরাগী পরিবৃত কয়েকটি গোশকট। আর সেই গাড়ীর ভেতর দেখা যায় কয়েকটি কাষ্ঠ নির্মিত বিরাট আধার। সেই সমস্ত দেখে সৈন্যদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজার আদেশ স্মরণ করে তারা সংযত হয়। প্রচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করে তারা সেই শকটের।

ক্রমে বেলা শেষ হয়ে আসে, সন্ধ্যা হয়; পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে নেমে আসে নিকষ কালো অন্ধকার। তাই চঞ্চল হয়ে ওঠে সেই বহিরাগতের দল। বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত গোপালপুর গ্রামের চটিতে এসে আশ্রয় নেয় তারা।

সৈন্যেরাও প্রচ্ছন্নভাবে সেখানে অপেক্ষা করে থাকে। তারপর সংকীর্তন, শাস্ত্রচর্চা ও আহারাদিতে প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তারা। সেই সময় অতি সন্তর্পণে গাড়ীর ভেতর থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে সৈন্যেরা চলে যায়। যথাসময়ে হাজির হয় তারা রাজদরবারে। বলে আপনার আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি মহারাজ।

ধন্যবাদ দেন তাঁদেব বীরহাম্বির। কিন্তু সেই সমস্ত আধারের আবরণ উন্মোচন করবার পর, হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। সব আনন্দ ম্লান হয়ে যায় তাঁর। কারণ যে জিনিস তার মধ্যে দেখা যায়, তা ধন রত্ন ত নয়ই, এমন কি কোন খাবার জিনিস বা কোন পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত নয়। সে শুধু রাশি রাশি হাতের লেখা পুঁথি। তাই জ্যোতিষীর ওপর বিরক্ত হয়ে সেই সমস্ত পুঁথি রাখবার আদেশ দেন তিনি নিজের বাসভবনের চিলে কোঠার এক কক্ষে। আশাভঙ্গের আঘাতে মন তাঁর বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তার কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটে এমন এক ঘটনা যার জন্য ধন্য হয়ে যান বীরহাম্বির। কারণ সেই সমস্ত পুঁথি "মণিমঞ্জুষা" নামক বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ। তার মধ্যে ছিল "হরিভক্তি বিলাস", "হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু", "চৈতন্যচরিতামৃত", "উজ্জ্বল নীলমণি", "ললিত মাধব", "বিদগ্ধ মাধব", "দানকেলী কৌমুদী" প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ১২১ খানি অমূল্য ভক্তি গ্রন্থ। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-ধাম থেকে সেই সমস্ত পুঁথি পাঠাচ্ছিলেন তাঁদের গৌড়ের মঠে।

রক্ষকস্বরূপ সঙ্গে ছিল কয়েকজন ব্রজবাসী লাঠিয়াল। আর অধ্যক্ষস্বরূপ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। ঘুমে তাঁরা অচেতন থাকাকালীন অবস্থায় রাজ সৈন্যেরা পুঁথি পত্রাদি নিয়ে গিয়েছিল বলে তখন কেউ তাঁরা তা অবগত হননি। কিন্তু শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর তাঁদের সেই

সর্বনাশের বিষয় যখন তাঁরা জ্ঞাত হন, তখন তাঁদের সেই পরম সম্পদ হারানোর ব্যথায় হাহাকার করে মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন শ্যামানন্দ। আর 'হায় কি হল' বলে বক্ষে করাঘাত করে পাগলের মত চিৎকার করতে থাকেন শ্রীনিবাস। আর দিশেহারার মত হয়ে মূক হয়ে যান যেন নরোত্তম। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হয়। আর সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মন হয়ে আসে তাঁদের শান্ত। তখন নরোত্তমকে গৌড়ে ও শ্যামানন্দকে উৎকলে যাবার আদেশ দিয়ে শ্রীনিবাস নিজে সেই সমস্ত হারানো গ্রন্থের খোঁজে অতি দীন বেশে বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে ফিরতে থাকেন।

এক বহির্বাস কোপীন এক হয়।
দেড় হাত বস্ত্র তায় শরীর মোছয়।
সেহো পুরাতন অতি মলিন বসন।
অতিথির প্রায় গ্রামে করেন ভ্রমণ।
কভু ভিক্ষা মাগি খান কভু জল পান।
কাথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান।

দশদিন সেইভাবে গত হয়ে যায়। তারপর বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত দেউলি গ্রামের কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সব কিছু অবগত হয়ে তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন। আর সেই সমস্ত হারানো পুঁথির খোঁজ করবার জন্য রাজার কাছে আবেদন করতে একদিন তাঁকে নিয়ে যান তিনি বিষ্ণুপুর রাজদরবারে।

ভগবানের কী বিচিত্র লীলা। যখন তাঁরা রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করছিলেন রাজার সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য। আর সভাসদ পরিবৃত রাজা নিবিষ্ট মনে তা শুনছিলেন। তাই সেদিন তাঁদের আর্জি তাঁরা পেশ করতে পারেন না। তাঁরাও শোনেন সেই পাঠ। কিন্তু আচার্যদেবের মন তাতে নিবিষ্ট হয় না। অন্তর তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেই সমস্ত হারানো গ্রন্থের চিন্তায়।

প্রথমদিন সেইভাবেই গত হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মনে তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সভাপণ্ডিতের ভুল ব্যাখ্যার জন্য অন্তরে তিনি আঘাত পান। কিন্তু রাজসভা, ব্যাখ্যা করছেন রাজারই সভাপণ্ডিত। তাই প্রকাশ্যে তিনি কিছু বলেন না। কিন্তু অন্তর তাঁর বিরক্তিতে ভরে ওঠে। চোখে মুখে জেগে ওঠে তার প্রতিচ্ছবি। আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ে বীরহাম্বিরের। তিনি দেখেন, এক অপরূপকান্তি ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে কিছু না বলে নীরবে প্রতিবাদ

সূচক বিরক্তি প্রকাশ করছেন। তাই তিনি তার কারণ জানতে চান। বলেন, কি জন্য আপনার এই বিরক্তি প্রকাশ ?

তখন আচার্যদেব প্রকাশ করেন তাঁর অন্তরের কথা। বলেন, আপনার সভাপণ্ডিতের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা ভুল।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে জলন্ত অনলে পড়ে যেন ঘৃতের আহুতি। দারুণ ক্রোধে চীৎকার করে ওঠেন সভাপণ্ডিত। বলেন, ও মুখের কথায় হবে না, তার প্রমাণ দিতে হবে।

সম্মতি দেন তাতে আচার্য্যদেব! সভাপণ্ডিতের সঙ্গে আরম্ভ হয় তাঁর তর্ক। আর তার ভেতর দিয়ে তাঁর সুললিত ভাবগম্ভীর কণ্ঠে প্রকাশ হতে থাকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জ্যোতি। যার ফলে মুগ্ধ হয়ে যান রাজা। মুগ্ধ হয়ে যান তাঁর সভাপণ্ডিতের দল। এমনকি মুগ্ধ হন সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যও। উচ্ছ্বসিত আবেগে সকলে তাঁকে সাধুবাদ দেন। আর গুণগ্রাহী রাজা তাঁকে অনুরোধ করেন সেই অধ্যায় পাঠ করবার জন্য।

তখন আচার্য্যদেব তাঁর ভক্তি-আপ্লুত অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে এমন প্রাণস্পর্শি পাঠ আরম্ভ করেন যার জন্য সভাসুদ্ধ সকলে যেন অভিভূত হয়ে যান। সকলেরই চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে প্রেমাশ্রু। ভাব বিহ্বল রাজা সিংহাসন থেকে উঠে গিয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেন। বলেন, আজ থেকে আপনি আমার গুরু! আর আমি আপনাকে এখান থেকে কোথাও যেতে দেবো না।

তারপর আচার্য্যদেবের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে হয় তাঁর পরিচয়। তাঁর সব কথা তিনি শোনেন, বুঝতে পারেন জ্যোতিষীর কথা মত সেই সমস্ত পুঁথি সত্যই মহামূল্যবান রত্ন। তখন গ্রন্থ হরণের সবকিছু পরিচয় দিয়ে আচার্য্যদেবকে সেই কক্ষে নিয়ে যান। দেখান তাঁকে সেই সমস্ত পুঁথি।

সঙ্গে সঙ্গে অধীর আনন্দে 'হরি হরি' বলে চিৎকার করে ওঠেন আচার্য্যদেব। উচ্ছ্বসিত আবেগে রাজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে 'কৃষ্ণপদে মতি হোক' বলে করেন তাঁকে আশীর্বাদ। আর সেই সঙ্গে রাজাও সভাপণ্ডিত প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং নিজেদের ধর্মপ্রচারে সুবিধে হবে জেনে বিষ্ণুপুরে থাকবার প্রতিশ্রুতি দেন আচার্য্যদেব এবং মহারাজ বীরহাম্বিরের সাহায্যে সেইসব গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ বৃন্দাবন থেকে আরম্ভ করে তাঁদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জায়গায় অতি দ্রুতগতিতে পাঠিয়ে দেন। সেই আনন্দ সংবাদ তাঁদের হতাশাচ্ছন্ন অন্তরে এমন আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে, যার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একবিশিষ্ট স্থান খেতুরীতে সেই গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র

সহকারে মহাসমারোহে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এবং রাত্রিতে সমস্ত খেতুরী আলোকমালায় সজ্জিত করে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। কথিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য্য সেই সময় মহারাজ বীরহাম্বিরকে কৃষ্ণ বিষয়ের বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। আর শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা ভ্রমর-গীতা প্রভৃতি অমূল্যগ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন।

প্রবাদ আছে সেই সময় সেই সমস্ত গ্রন্থের তিনি চৌষট্টি প্রকারের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই মণিমঞ্জুষা গ্রন্থ হরণের জন্য অনেকে মহারাজ বীরহাম্বিরকে দস্যু অপবাদ দেন। কিন্তু সে অপবাদ দেওয়া তাঁকে অনুচিত। কারণ তিনি দস্যুতা করেছিলেন সত্য, কিন্তু সে দস্যুতার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অতি মহৎ। মহামূল্যবান রত্ন অর্থাৎ মহামূল্য-ধন-রত্ন বিবেচনা করে তিনি তা নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন সেই সমস্ত সম্পদ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের কাজে উৎসর্গ করবার জন্য। দস্যু অপবাদ দূরে থাক, সেই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে তিনি প্রশংসার পাত্র।

যাঁরা তাঁর অন্তরের সত্যিকার পরিচয় জানেন না তাঁরাই তাঁর ওপর উক্ত অপবাদ প্রয়োগ করতে পারেন। দস্যুতা প্রবৃত্তি দূরে থাক মন ছিল তাঁর খুবই মানবদরদী। আর সেই মানবদরদী সত্বাই অতি সহজে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক মহান বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি। বিনা আয়াসে কৃপালাভ করেন তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মত মহাপুরুষের। যাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বয়ং চৈতন্যদেব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যাঁকে সেই গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর 'দ্বিতীয় কলেবর' বলা হয়।

তারপর আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ধাড়িহাম্বির ও জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী শিরোমণি পট্টমহাদেবীকে নিয়ে আচার্য্য-দেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন বীরহাম্বির এবং সেই থেকেই তাঁর ক্ষত্রিয় শৌর্য্য বিসর্জন দেন তাঁর শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদতলে। বৈষ্ণবপ্রেমের প্রবল বন্যায় লয় হয়ে যায় তাঁর অতীতের স্বপ্ন। সেই থেকে হিংসার পথ পরিত্যাগ করে প্রেমের মধ্য দিয়ে মানবকল্যাণের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন তিনি। কারণ প্রেমের মধ্য দিয়ে, ভালবাসার ভেতর দিয়েই যে মাটির পৃথিবীতে ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসে! তার মধ্য দিয়েই যে কৃপাময়ের কৃপা বর্ষিত হয়! তাই রাজ্যের সর্বত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন বৈষ্ণব সাধকদের আখড়া, সাধু-মোহান্তদের আশ্রম অতিথিশালা প্রভৃতি। শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করান কালাচাঁদ বিগ্রহ।

তাঁর পদতলে সঁপে দেন জীবনের সব কিছু শুভাশুভভার। আর তারজন্য যাজীগ্রামের বাস পরিত্যাগ করে আচার্য্যদেবকে বিষ্ণুপুরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে অনুরোধ করেন রাজা। কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ তাতে সম্মত হন না। তাই বিষ্ণুপুরে তাঁর বংশতরু স্থাপনের জন্য রাজার নিজের ও বিষ্ণুপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুনয়ে, আচার্য্যদেব বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাদেবীকে বিবাহ করেন। এবং সেই থেকেই তিনি বিষ্ণুপুরের স্থায়ী অধিবাসী হন। বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত খরবাংলা মহল্লায় তৈরী হয় তাঁর বাসভবন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত রাধারমণ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির। আজও সেই শ্রীমন্দির ও আচার্য্যদেবের সমাধি সেখানে দেখা যায়। কালের কবল হতে সেই মহাপুরুষের সমাধিকে রক্ষা করবার জন্য বিরাট এক বটবৃক্ষ যেন তার নিরাপদ বাহু দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। তাই তার বেষ্টনীর ফাঁকে ফাঁকে দুই একখণ্ড ইঁট ব্যতীত সমাধির আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তবুও তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্থানটিকে মহাপুরুষের সমাধির উপযোগী মহিমাময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে রেখেছে। সেখানে গেলে স্বভাবতই মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। সহসা আর আসতে ইচ্ছে হয় না।

আচার্য্যদেবের আদি নিবাস নবদ্বীপের নিকটবর্তী চাকন্দি গ্রাম। শ্রীচৈতন্যের মত ইনিও ছিলেন প্রিয়দর্শন ও ভক্তিমান পুরুষ। সেইজন্য বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় কলেবর বলে ইনি পরিগণিত হয়ে আছেন। শৈশবকাল থেকেই ইনি শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী ছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তাঁকে নবদ্বীপে নিয়ে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র দেখাতেন, আর তাঁর অপরূপ লীলাকাহিনী শোনাতেন। সেই সময় চৈতন্য অনুরাগী পিতা ও পুত্র, বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েই চোখের জলে বুক ভাসাতেন। অশ্রুর যেন প্লাবন বয়ে যেত।

কিন্তু তাঁদের সে সুখে হঠাৎ করে বাজ পড়ে। পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য মারা যান। তখন বালক শ্রীনিবাস সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর আশা-ভরসা পরিত্যাগ করেন না। নবদ্বীপে গিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্যের মাতা শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নির্দেশ মত শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর গদাধরের কাছে ভাগবত পড়বার জন্য পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হন।

গদাধরের কাছে একটিমাত্র পুঁথি ছিল। আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অশ্রু-

ধারায় পুঁথিটি মুছে গিয়েছিল। তাই বাংলাদেশ থেকে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারলে তিনি তাকে ভাগবত পড়াবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

সেকালের পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আর এখনকার মত দ্রুতগামী যান-বাহনের সুবিধেও ছিল না। তাই দূরপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে বালক শ্রীনিবাসের বহুদিন গত হয়ে যায়। আর দুর্ভাগ্যবশত সেই কয়েকমাসের ব্যবধানে গদাধর দেহত্যাগ করেন। হতাশার পর হতাশা। কিন্তু তবুও ভেঙ্গে পড়েন না। পুনরায় ফিরে আসেন তিনি বাংলাদেশে। সেখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ চান। সব কিছু শুনে তিনি রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র পড়বার জন্য তাঁকে বৃন্দাবন ধামে যাবার উপদেশ দেন।

চৈতন্যের প্রেমে তিনি তখন পাগল। তাই দুস্তর পথ, দুঃসহ বেদনা, সব কিছু উপেক্ষা করে প্রথমে তিনি উপস্থিত হন কাশীতে। সেখানে শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র বিশেষত সেখানের চন্দ্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে দরবেশ-বেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই সব জায়গা পরিদর্শন করে তাঁর অশ্রুর বন্যা বইতে থাকে সেই থেকে চৈতন্যের প্রেমে তিনি এমন তন্ময় হয়ে যান যে সময় বিশেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত তিনি ভুলে যেতেন। প্রায়ই উপবাসী অবস্থায় দিন কাটাতেন। চৈতন্যের কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসত। সেই সময় সেই অসহায়, সুদর্শন বালককে যিনি দেখতেন তিনিই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁরও চোখ জলে ভরে আসত।

পরে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি উপস্থিত হন। কিন্তু এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য, সেখানে গিয়েও তিনি আঘাত পান। মাত্র সামান্য কিছু-দিন পূর্বে রূপ ও সনাতন সেখানে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের শোকে বৃন্দাবন অন্ধকার। তখন সেই হতাশ বালক আঘাতের পর আঘাত পেয়ে শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন।

কিন্তু ভগবানের ওপর বিশ্বাস যাঁর অবিচলিত, নিষ্ঠা যাঁর অসীম, আশা তাঁর অপূর্ণ থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর সেই অবিচলিত নিষ্ঠা আর অসীম অধ্যবসায় দেখে তাঁকে আশ্রয় দেন এবং নিজে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার সব কিছু ভার গ্রহণ করেন। সব শ্রম তাঁর সার্থক হয়। পূর্ণ হয় তাঁর সব আশা। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে পূর্ণবয়স্ক যুবকে পরিণত হন তিনি। তখন জাহ্নবীদেবীর উপদেশমত বিবাহ

করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। কথিত আছে তাঁর পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের জীবিতকালেই তাঁর মাতুলালয় যাজীগ্রামের জমিদারের অনুরোধে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সেখানে থাকতেন তাঁর প্রথমা পত্নী। আর বিষ্ণুপুরে খড়বাংলা মহল্লায় তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী পদ্মাবতী দেবীর গর্ভেও এক পুত্র সন্তান হয়। নাম তাঁর গতিগোবিন্দ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র। কিন্তু তাহলেও তাঁর পুত্র কন্যাদের মধ্যে গতিগোবিন্দ, বিশেষ করে কন্যা হেমলতাদেবীই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই হেমলতাদেবী পরম ভক্তিমতি রমণী ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ বাক্য আছে। অনেকে বলেন, এই হেমলতাদেবী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। আচার্য্যদেবের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। আজও আচার্যদেবের বংশধরগণ উক্ত খড়বাংলা মহল্লায় বাস করেন। তাঁরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচন্দ্র গোস্বামী, ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত গগনের উজ্জল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আর এঁরা ব্যতীত বাঁকুড়া জেলার আরও বহু জায়গায় আচার্য্যদেবের বংশধরগণ আছেন। আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ বিগ্রহ তাই তাঁর শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত না থেকে পালা করে তাঁদের সব বাড়ীতে গিয়ে পূজিত হন।

বিষ্ণুপুর কুন্দকুন্দার বাজার বা কবিরাজপাড় মহল্লায় কবিরাজ মশায়দের বাড়ীতে আচার্যদেবের এক জোড়া কাঠের পাদুকা আজও বর্তমান আছে। নিত্য নিয়মিতভাবে তার পূজা হয়ে থাকে।

কথিত আছে, 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ সাধক মনোহর দাস আউলিয়া মহারাজ বীরহাম্বিরের ভক্তি নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সভাপণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে সোনামুখী গ্রামে তাঁর পাট আছে। প্রতি বৎসর রামনবমী তিথিতে মহাসমারোহে সেখানে মহোৎসব হয়। মহারাজ বীরহাম্বিরের আর এক কীর্তি বিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ আনয়ন। অনেকে বলেন, সে তাঁর কুকীর্তি। কিন্তু সে সময়ের তাঁর মনের অবস্থা বিচার করে দেখলে তাকে কুকীর্তি বলা মহা ভুল।

সাধক যেমন তার সাধনার ধনকে পাবার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হন না, তিনিও তেমনি তাঁর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে পাবার জন্য তাঁর

সুযশ সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি। আর তাই তাঁর সেই সর্বস্ব অর্পণ করা নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সেবক ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করে ভক্তাধীন মদনমোহন এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে, মহারাজ বীরহাম্বিরের জীবনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যোদ্ধা জীবন, দ্বিতীয় ধর্মজীবন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর তাঁর সেই যোদ্ধা জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে। আরম্ভ হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব—ধর্মজীবন। সেই ধর্মজীবনে তিনি পরিণত হন সম্পূর্ণভাবে এক নূতন মানুষে। তাঁর জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সব কিছু রাজসিকভাব।

মোগল-পাঠান সংঘর্ষে কতলুখাঁর শিবির থেকে বন্দী জগৎ সিংহকে মুক্ত করে মোগলের সাহায্য করায় তাদের মিত্রতার জন্য সম্রাট আকবরের সময় করের জন্য বিষ্ণুপুরের ওপর কোন চাপ দেওয়া হয়নি। কিন্তু আকবর গত হওয়ার পর দিল্লীর সিংহাসনে যখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর এবং বাংলার মসনদে নবাব কুতবউদ্দিন খাঁ, তখন দিল্লীর নির্দেশে অথবা নিজের ইচ্ছায় মহারাজ বীর-হাম্বিরকে নিজের দরবারে তলব করে নিয়ে গিয়ে নবাব-দরবারকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব দেবার আদেশ দেন নবাব।

ভগবানের বিচিত্র লীলা, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান। যে স্বাধীনচেতা বীরহাম্বিরের জীবনে সব চাইতে প্রিয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা, বাংলায় স্বাধীন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে যিনি হয়ে উঠেছিলেন একদিন বিভোর, বিনা প্রতিবাদে নবাবের সেই আদেশ পালন করেন তিনি। নবাব সরকারকে রাজস্ব দিতে স্বীকার করেন।

কিন্তু তা নামে মাত্র। আসলে তার কিছুই হয় না। বিষ্ণুপুরে এসেই বৈষ্ণবী প্রেমে তিনি এমন বিভোর হয়ে ওঠেন যার জন্যে তিনি সব কিছু ভুলে যান। শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে চলে যান বৃন্দাবন ধামে। আর সেখানের সেই পুণ্যময় পরিবেশের মধ্যে গিয়ে বৈষ্ণবী ভাবধারা জেগে ওঠে তাঁর মনে প্রবলভাবে। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এমন পাগলের মত হয়ে ওঠেন, যার জন্যে তাঁর সেই ভাব তন্ময়তায় মুগ্ধ হয়ে সেখানের অধ্যক্ষ শ্রীজীব গোস্বামী অভিহিত করেন তাঁকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' নামে। সেখানের বৈষ্ণব সমাজে পরিগণিত হন তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে।

সেই সময় সেখানের গোপীনাথ জীউ, গোবিন্দ জীউ ও মদনমোহন জীউ বিগ্রহের নামে তিনি বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। প্রত্যেক বিগ্রহকে সাতটি করে—তিন বিগ্রহকে একুশটি মৌজা দান করেন, যার বার্ষিক আয় তিন হাজার

মন সাজা ধান। সেই সমস্ত কাজ ভালভাবে শেস করতে সেখানে তাঁর বহুদিন গত হয়ে যায়। তারপর শ্রীগুরুর সঙ্গে পুনরায় ফিরে আসেন তিনি বিষ্ণুপুরে। কিন্তু বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের চিন্তা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। অহরহ মনের মধ্যে জাগে তাঁর সেখানের যমুনা, কালিন্দী, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি।

তাই বিষ্ণুপুরকে বৃন্দাবনের অনুকরণে তৈরী করবার ব্রত গ্রহণ করেন তিনি। বিপুল অর্থব্যয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে খনন করান যমুনা, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি। বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন মথুরা, দ্বারকা, মধুবন প্রভৃতি গ্রাম। আর সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে তৈরী করান বিশাল রাসমঞ্চ। এবং তাঁর সেই শ্রম ও শুভেচ্ছাকে সার্থক করবার জন্য শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরকে দেন 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নাম। ধন্য হয়ে যান বীরহাম্বির! তাঁর সেই অপরূপ সার্থকতা আনন্দে অধীর করে তোলে তাঁর অন্তরকে।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে সর্বনাশ হয়। বৃন্দাবন গমন ও ঐ সমস্ত কাজে দীর্ঘ সাত বৎসর গত হয়ে যায়। সাত বৎসরের রাজস্ব বাকী পড়ে তাঁর নবাব-দরবারে। তাই নবাব পুনরায় তাঁকে তলব করে বাকী রাজস্বের জন্য আবদ্ধ করেন কারাগারে। কিন্তু বিচলিত হন না তাতে বীরহাম্বির, ভগবানের ওপর আত্মনিবেদিত ভক্তিঅন্তপ্রাণ রাজা সব কিছু বরণ করেন হাসিমুখে। কিন্তু কারাগারের মধ্যে মনে তাঁর বিকার জাগে। আপন মনে তিনি বলেন, আমার সব চাইতে কাম্য, সর্বাধিক প্রিয়, প্রভুর পাদোদক এখানে আমি পাব কেমন করে? সেই চিন্তায় অধীর, শেষে পাগলের মত হয়ে পড়েন তিনি। আকুল আগ্রহে তাঁর উপাস্যের কাছে নিবেদন করেন তাঁর মনের কামনা। এমনি করে দিন গত হয়ে যায়, রাত্রি আসে। খাবার জন্য বার বার অনুরোধ আসে নবাব দরবার থেকে।

কিন্তু রাজা অবিচলিত থাকেন তাঁর সঙ্কল্পে। সেই অভুক্ত অবস্থায় তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করা নিষ্ঠা দিয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন তাঁর পরম প্রিয়ের কাছে। আর তার জন্যই বুঝি তাঁর আসন টলে। সেই আকুল প্রার্থনা শোনেন ভক্তের ভগবান। রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা! যেন দৈবী মায়ায় আপনা হতেই মুক্ত হয়ে যায় কারাদ্বার। ইষ্টদেবতার নাম গান করতে করতে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন রাজা। প্রমাদ গণে রক্ষীদল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ পৌছায় নবাবের কাছে। গর্জে ওঠেন তিনি। অকর্মণ্য অপবাদ

দিয়ে নূতন রক্ষী নিযুক্ত করে আরও কঠিনভাবে রুদ্ধ করেন কারাগারের দ্বার। সতর্ক প্রহরী পর্যবেক্ষণ করতে থাকে অবিরত। কিন্তু সব বিফল হয়। উপর্যুপরি তিনবার, অনেকে বলেন তিনদিনে সাতবার, একই ভাবে কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন রাজা। সেই অলৌকিক দৃশ্য অভিভূত করে দেয় সকলকে। নবাবেরও চৈতন্য হয়! দৈবশক্তির অধীশ্বর বলে তিনি তাঁকে মুক্তি দেন। আর তার সঙ্গে দেন 'দেব' উপাধি। দৈব আখ্যায় ভূষিত হন বিষ্ণুপুর রাজবংশ। এই ঘটনা অনেকের কাছে হয়ত অবিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু এটা যে তা নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কারাগার থেকে সসম্মানে রাজার মুক্তি ও 'দেব' উপাধিলাভ। যা আজও বিষ্ণুপুর রাজবংশের সঙ্গে জড়িত। তারপর আর একদিক দিয়ে বিচার করে দেখলেও তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। মহারাজ বীরহাম্বির তখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের মত মহাপুরুষের প্রিয় শিষ্য, সম্পূর্ণভাবে আমিত্ব ও অহমিকা বর্জ্জিত পরম বৈষ্ণব। কোন প্রকার মিথ্যাচার বা অসৎ আচরণের সম্পূর্ণভাবে বিরোধী। দ্বিতীয়ত শ্রীনিবাস আচার্য্য তখন বর্তমান। তাঁর মত মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর জীবন তখন জড়িত। মিথ্যাচার হলে তার প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। তাই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে উক্ত ঘটনা অলৌকিক হলেও যে অলীক নয়, তা যে কোন চিন্তাশীল বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু ঐ মত সম্মান, ঐমত অসাধারণ কীর্তির ভেতর দিয়ে মুক্তিলাভ করা সত্ত্বেও রাজার মন গ্লানি মুক্ত হয় না। কারাগার অপরাধীদের স্থান। আর সেই অপরাধীরূপেই তিনি সেখানে বাস করেছেন। তাই নিজেকে অশুচি বিবেচনা করে সেই গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি তীর্থ পর্যটনে যান। আর সেই তীর্থ হতে ফেরবার পথেই আসে তাঁর জীবনের পরমলগ্ন। সাক্ষাৎ হয় তাঁর পরমপ্রিয়ের সঙ্গে। তাঁর ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বৃষভানুপুর থেকে তাঁর প্রকৃত লীলা নিকেতন বিষ্ণুপুরে আসেন বিখ্যাতদেবতা মদনমোহন।

বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর তীর্থদর্শন করে বিষ্ণুপুর অভিমুখে ফিরছিলেন বীরহাম্বির। সেই সময় শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতৃ বিয়োগের সংবাদ অবগত হয়ে যাজীগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন তিনি। এবং যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ করে গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

কিন্তু দীর্ঘপথ, পথের মাঝে বেলা শেষ হয়ে আসে। প্রকৃতির বুকে দেখা দেয় দিনান্তের রক্তিম আলোক। তখন চলেছেন তিনি বৃষভানুপুরের নিকটবর্তী অরণ্য পথ দিয়ে। যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় শুধু অন্তহীন বন। বিশাল

জায়গা ভরে চলেছে যেন গাছের মিছিল। তাই চিন্তিত হয়ে ওঠেন রাজা। রাত্রিবাসের উপযোগী আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানান তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে। আর তার সঙ্গে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে থাকেন সেই বনভূমি।

ফল হয় তাতে আশাতীত। অরণ্য শেষ হয়ে আসে। আর তার প্রান্তবর্তীস্থানে তিনি দেখতে পান দেউলের এক রক্তবর্ণ ধ্বজা—দিনের শেষের রক্তিম আলোকে হয়ে উঠেছে আরও আরক্তিম। তাই সেইদিকেই চলতে শুরু করেন তিনি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হন সেখানে। দেখেন দেউল, নাটমন্দির, সুরম্য উদ্যান প্রভৃতিসহ অপরিচিত এক আশ্রমভূমি। আর সেই মন্দির মধ্যে স্বর্ণকান্তি, সহাস্যবদন, নয়নাভিরাম, রাধাকৃষ্ণের এক অপূর্ব বিগ্রহ। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন তাঁকে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সেইদিকে। যত দেখেন ততই মুগ্ধ হতে থাকেন। আপন মনে বলেন, বৃন্দাবন গেলাম, আরও কত তীর্থ পরিদর্শন করলাম। কিন্তু এমন স্বর্ণকান্তি নয়নাভিরাম বিগ্রহ ত কোথাও দেখলাম না! ইষ্টদেব, একি করলে? একি মন-প্রাণ সর্বস্ব হরণ করা তোমার এই অপূর্ব রূপ আমাকে প্রত্যক্ষ করালে? তোমার ঐ অপরূপ মূর্তি যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে গাঁথা হয়ে গেল! আমার একি সর্বনাশ তুমি করলে। তোমাকে ছেড়ে আর এক মুহূর্তও যে আমি থাকতে পারব না। রাজা ঐরূপ আকাশ-পাতাল চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় সেখানে আসেন এক ব্রাহ্মণ। বলেন—কে আপনি? আপনাকে ত সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে না। কি আপনার পরিচয়?

তখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে রাজার। যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে নিজের পরিচয় দেন। আর তার সঙ্গে সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করবার সংকল্পও তিনি প্রকাশ করেন।

সবকিছু শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন ব্রাহ্মণ। বলেন আজ আমি ধন্য! আপনার মত রাজ অতিথি আমার দোরে। বলতে বলতে বিগ্রহের চরণামৃত এনে দেন রাজাকে। পরম আগ্রহে তা পান করেন তিনি। অন্তর ভরে ওঠে তাঁর অপার আনন্দে! জিজ্ঞাসা করেন বিগ্রহের নাম।

ব্রাহ্মণ বলেন, মদনমোহন।

মদনমোহন! নাম শুনে রাজার অন্তরে যেন শিহরণ বহে যায়। আপন মনে বলেন, হ্যাঁ, মদনের মন মোহিত করবার মতই এক অপরূপ মূর্তি! অধরে মধুর হাসি, পরনে পীতবস্ত্র, শিরে শিখি পাখা, কনক বরণ, করে ধৃত সোনার মুরলী, শ্রীকর যুগলে শোভে সোনার বলয়, সোনার নূপুর শোভে রক্তিম চরণে

নয়নাভিরাম ত্রিভঙ্গিমঠাম। প্রকাশ্যে বলেন, কোথায় পেলেন ব্রাহ্মণ এই অপূর্ব মূর্তি ?

এক সন্ন্যাসীর কাছে। বলে—এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দাক্ষিণাত্যের মহারণ্যে কি অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে সেই বিগ্রহ পান, সেই সন্ন্যাসী কর্তৃক তাঁকে বিগ্রহ দান, বিগ্রহের পদ্মাসনে খোদিত অক্ষরে উদ্ধবকৃত সিদ্ধবিগ্রহ 'মদনমোহন' নাম, সন্ন্যাসীর কাছে শোনা বিগ্রহের আদি ইতিহাস, ধনী ব্যক্তির কাহিনী প্রভৃতি সবকিছু পরিচয় দেন রাজাকে। সে এক অভিনব কাহিনী। (গ্রন্থকারের লিখিত বিখ্যাত দেবতা মদনমোহন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।) সবকিছু শুনে রাজা আরও আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁকে বিগ্রহদান করবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন ব্রাহ্মণকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সম্মত হন না। বলেন, সংসারে আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পরিজন আমার সব কিছুই ঐ মদনমোহন। ওঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারব না।

—বুঝেছি। কিন্তু আমারও যে ঐ অবস্থা। ঐ মদনমোহন মূর্তি আমাকে পাগল করেছে। আমিও এক মুহূর্তের জন্য ওঁকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তাহলে অনুগ্রহ করে প্রভুকে নিয়ে আপনিও বিষ্ণুপুরে চলুন। ওঁর সঙ্গে আপনারও সেবা করে আমি ধন্য হব। বলেন রাজা।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতেও অসম্মত হন। বলেন তা হয় না মহারাজ। সব পরিচয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাদের দিয়েই এখানে সব কিছু সম্পদ প্রভু গড়ে তুলেছেন। আমার যা কিছু সবই ওঁর করুণার দান। তাই এসমস্ত পরিত্যাগ করে আমি কোথাও যেতে পারব না।

—বেশ তাহলে আমাকেই এখানে থাকবার অনুমতি দিন। প্রভুর সেবা করে, প্রভুর চরণামৃত পান করে, দীনতম সেবকের বেশে এখানেই আমার অবশিষ্ট জীবন আমি অতিবাহিত করব।—বলেন বীরহাম্বির।

খুবই আশ্চর্য হয়ে যান ব্রাহ্মণ! বলেন, আপনি এখানে থাকবেন ? রাজ্য, ধন, পুত্র, পরিজন, সবকিছু পরিত্যাগ করে এখানে অতিবাহিত করবেন আপনার জীবন ? বলতে বলতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

রাজা বলেন, আমি ঠিকই বলেছি ব্রাহ্মণ। প্রভুকে না পেলে আমার জীবন নিরর্থক হয়ে যাবে। রাজ্য, ধন, পুত্র, পরিজন, কেউ সে অভাব আমার পূর্ণ করতে পারবে না।—অদ্ভুত আপনার নিষ্ঠা, অদ্ভুত আপনার ভক্তি শ্রদ্ধা মহারাজ! বলতে বলতে সেই অভিভূত মন নিয়ে আহারাদির আয়োজনের জন্য চলে যান ব্রাহ্মণ। আর পথশ্রান্ত রাজা আহার নিদ্রা সব কিছু পরিত্যাগ

করে পড়ে থাকেন সেই মন্দিরে। মদনমোহনই হয়ে ওঠেন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, লক্ষ্য। তাঁর একাগ্রতা দিয়ে মদনমোহনের চরণে সঁপে দেন তাঁর সব কিছু।

এদিকে আহারাদির আয়োজন শেষ করে, ব্রাহ্মণ পুনরায় আসেন সেখানে। অনুরোধ করেন তাঁকে ভোজনাগারে যাবার জন্য।

কিন্তু রাজা তাতে অসম্মত হন। বলেন, প্রভুর চরণামৃত পান করেছি, তাতেই আমার সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। এই বলে তাঁর সেই অসীম নিষ্ঠা নিয়ে সেখানে পড়ে থাকেন তিনি। নিরুপায় ব্রাহ্মণ চলে যান তাঁর বাস-গৃহের অভিমুখে। রাজা প্রার্থনা জানাতে থাকেন মদনমোহনের উদ্দেশে। আর তাই বুঝি তাঁর কৃপা হয়। তাঁর সেই সর্বস্ব-অর্পণ-করা নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন ভক্তের ভগবান। শেষ রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রাজা শোনেন মদনমোহনের বাণী। তিনি তাঁকে বলেন, ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাঁকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাবার জন্য।

ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর। আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল রাজা। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, সব অপবাদের ভয় পরিত্যাগ করে, তাঁর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে নিয়ে বহির্গত হন রাজপথে। কত নদ-নদী, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম করে নিয়ে আসেন তাঁকে বিষ্ণুপুরে। লুকিয়ে রাখেন অন্তঃপুরের লক্ষ্মীঘরে। সেবা পূজাও চলতে থাকে সেই মত ভাবে। বাইরের ব্যক্তির মধ্যে জানেন শুধু পূজারী ব্রাহ্মণ। আর তাঁর কাছ থেকে অবগত হন তাঁর পত্নী, বৃদ্ধা মাতা প্রভৃতি।

এদিকে রাজা বিগ্রহ নিয়ে চলে আসার পর সেখানে নিয়মিতভাবে ব্রাহ্ম মুহূর্তে জেগে ওঠেন ব্রাহ্মণ। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পূজা উপচার সহ যথা-সময়ে উপস্থিত হন শ্রীমন্দিরে। দেখেন—মন্দির দ্বার উন্মুক্ত। অন্যদিনের মত কৃষ্ণ অঙ্গের সৌরভ এসে মন-প্রাণ আমোদিত করেনা। সঙ্গে সঙ্গে অশুভ চিন্তায় মন তাঁর ভরে ওঠে। দ্রুতপদে অগ্রসর হন তিনি মন্দির মধ্যে রত্নবেদীর দিকে। দেখেন তাঁর আশঙ্কাই সত্য। শ্রীমতী একা, মদনমোহন নেই। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন ব্রাহ্মণের মাথায়। চোখের সামনে থেকে নিভে যায় যেন সব আলো, পূজা উপচার পড়ে যায় থেকে হতে। বক্ষে করাঘাত করে 'কোথায় আমার মদন' বলে আছাড় খেয়ে সেইখানে পড়ে যান তিনি। সংজ্ঞা তাঁর লোপ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান ফিরে আসে। 'কোথায় আমার মদন' বলে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান তিনি। এমনি করে বহুক্ষণ গত হয়ে যায়।

পরে উঠে দাঁড়ান ব্রাহ্মণ। চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে তাঁর দরবিগলিত ধারা। সেই অবস্থায় 'কোথায় আমার মদন' বলে পথে বেরিয়ে পড়েন তিনি।

সেবা পূজা কেবা করে প'ড়য়া র'হল।
কোথায় মদন বলি বাহির হইল॥
পথে যেতে যারে পায় জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ।
এ পথে দেখেছ কেহ মদনমোহন॥

এমনি করে পাগলের মত অবস্থায় পথে বের হয়ে পড়েন তিনি। দুস্তর পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হন বিষ্ণুপুরে। প্রথমেই যান রাজদরবারে। রাজার কাছে গিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর অন্তরের কথা। কারণ তাঁর বিশ্বাস, রাজাই তাঁর বিগ্রহ নিয়ে এসেছেন।

দ্বিজ কহে মহারাজ করি নিবেদন।
দেখাইয়া রাখ প্রাণ মদনমোহন॥

হঠাৎ ব্রাহ্মণকে দেখে আর তাঁর সেই কথা শুনে, রাজা কিছু বিব্রত হয়ে পড়েন। কিন্তু তার পরই সেভাব গোপন করে বলেন, না আপনার মদনমোহন আমার এখানে আসেন নি। তবে তাঁর মতই বিগ্রহ আমার কাছে আছে। তা আমি আপনাকে দেখাব। বহুদূর থেকে বহু পরিশ্রম করে আপনি এসেছেন, এখন বিশ্রাম করবেন চলুন। যথাসময়ে আমি আপনাকে আহ্বান করব।

এই বলে ব্রাহ্মণকে আশা দিয়ে মৃন্ময়ীদেবীর শ্রীমন্দিরে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে, পাত্র-মিত্রদের নিয়ে মন্ত্রণা করেন বীরহাম্বির। অনেকে বলেন সকলের সুযুক্তি মত রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দিয়ে এক রাত্রির মধ্যে, আবার কেউবা বলেন তিন দিনে, মদনমোহনের অনুকরণে তিন বিগ্রহ নির্মাণ করান তিনি। আর তাদের নামকরণ করেন, যুগলকিশোর, গোউর গোবিন্দ জীউ ও রাধাকান্ত জীউ। প্রথম যুগলকিশোর হন আসল মদনমোহনের চেয়ে কিছু ক্ষীণাঙ্গ, গোউর গোবিন্দ জীউ হয়ে পড়েন স্থূলাঙ্গ, আর তৃতীয় রাধাকান্ত জীউ প্রায় আসল মদনমোহনের মত হন।

যাইহোক এক রাত্রি বা সম্ভবত তিনদিনেই তিন বিগ্রহ নির্মাণ, তাঁদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সবকিছু শেষ করে রাজা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। বলেন আসুন, আমার বিগ্রহ আমি আপনাকে দেখাব।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে উঠে দাঁড়ান ব্রাহ্মণ। মনের আশাও হয় তার সেইমত। কিন্তু বিগ্রহ দেখে সব আনন্দ তাঁর ম্লান হয়ে যায়। মুখের ওপর জেগে ওঠে তাঁর হতাশার ছবি! 'এঁরা কেউ আমার মদন নয়' বলে

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়েন তিনি। 'কোথায় আমার মদন ধন' বলে বিষ্ণুপুরের পথে পথে ফিরতে থাকেন। চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে তাঁর শ্রাবণের ধারা। সেইমত অবস্থায় দিন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আশা তাঁর পূর্ণ হয় না। তাই আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে বিষ্ণুপুরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বিড়াই নামে ক্ষুদ্র এক নদীর তীরে উপস্থিত হন তিনি। আপন মনে বলেন—

ক্লান্ত দেহ গঙ্গা তীরে যাইতে নারিব।
জলে যাহা গঙ্গা তাহা এই জলেই মরিব॥

বলতে বলতে হতাশাচ্ছন্ন মন নিয়ে অবসন্ন শরীরে বসে পড়েন সেখানে। এমন সময় কলসী নিয়ে সেখানে আসেন রাজপুরোহিতের বুড়ীমা। আর সেই অবস্থায় সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে সেখানে দেখে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বলেন, কি নাম, কোথায় নিবাস, কি জন্য এসেছেন আপনি এখানে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন তিনি ব্রাহ্মণকে।

বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি! বলেন—

জল নিয়ে ঘরে যাওয়া কথায় কাজ কি!
আমার মদন চলে এসেছে তাই খুঁজতে এসেছি॥

বৃদ্ধা বলেন—

গোঁসাই ঠাকুর যদি মদন খোঁজাই বটে।
সন্ধ্যা হল এখনও কেন পড়ে নদীর ঘাটে॥

তখন সত্য প্রকাশ করেন ব্রাহ্মণ। বলেন—

মদন আমায় দেয়নি ধরা মরব আমি তাই।
মদন বিনে মরণ ছাড়া মোর গতি নাই॥
ক্লান্ত দেহ গঙ্গা তীরে যাইতে নারিব।
জলে যাহা গঙ্গা তাহা এই জলেই মরিব॥

ব্রাহ্মণের সেই কথা বিচলিত করে তোলে বৃদ্ধাকে। রাজ্যে ব্রহ্ম হত্যা হবার ভয়ে, পুত্রের নিষেধ সত্ত্বেও, চুপি চুপি সেই গোপনীয় কথা তিনি প্রকাশ করেন তাঁর কাছে। বলেন, শোন গোঁসাই, আমাদের রাজার ঘরে ঐ নামে এক ঠাকুর এসেছেন। বাঁকা অঙ্গ, সোণার বরণ, অতি সুন্দর মন-প্রাণ-হরণ-করা অপরূপ রূপ। রাজা অতি সঙ্গোপনে অন্তঃপুরের লক্ষ্মীঘরে তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন।

সেই কথা যেন এক নূতন মানুষে পরিণত করে তোলে ব্রাহ্মণকে। সঙ্গে

সঙ্গে উঠে দাঁড়ান তিনি। চোখে মুখে জেগে ওঠে তাঁর আনন্দের জ্যোতি। অফুরন্ত শক্তি সঞ্চারিত হয় যেন তাঁর অবসন্ন দেহে। অধীর উল্লাসে বলে ওঠেন—

দ্বিজ কহে শোন মাগো কহি তোমার ঠাঁই।
সেই আমার মদন বটে আমি আর মরিব নাই ॥

বলতে বলতে সেখান থেকে চলে যান ব্রাহ্মণ। আর কোন প্রকারে রাত্রি অতিবাহিত করে অতি প্রত্যুষেই রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন তিনি। বলেন, আর মিথ্যে বলে আমাকে ভোলাবেন না মহারাজ। অতি বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে আমি শুনেছি, আপনার কাছেই আমার মদন-মোহন আছেন। আপনার অন্তঃপুরের লক্ষ্মীঘরে আপনি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন।

ব্রাহ্মণের সেই সত্য ভাষণে দিশেহারা হয়ে পড়েন যেন বীরহাম্বির। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন তাঁর মাথায়। সেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হয়ে তিনি হয়ে পড়েন বিহ্বলের মত। কিন্তু পরক্ষণেই সেভাব গোপন করে পুনরায় অস্বীকার করেন। তখন ব্রাহ্মণ কোথাও আর না গিয়ে মৃন্ময়ী মন্দিরে হত্যা দেন। অন্নজল সব কিছু পরিত্যাগ করে সেখানে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেন। বীরহাম্বিরের কাছে পৌঁছায় সেই সংবাদ। খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। ব্রহ্মহত্যা হবার ভয়ে খাবার জন্য বার বার করে অনুরোধ করতে থাকেন ব্রাহ্মণকে। কিন্তু সব বিফল হয়। ব্রাহ্মণ অবিচলিত থাকেন তাঁর সঙ্কল্পে। মুখে তাঁর শুধু এক বাণী। 'হায় মদনমোহন'! আর চোখে দরবিগলিত ধারা।

অসহনীয় হয়ে ওঠে সেই দৃশ্য। শুধু রাজা নন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠেন সকলেই। রাজা শরণাপন্ন হন মদনমোহনের। তাঁর কাছে নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের কথা। বলেন, 'হে সর্বসিদ্ধিদাতা সিদ্ধ বিগ্রহ মদনমোহন, হে সর্বান্তর্যামী নারায়ন! তুমি ত আমার অন্তরের সব কথাই জানো। প্রাণ থাকতে তোমাকেও আমি পরিত্যাগ করতে পারব না। আর চোখের সামনে ব্রহ্মহত্যাও দেখতে পারবনা। অকূলের কাণ্ডারী, এর উপায় তুমি কর।' এই কথা বলে তিনিও অন্নজল সব কিছু পরিত্যাগ করে মদনমোহনের কাছে হত্যা দেন। তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করা নিষ্ঠা দিয়ে অবিরত প্রার্থনা করতে থাকেন ঠাকুরের কাছে।

একদিকে রাজা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ। উভয়ের অবস্থাই ক্রমশঃ হতে থাকে ভয়াবহ। অনাহার, অনিদ্রায়, উভয়েরই জীবনী শক্তি ধীরে ধীরে হতে থাকে

ক্ষীণ। উভয়েই ভক্ত চূড়ামণি। আর তার জন্যই বুঝি ঠাকুরের কৃপা হয়। স্বপ্নে রাজাকে দেখা দেন মদনমোহন। বলেন—

পুত্র স্নেহে ব্রাহ্মণ পিতা সেবিয়াছে মোরে।
অসময়ে ডাকছে দেখা দিতে হবে তারে ॥

মহারাজ, তোমার কাছে আমার অনুরোধ—কাল প্রত্যুষে আমার ব্রাহ্মণ পিতাকে আমার কাছে নিয়ে এসে, অনুনয়, মিনতি বা যে কোন প্রকারে হোক, তাঁকে তুষ্ট করে, তাঁর কাছ থেকে আমাকে চেয়ে নাও। আর আমিও তাঁকে দেখা দিয়ে তোমার হাতে আমাকে সঁপে দেবার জন্য অনুরোধ করব। তারপর তোমার কাছে তোমার রচিত এই গুপ্ত বৃন্দাবনেই আমি থাকব। সেই কথা বলে সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে মৃন্ময়ী মন্দিরে গিয়ে দেখা দেন ব্রাহ্মণকে।

কত লীলা জানেন প্রভু অনাথের নাথ।
ওঠ পিতা বলি দ্বিজের অঙ্গে দিলেন হাত ॥
দূরে গেল সব ক্লেশ কর পরশনে।
লুটায়ে পড়িল দ্বিজ রাতুল চরণে ॥

তখন মদনমোহন অতি মধুর স্বরে তাঁকে বলেন—বাবা, আপনি ত অবোধ নন, আপনি ত জানেন, স্বাধীন সত্তা বলতে আমার কিছুই নেই। আমি ভক্তের অধীন। তাই এই বিষ্ণুপুর থেকে যাবার আমার উপায় নেই। রাজা আমাকে সেই ভক্তির বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন। আমার জন্য সব কিছু তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তার জন্য মিথ্যাচার, কপটতা প্রভৃতি মহাপাপ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। নিজের সুনাম, দুর্নামের দিকে দৃষ্টি দেননি। আমার জন্য ইহকাল পরকাল সব কিছু তিনি বিসর্জন দিতে বসেছেন। তাইত তাঁর সেই সর্বস্ব অর্পণ-করা নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। তাঁর ভক্তির বন্ধনে বাঁধা থাকতে বাধ্য হয়েছি। আপনি ঘরে ফিরে যান। সেখানে শ্রীমতী আছে। শ্রীমতী আর আমি অভিন্ন। তার সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে। আর আমিও প্রতিদিন ওখানে যাব। তার প্রমাণস্বরূপ একটি করে আমলি ফুলের কাঠি আমি সেখানে রেখে আসব। এই কথা বলে তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে ব্রাহ্মণের। চিন্তার ঝড় বইতে থাকে তাঁর অন্তরে।

প্রবাদ আছে—তখনকার দিনে আমলি ফুল বিষ্ণুপুর ব্যতীত অন্য কোথাও ছিল না। এদিকে একদিকে রাজা, অন্য দিকে ব্রাহ্মণ—উভয়ের অবস্থাই অবর্ণনীয়। রাজার চোখের ঘুম চলে গেছে। প্রভাতের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। ব্রাহ্মণের অবস্থাও সেই মত। ক্রমে সেই

প্রতীক্ষার তাঁদের অবসান হয়। উদয় দিগন্তে দেখা দেয় ঊষার আলো। গাছে গাছে পাখীর দল শুরু করে তাদের জাগরণী গান। ভোরের বাতাস বইতে থাকে তার প্রাণ মাতানো ছন্দে। তখন রাজা মৃন্ময়ী মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণকে সব কিছু পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মীঘরের সামনে তাঁকে নিয়ে যান, উন্মুক্ত করে দেন তার দ্বার।

ব্রাহ্মণের অন্তরে যেন শিহরণ বহে যায়। তিনি দেখেন, তাঁর সামনেই তাঁর মন প্রাণ সর্বস্ব-হরণ-করা মদনমোহন মূর্তি বিরাজিত। প্রাণ ভরে দেখতে থাকেন তিনি। চোখ ভরে আসে তাঁর জলে।

আপাদ মস্তক দ্বিজ করি নিরীক্ষণ।
এই আমার মদন বলি করিল রোদন॥

ব্রাহ্মণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই দিকে। চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে তাঁর শ্রাবণের ধারা। বহু সান্ত্বনা বাক্য, বহু প্রকার অনুনয়-মিনতি করে সেখানে তাঁকে আসন দিয়ে বসাতে সক্ষম হন রাজা। তারপর তাঁর কাছে নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের কথা। বলেন—

ব্রাহ্মণ ঠাকুর কহি তোমার ঠাঁই।
বামেতে শ্রীমতি বিনে দর্শনে সুখ নাই॥
দয়া কর গোঁসাই দিব যত ধন চাও।
কৃপা করে মদন এলেন রাধায় এনে দাও॥

কিন্তু ফল হয় তাতে বিপরীত। সেই কথায় পুনরায় কাঁদতে থাকেন ব্রাহ্মণ। বলেন—

অমূল্য এ ধন পেয়ে আরও ধন চাও।
বুকের মাণিক নিলে হরে এবার প্রাণ নাও॥

তখন রাজা পুনরায় বহু সান্ত্বনা বাক্য বলেন, বহু অনুনয়-মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের সেই অশ্রুধারার কিছুতেই নিবৃত্তি করতে পারেন না। তাই কোন উপায় স্থির করতে না পেরে, অন্তঃপুর থেকে একথালা মোহর এনে ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করেন তাঁকে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন না।

থালা ভর্তি মোহর এনে ব্রাহ্মণেরে দিল।
বাম পায়ে ঠেলে দ্বিজ কহিতে লাগিল॥

শোনো মহারাজ, যে মহারত্ন আজ আমি পরিত্যাগ করে চলেছি, সাধারণ ধনরত্ন দিয়ে তুমি তার কতটুকু অভাব পূর্ণ করবে? সারা বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য

দিলেও ও অভাব আমার পূর্ণ হবে না। তাই যার জন্য আমি আজ সেই বস্তু হারালাম, যাবার সময় তাকে বলে যাই, মদনমোহন, লোকচক্ষে হও তুমি বিশ্ব নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান,—কিন্তু আমার চোখে তুমি তা নও। আমার সংসারে একাধারে তুমি ছিলে পুত্র, পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু। তুমিই একদিন আমার ছন্দহারা জীবনে এনে ছিলে স্বর্গের সুষমা, তোমাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমার সংসার, তুমিই সেখানে এনেছিলে আলোর অফুরন্ত উৎস। শঠ, নির্দয়, অকৃতজ্ঞ! আজ নিজের হাতে সেই আলো নিভিয়ে দিয়ে যে বাজ তুমি আমার বুকে হানলে তার যে কি দুঃসহ বেদনা অন্তর্যামী তুমি, বেশ ভালভাবেই তা' বুঝতে পারছ। তাই এই যাবার সময় বলে যাই, যার মোহে অন্ধ হয়ে এই সর্বনাশ তুমি আমার করলে, সেই বড় সাধের এই লীলাভূমিও তোমাকে একদিন পরিত্যাগ করে যেতে হবে। আর সেদিন তোমার এই প্রিয় ভূমির প্রতিটি নরনারী কাঁদবে ঠিক এই আমারই মত অবস্থায়। কেউ তা খণ্ডন করতে পারবে না। বলতে বলতে চলতে শুরু করেন তিনি। চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে তাঁর দরবিগলিত ধারা।

কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বিজ বাহির হইল।
মথুরা হইতে যেন নন্দ বিদায় হল॥

ব্রাহ্মণ চলে যান বৃষভানুপুরে; মদনমোহন বয়ে যান বিষ্ণুপুর রাজঅন্তঃপুরে। মদনমোহন দেবের এই কাহিনীর সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনেকে হয়ত অনেক কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু ভক্তি মার্গের সব কথাই যে অবিশ্বাস্য নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যুগের বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি। তাঁদের সর্বস্ব অর্পণ-করা ভক্তি বিশ্বাস দিয়ে এই অবিশ্বাসীর যুগেও শ্যামা মাকে তাঁরা যদি গর্ভধারিণী মায়ের মত প্রত্যক্ষভাবে পেয়ে থাকেন, তাহলে সেই পরিপূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাসের দিনে, শ্যামও যে তাঁর ভক্তদের কাছে ঐ মতভাবে ধরা দিয়েছিলেন, তা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা অনুচিত।

তারপর আর একদিক দিয়ে বিচার করে দেখলেও একে ঐশীলীলা বলে অভিমত প্রকাশ করতে হয়। কারণ মহারাজ বীরহাম্বির তখন কোন অন্যায় আচরণ করে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করলে তাঁর দীক্ষা গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের মত মহাপুরুষ তাঁকে ক্ষমা করতেন না। আর ব্রাহ্মণও আত্মহত্যার যে পণ করে মৃন্ময়ী মন্দিরে হত্যা দিয়েছিলেন তার থেকে তিনি বিরত হতেন না। এবং নবাব দরবারে বীরহাম্বিরের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেও তার সাহায্যে বিগ্রহ তিনি নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তার কিছুই হয় নি। মদনমোহন দেবের

অনুকরণে তৈরী করা মহারাজ বীরহাম্বিরদেবের প্রতিষ্ঠিত গোউর গোবিন্দ জীউ মদনমোহনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিষ্ণুপুর মদনমোহন মন্দিরে ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল শ্রীমতী আছেন, মদনমোহন নেই। সেই থেকে বহু অনুসন্ধান করেও তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তাই নিরুপায় হয়ে শাস্ত্রীয় বিধান মত বাংলা ১৩৭২ সালের ২৩শে আষাঢ় রথের পুনর্যাত্রার দিন মহাসমারোহে তাঁর নূতন কলেবরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। যুগলকিশোর জীউ আছেন বিষ্ণুপুব রাজদরবারের সংলগ্ন বুড়ো বাধাশ্যাম জীউয়ের শ্রীমন্দিরে। এবং আরও অন্যান্য বহু শ্রীমন্দিরের বিগ্রহও শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিরাট দারু মূর্তিও সেখানে আছেন। নিত্য বহু বিগ্রহের সেবা পূজা সেখানে হয়।

মদনমোহনের অনুকরণে তৈরী করা আর এক বিগ্রহ রাধাকান্ত জীউ যে বর্তমানে কোথায় আছেন তা ঠিক জানা যায় না। শোনা যায়, তাঁর সুঠাম মূর্তিতে আকৃষ্ট হয়ে এক সন্ন্যাসী মদনমোহন মন্দিরের পশ্চিম দিকে তার অনতি-দূরে অবস্থিত তাঁর শ্রীমন্দির থেকে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান। আবার অনেকে বলেন, সন্ন্যাসীর নামে অপবাদ দিয়ে সে সময়ের পূজারী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুর থেকে দূরবর্তী জাড়া নামক এক গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে সেই বিগ্রহ বিক্রয় করেন। রাধাকান্ত জীউ বর্তমানে সেখানেই আছেন।

মহারাজা বীরহাম্বির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সে সময়ে বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্র-শক্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে অস্ত্রের ঝঞ্জনা, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত রব ও কামানের গর্জন শোনা যেত, সেখানে জেগে ওঠে কীর্তনের কলরোল। সমস্ত মল্লভূম প্লাবিত হয় প্রেমের বন্যায়।

একদিক দিয়ে তাতেও কল্যাণ সাধিত হয়েছিল প্রচুব। ঐ সময় থেকে উচ্চ, নীচ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অস্পৃশ্যতা প্রথা শিথিল হয়ে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতিকে ধর্মান্তর গ্রহণের অভিশাপ থেকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করেছিল। এক দিক দিয়ে মহারাজ বীরহাম্বিরদেবের সেও এক বিশিষ্ট কীর্তি। তাঁর আর এক কীর্তি জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রজাকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মত মুসলমান পীর-ফকিরেরাও তাঁর কাছে সম্মান ও সমাদর পেতেন সমান ভাবে। হিন্দুদের দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মত মুসলমানদের পীরোত্তর সম্পত্তিও তিনি দান করে গেছেন প্রচুর। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পীর কোরবান সাহেবের আস্তানা তাঁরই মহৎ দান। আর শুধু তাই নয়, তাঁর মহান ব্যবহারে

আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সভায় যাতায়াত করতেন কোরবান সাহেব। এবং আউলিয়া গোঁসাই ছিলেন তাঁর সভাপণ্ডিত। এঁদের উভয়ের সম্বন্ধে একটি বেশ মধুর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে এখানে আমি তা দিলাম।

সে সময় কোরবান বা কুরবানসাহেব ছিলেন যেমন মুসলমানদের বিখ্যাত সাধক, হিন্দুদের ছিলেন সেইমত আউলিয়া গোঁসাই। উভয় সাধকের শক্তি সম্বন্ধে উভয় জাতির মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। উভয় জাতির ভক্তেরা কখনও বলত সাধন ক্ষেত্রে আউলিয়া গোঁসাই বড়, কখনও বলত কোরবান সাহেব বড়। কাজের ভেতর দিয়ে তাঁদের শক্তি পরীক্ষা কখনও হয় নি। কিন্তু একদিন ভগবান তার সুযোগ করে দিলেন। কোরবান সাহেবের ভক্তেরা তাঁকে বললে, বাবা আপনাকে এমন একটা কাজ করতে হবে, আউলিয়া গোঁসাই কিছুতেই যেন তা না পারে। আপনাকে একটা বিরাট জংলী বাঘে চড়ে আউলিয়ার আখড়ায় যেতে হবে। কোরবান সাহেব বললেন, বেশ এতে যদি তোমাদের তৃপ্তি হয়, তাই হবে। আর যায় কোথায়? কোরবান সাহেবের ভক্তেরা সব আনন্দে একবারে যেন ফেটে পড়ে। চারদিকে তারা ঐ কথা বলে কোরবান সাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকে।

আউলিয়ার ভক্তেরা তাই অস্থির হয়ে ওঠে। বলে বাবা, এর বিহিত আপনাকে করতেই হবে।

সব কথা শুনে আউলিয়া গোঁসাই বলেন, তোমরা যখন বলছ, তখন যা হয় একটা কিছু করা যাবে। কিন্তু আসলে তিনি কিছুই করেন না।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে দেখা যায়, সত্য সত্যই কোরবান সাহেব বিরাট এক জংলী বাঘে চড়ে তাঁর ভক্তদের নিয়ে আউলিয়ার আখড়ার দিকে আসছেন।

আউলিয়া তখন তাঁর আখড়ার এক ভাঙ্গা দেওয়ালের ওপর চড়ে দাঁত মাজছেন। তাই দেখে তাঁর ভক্তেরা সব প্রমাদ গণে! আউলিয়াকে তারা বলে, আপনাকে তখন সব কথা আমরা বললাম! আপনি যা হয় একটা কিছু করব বলে কিছুই করলেন না। আর ঐ দেখুন কি সর্বনাশ হতে চলেছে! কোরবান সাহেব তাঁর হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের নিয়ে বিরাট এক জংলী বাঘে চড়ে আপনার এই আখড়ায় আসছেন। মান-সম্ভ্রম আপনার সব গেল। বলতে বলতে চোখ দিয়ে তাদের জল এসে যায়।

আউলিয়া গোঁসাই দেখেন, তাঁর ওপর তাঁর ভক্তদের কত ভক্তি, কত আস্থা। তাই তিনি বলেন, সন্ন্যাসী মানুষ আমি, মান-অপমান আমার সব সমান। তবে তোমাদের মান রক্ষার জন্য যা হয় ব্যবস্থা আমি একটা করছি।

বলেই সেই ভাঙ্গা দেওয়ালকে সম্বোধন করে বলেন, চল্‌ বাবা চল্‌। একটু এগিয়ে গিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসিগে চল্‌।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। সকলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আউলিয়ার কথা মত সত্যই সেই ভাঙ্গা দেওয়াল তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে কোরবান সাহেবের দিকে। তাই দেখে কোরবান সাহেব ছুটে এসে আউলিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আর আউলিয়াও তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ, দেওয়াল সব কোথায় উধাও হয়ে যায়। সকলে উভয় সাধকের শক্তি দেখে ধন্য হয়।

মহারাজ বীরহাম্বিরের আর এক কীর্তি, তাঁর শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিরাট দারু মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সেই উপলক্ষ্যে খেতুরীর মহোৎসবের মত বিষ্ণুপুরেও বিরাট এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান। 'মণিমঞ্জুষা' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ গৌড়ে নিয়ে যাবার সময় নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ নামে যে দুজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন তার মধ্যে নরোত্তম ঠাকুরের নাম বিষ্ণুপুরের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কারণ তিনি তার পরবর্তীকালেও বিষ্ণুপুরে এসেছেন। এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে খুবই বেশী। আচার্য্যদেব সময় বিশেষে খেতুরীতে গিয়ে নরোত্তমের কাছে থাকতেন। সেই সময়ের বৈষ্ণব শিক্ষা দীক্ষা ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল বিষ্ণুপুর নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও কর্ম পদ্ধতি স্থির করা হত। তার ফলে খেতুরী ও বিষ্ণুপুর তখন প্রায় অভিন্নের মত হয়ে গিয়েছিল। তাই নরোত্তমের কিছু পরিচয় এখানে দিলাম। নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের অতি আদরের একমাত্র সন্তান। কিন্তু তবুও সেই অগাধ স্নেহ, অতুলবৈভব, সংসারে তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে নি। তিনিও শ্রীনিবাসের মতই সুদর্শন ও শৈশবকাল হতেই সংসার বিরাগী চৈতন্যের অনুরাগী ছিলেন। প্রবাদ আছে—অতি কিশোর বয়সেই আকাশপটে তিনি তাঁর মানস গৌরাঙ্গকে দেখেছিলেন এবং তাঁর বাণী শুনেছিলেন। সেই থেকে তিনি চৈতন্যের প্রেমে এমন পাগলের মত হয়ে পড়েন। যার ফলে তাঁর নাম করলে ভাবের আবেগে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। তাঁর কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসত, চোখের জলে বুক ভেসে যেত। তাই একমাত্র পুত্রের সেই অবস্থা দেখে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন কৃষ্ণানন্দ। তিনি বুঝতে পারেন, সর্বনাশ তাঁর শিয়রে। যেমন বুঝেছিলেন বুদ্ধদেবের পিতা কপিলাবস্তুর শুদ্ধোধন, যেমন বুঝেছিলেন শচীমাতা, যেমন বুঝেছিলেন রঘুনাথদাসের পিতা

সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাস প্রভৃতি। গৌড়ের সম্রাটের সঙ্গে কৃষ্ণানন্দের সম্পর্ক ছিল খুবই প্রীতির। তাই তাঁর সেই সর্বনাশের সংবাদ অবগত হয়ে নরোত্তমকে তিনি গৌড়ে নিয়ে যান। সেখানে নানা প্রকারের প্রলোভনের ভেতর দিয়ে তাঁর সংসার বিরাগী মনকে সংসারে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয় না। ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর নরোত্তম সম্রাটের সেই দুরভিসন্ধি অবগত হয়ে সকলের অগোচরে একদিন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং ধরা পড়বার ভয়ে সোজা পথে না গিয়ে দুর্গম বন পথ দিয়ে প্রথমে কাশীর রাজঘাট ও পরে সেখান থেকে একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়ে উপস্থিত হন। দুর্গম পথের দুঃসহ বেদনা, অর্ধাহার, অনাহার সবকিছুর জন্যে শরীর তাঁর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পিঞ্জর থেকে মুক্তিলাভ করলে, সেই মুক্তির আনন্দ তাকে যেমন অনির্বচনীয় অবস্থায় নিয়ে যায়, তিনিও সেই মুক্তির আনন্দে সেই মত সব জ্বালা ভুলে যান। মুখে জেগে ওঠে তাঁর এক অপার্থিব আনন্দের জ্যোতি।

কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে এমন এক মহাসাধকের শিষ্য হবার জন্য মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে ওঠে যিনি দীক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সাধারণত কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন না। বৃন্দাবনের এক নিভৃত অঞ্চলে দুশ্চর প্রেম সাধনায় তিনি মগ্ন। সব কিছুই অবগত হন নরোত্তম, কিন্তু তবুও হতাশ হন না। মনে মনে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে অতি সঙ্গোপনে নিজেকে নিযুক্ত করেন তাঁর সেবায়। শেষ রাত্রে সেই মহাসাধক লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে গিয়ে অতি সন্তর্পণে আশ্রম, এমন কি তাঁর শৌচে যাবার স্থান পর্যন্ত পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। একদিন, দুদিন, তিনদিন,—লোকনাথ গোস্বামী আশ্চর্য হয়ে যান সেই দৃশ্য দেখে। তারপর একদিন তিনি তাঁর আশ্রমের এক নিভৃত স্থানে অতি সঙ্গোপনে রাত্রি জেগে বসে থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরও প্রায় অতীত হয়ে যায়। তারপর তিনি দেখেন এক দেবকান্তি কিশোর অতি সন্তর্পণে সমার্জনী হাতে তাঁর আশ্রমের অঙ্গনে এসে দাঁড়ায়। চোখ দুটি ছলছল করছে তার জলে, দৃষ্টি অতি করুণ। কিন্তু মুখে যেন এক অপার্থিব জ্যোতি। কখনও সমার্জনী নিয়ে অঙ্গন পরিষ্কার করছে, আর কখনও সেটি বুকে চেপে ধরে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। সেই দৃশ্য এমন অবস্থায় উপনীত করে লোকনাথ গোস্বামীকে, যার জন্য স্থির থাকতে পারেন না তিনি। অতি সন্তর্পণে পিছন দিক দিয়ে গিয়ে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন সেই ভাব-বিহ্বল কিশোরকে। বলেন, চোর, আজ তোমাকে পেয়েছি। বল, তুমি কে? আর তোমাকে আমি ছাড়ব না।

সেই আশাতীত সৌভাগ্যে নরোত্তমের অন্তরে যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে যায়। লজ্জাবতী তরুণীর মত লজ্জাজড়িত স্বরে বলেন, আমিও ত তাই চাই। তাহলে আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।

অলক্ষ্যে বসে হাসেন তাঁর সৌভাগ্য লক্ষ্মী। সেই প্রাণ ঢালা সেবার অপূর্ব মহিমায় অসাধ্য সাধিত হয়। যে মহাসাধক মনে অহমিকা উদয় হবার ভয়ে কখনও শিষ্য গ্রহণ করেন নি, যিনি চৈতন্যের প্রেমে পাগল, তাঁর বাল্যসখা, তাঁরই আদেশে তাঁর সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে বুকভরা বেদনা নিয়ে বৃন্দাবনের সেই নিভৃত অঞ্চলে দুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত—সেই কৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্কল্প টলে। তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন, দীক্ষা দেন, আর দেন তার সঙ্গে তাঁর অগাধ ভালবাসা, অকৃপণ আশীর্বাদ। তার ফলে ক্রমে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম ভক্তির খ্যাতি সমস্ত বৃন্দাবনে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে তাঁরও শিক্ষা-দীক্ষার ভার নেন। সব আশা তাঁর পূর্ণ হয়। ভক্তের সব কামনা পূর্ণ করেন ভক্তের ভগবান।

তারপর তার পরবর্তীকালে গ্রন্থ নিয়ে গৌড়ে যাবার সময় বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ হরণের পর শ্রীনিবাসের আদেশ মত গৌড় ও পরে খেতুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন নরোত্তম। তাঁর সর্বস্বধন একমাত্র পুত্রের আগমনে কৃষ্ণানন্দ যেন হাতে স্বর্গ পান। কিন্তু নরোত্তম প্রাসাদে না গিয়ে সেখানের শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে আশ্রয় নেন। পিতা কৃষ্ণানন্দকে জানিয়ে দেন - তিনি প্রাসাদে যাবেন না, সন্ন্যাস জীবনই যাপন করবেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের নির্দিষ্ট যে ভোগ আছে তিনি তার থেকেই প্রসাদ পাবেন। তার বেশী কিছু অনুরোধ করলে খেতুরী ত্যাগ করে তিনি চলে যাবেন।

নরোত্তমের সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তাঁর বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সন্তোষ দত্তকে খেতুরীর রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। নরোত্তমের খেতুরী পরিত্যাগের ভয়ে সেই নূতন রাজা সন্তোষ দত্ত ও কৃষ্ণানন্দ কেউই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। তাই সেই তরুণ তাপস খেতুরীতেই অবস্থান করেন। প্রবাদ আছে সেই সময় মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড-কমণ্ডলুধারী নরোত্তমের মধ্যে এমন এক দেবভাব-দেবদীপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল, যার জন্যে সেই সময় যিনি তাঁকে দেখতেন, তিনিই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁরই মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ত। এমন কি তাঁর সেই দেবমূর্তি দেখে পিতা কৃষ্ণানন্দ পর্যন্ত একদিন তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আর মনে হয় রাজা সন্তোষ দত্ত-ও সেই প্রভাব হতে মুক্ত হননি। কারণ খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা নরোত্তমের মনে উদয় হওয়ায়, সেই সংবাদ কোন প্রকারে অবগত হয়ে

সন্তোষ দত্ত এমন বিপুলভাবে তার আয়োজন করেন যে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পানিহাটির দণ্ডমহোৎসবের পর বৈষ্ণব সমাজে এত বড় উৎসব আর হয় নি। সেই থেকে খেতুরীর রাজভাণ্ডার তিনি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেন। আজও 'খেতুরীর মহোৎসব' নামে তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

সেই উৎসবে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রধানেরা ও বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার বৈষ্ণব খেতুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। 'আমরা সকলের নাম জানি নে, যিনি এই উৎসবে যোগ দিয়ে আমাদের উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ইচ্ছে করেন তিনি দয়া করে আমাদের এখানে এসে আমাদের অনুগৃহীত করবেন। আমরা আমন্ত্রিত ও অনাহুতের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখব না।' রাজা সন্তোষ দত্ত এই মর্মে সারা বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করেছিলেন। বিষ্ণুপুর থেকে শ্রীনিবাস আচার্য্য, মহারাজা বীরহাম্বির, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি খেতুরীতে গিয়েছিলেন।

এই উৎসবের সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনা, স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বামীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা দেখবার জন্য খেতুরীতে গিয়েছিলেন।

সেই উৎসবের আর এক বৈশিষ্ট্য, রাজা সন্তোষ দত্ত আহূত ও অনাহূত সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে পাথেয় ও পদমর্যাদা মত প্রণামী দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্যবান অতি উৎকৃষ্ট এক জোড়া গরদের কাপড়, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যকে দিয়েছিলেন ৫টি রৌপ্য মুদ্রা ও একখানি রেশমের বস্ত্র। এমনিভাবে সম্মানীয়দের প্রত্যেককে তিনি সম্মানিত করেছিলেন।

মহারাজা বীরহাম্বির সেখানের সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সমারোহ দেখে এমন মুগ্ধ হন, মনকে তাঁর এমনভাবে তা প্রভাবিত করে, যার জন্যে বিষ্ণুপুরে এসেই তিনি সেইমত উৎসবের আয়োজন করেন। শুধু গৌরাঙ্গদেব নন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিরাট দারুমূর্তি নির্মাণ করিয়ে শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করান। এবং সেই উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রধান ও বাংলার বিভিন্ন স্থানের আরও বহু বৈষ্ণবকে বিষ্ণুপুরে আনিয়ে এক বিরাট মহোৎসব সম্পন্ন করেন।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে, বিষ্ণুপুর রাজ দরবারের সংলগ্ন বুড়ো রাধাশ্যাম জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে উক্ত মূর্তি দুটি আছেন। সাক্ষীগোপাল ও ষড়ভুজ নামে আরও দুটি বিরাট ও বিশিষ্ট দারুমূর্তি ঐ সময়েই নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান

করা হয়। 'ষড়ভূজ' বিষ্ণুপুর বাদাকুলী মহল্লায় তাঁর শ্রীমন্দিরে এবং 'সাক্ষী-গোপাল' সাক্ষীগোপাল পাড়া মহল্লায় অবস্থিত 'চৈতন্যদাস মোহান্তদের বাড়ীতে আছেন। মহারাজ বীরহাম্বিরের আর এক বিশিষ্ট কীর্তি, তাঁর ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ের আবেগ দিয়ে তিনি অতি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে পারতেন। তার মধ্যে 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে তাঁর রচিত যে দুখানি পদাবলী আছে, তা এখানে দিলাম।

পদাবলী

১

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলে মনের আশ
তোমা বিনে গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার॥
করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব ভেল উচাটন
এসব তোমার ব্যবহার॥
রাধা পদে সুধা রাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকাগণসহ দেখাইলা কুঞ্জ গেহ
জানাইলা দুঁহ প্রেমরীত॥
যমুনার কুলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধা কানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীরহাম্বির হিয়া ব্রজপুর সদা ধীয়া
যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

২

শুনগো মরম সখী কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব ভেল উচাটন
প্রেম বিনা খোয়াইনু পরাণি॥

শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়া যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি ধীর॥
শাশুড়ী ননদ মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বিরচিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেল কালাচাঁদের পায়॥

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার ফলে শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে বৃন্দাবনধামে যাবার পর কৃষ্ণপ্রেমে পাগল রাজার মন শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন বৃন্দাবনের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়, যার জন্য সেখানে যাবার স্পৃহা তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারেন না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সন্ধ্যা তাঁর যত ঘনিয়ে আসতে থাকে, সে আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়ে। তাই শেষ জীবন সেখানে অতিবাহিত করবার আশায় ১৬২০ খৃষ্টাব্দ ও ৯২৬ মল্লাব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র ধাড়িহাম্বিরদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে শ্রীবৃন্দাবনধামে তিনি চলে যান। সেখানেই তাঁর মহান জীবনের অবসান হয়।

এখনও সেখানে তাঁর সমাধি আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি। বিষ্ণুপুর রাজবংশের 'সিংহ' উপাধিলাভ, বিষ্ণুপুরে ব্যাপক সঙ্গীত বিস্তার প্রচলন, চেৎবরদা বিজয়, সর্বনাশী লালবাঈ, মহারাণী চন্দ্রপ্রভার 'পতিঘাতিনী সতী' আখ্যালাভ প্রভৃতির কাহিনী।

মহারাজ বীরহাম্বিরদেবের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার ফলে, উগ্র ক্ষত্রিয়ভাবের শেষ হয়ে গিয়ে বিষ্ণুপুরের মাটিতে যদিও বৈষ্ণবী প্রেমের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে, তবুও তার ক্ষাত্রশক্তির অবলুপ্তি ঘটেনি। বৈষ্ণববাদের সঙ্গে সঙ্গে তার সামরিক প্রস্তুতিও এগিয়ে গিয়েছে সমানভাবে। উক্তসময়ের মধ্যেই তৈরী হয়েছে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গদ্বার ছোট ও বড় পাথর দরজা। মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের চেৎবরদা বিজয়ও উক্ত সময়েরই অন্তর্ভুক্ত।

তারপর উগ্র বৈষ্ণববাদের চাপে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে শৈথিল্য এসেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং মানবতা চরম সীমায় এসে পৌছেছে। ন্যায়-ধর্মে আস্থা, ভগবানের ওপর ভক্তি-বিশ্বাস প্রভৃতি সংগুণ, মানুষকে যে কিরকম পুণ্যময় করতে পারে বিষ্ণুপুর এমন অভূতপূর্বভাবে তা দেখিয়েছে যে, বিষ্ণুপুরই বোধহয় তার একমাত্র নিদর্শন।

আর সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও মহারাজ বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে মল্লভূমের বুকে এমন সাংস্কৃতিক জোয়ার এসেছে। যার ফলে সারা বাংলার কৃষ্টিগগন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই পরশমণির স্পর্শ পেয়ে বাংলার শিল্প, সাহিত্য, সমাজ নূতনভাবে গড়ে উঠেছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে আজও তার বহু নিদর্শন দেখা যায়। মহারাজ বীরহাম্বিরদেবের পর **ধাড়িহাম্বিরদেব** বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দ ও ৯২৬ মল্লাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমসামযিক।

এঁরই সময়ে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ ও ৯২৮ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে :

বসুকর নব গণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতি ললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥

সেই জন্য উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্মাণ কর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহ ব্যক্তিটি যে কে তা বেশ ভালভাবে বোঝা যায় না। কারণ-বিষ্ণুপুরের আরও সব শ্রীমন্দির নির্মাণকারী ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিদের নামের পূর্বে নৃপতির নাম ও তাঁর পিতৃ-পরিচয়াদি দেওয়া আছে। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠা ফলকে তার কোন উল্লেখ নেই। আর সেই সময় বিষ্ণুপুর রাজবংশের সিংহ উপাধিও ছিল না। সেই জন্য উক্ত বীরসিংহ ব্যক্তিটি যে বিষ্ণুপুর রাজবংশের কেউ নন একথা অবিসম্বাদিত সত্য। মনে হয় বীরসিংহ নামে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের কোন নিকট আত্মীয় বিষ্ণুপুর রাজের অনুমতি নিয়ে উক্ত মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের 'সিংহ' উপাধিধারী নিকট আত্মীয় যে ছিলেন তার প্রমাণ, মহারাজ জয়মল্ল দীনু সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, মহারাজ বেণুমল্ল মতিহার সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, মহারাজ জগৎমল্ল গোবিন্দ সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন প্রভৃতি।

মহারাজ ধাড়িহাম্বিরের রাজত্বকাল অতি স্বল্পস্থায়ী। অনেকে বলেন, ৬ বৎসর রাজত্ব করবার পর তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর তাঁর কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেন। কিন্তু তা নয়! তাঁর সিংহাসন চ্যুতির প্রধান কারণ, তাঁর চরম দুর্ভাগ্য। মাত্র ৬ বৎসর রাজত্ব করবার পর তিনি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন। এবং তাঁর একমাত্র পুত্র বাক্‌শক্তি রহিত হওয়ার জন্য রাজ্যের কল্যাণ কামনায় মহীয়সী মহারাণী নিজে তাঁর দেবর রঘুনাথ মল্লদেবের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে তাঁকে অভিষিক্ত করেন।

মহারাজ রঘুনাথমল্লদেব। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ ও ৯৩২ মল্লাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের একজন দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। এঁর বিস্ময়কর শৌর্যে বিষ্ণুপুর রাজবংশ 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হন। এবং এঁরই অসাধারণ শক্তিতে বিষ্ণুপুর করভার থেকে মুক্ত হয়ে নবাব দরবারের স্বাধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে, এঁর পূর্ববর্তী মহারাজা ধাড়িমল্ল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব সরকারকে এক লক্ষ সাত হাজার টাকা করে রাজস্ব দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু তা নামে মাত্র। তিনি বা তাঁর পরবর্তী

বীরহাম্বির, ধাড়িহাম্বির, কেউই তা আদায় দেন নি। আর মোগল-পাঠান সংঘর্ষের সময় পাঠানদের বিরুদ্ধাচরণ করে মোগলদের সাহায্য করায় করের জন্য বিষ্ণুপুরকে তাঁরা পীড়ন করেন নি। এমনকি মোগলের সেই মিত্রতার জন্য মোগল সম্রাট আকবর শাহের রাজস্ব সচিব তোডরমল্ল রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ভূমি জরিপ করিয়ে যখন আসল তুমারী জমা প্রস্তুত করেন তখন মল্লভূমকে তিনি তার মধ্যে জড়িত করেন নি।

কিন্তু তার পরবর্তীকালে সম্রাট শাজাহানের পুত্র সুজা বাংলার সুবাদার হয়ে এসে ব্যবস্থার পবিবর্তন করেন। তিনি সেই তুমারী জমার সংশোধন করে বিষ্ণুপুরের নূতন পেশকষা ধার্য করেন এবং তা দেবার জন্য আদেশ দেন রঘুনাথমল্লদেবকে। কিন্তু তিনি তা দিতে স্বীকার করেন না। বলেন, দিল্লীব দরবার যে রাজস্ব মকুব করেছেন প্রদেশের শাসন কর্তা হয়ে সে রাজস্ব আদায় করবার কোন অধিকার শাহজাদার নেই। কিন্তু সুজা তা শোনেন না। বলপূর্বক তা আদায় করবার জন্য বিষ্ণুপুরে পাঠান তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী। কিন্তু সে আশা তাঁর সফল হয় না। রাজস্ব আদায় করে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক সে বাহিনীর একটি প্রাণীকেও রাজমহলের বুকে ফিরে যেতে হয় নি। বিষ্ণুপুরের প্রান্তেই তাদের সব দুরাশার পরিসমাপ্তি হয়। রচিত হয় তাদের শেষ শয্যা। তখনকার দিনে কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, চৌকান, যমুনা, কালিন্দী প্রভৃতি বাঁধ, বিষ্ণুপুরের চারদিক ঘিরে একের পর এক সাতপ্রস্থ পরিখা, বিষ্ণুপুরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত দ্বারকেশ্বর নদ, প্রত্যেকের সঙ্গে এমন সুন্দর সংযোগ ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে পরিখা, বিশেষ করে বিষ্ণুপুর নগর থেকে বহু নীচে অবস্থিত দ্বারকেশ্বর নদে বিরাট জল প্লাবনের সৃষ্টি করা যেত।

সুজার প্রেরিত সৈন্যবাহিনীরও সলিল সমাধি হয় সেই দ্বারকেশ্বর নদের জলপ্লাবনে। কিন্তু তাতেই বিষ্ণুপুরের সব ভয়-ভাবনার নিবৃত্তি হয় না। সেই মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর কি উপায়ে বিষ্ণুপুরের শক্তিকে খর্ব করা যায় তার উপায় খুঁজছিলেন সুজা। এমন সময় ঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা। একাকী বন্দী অবস্থায় রাজমহলে প্রেরিত হন রঘুনাথমল্লদেব। হর্ষ-বিষাদভরা সে এক বিচিত্র কাহিনী। শ্রীনিবাস আচার্য্য তখন গত। তাই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্রের নিকট দীক্ষা নেবার জন্যে যাজী গ্রামে যাচ্ছিলেন রাজা। গুরু বরণের জন্য গমন। তাই রাজসিক ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। সঙ্গে ছিল প্রয়োজনের উপযোগী পাথেয়, সেবক, আর কিছু সংখ্যক সশস্ত্র রক্ষী। সেই সংবাদ অবগত হয়ে সেই সুযোগে সুজার তাঁবেদার বর্ধমানের শাসনকর্তা সেই

অসহায় অবস্থায় অতর্কিতে, তাঁকে বন্দী করে রাজমহলে পাঠিয়ে দেন। সুজার স্বপ্ন সফল হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে আবদ্ধ করেন কারাগারে।

পরকালে মুক্তি অর্জনের আশায় গুরু বরণ করতে গিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হন রঘুনাথমল্লদেব। অলক্ষ্যে বসে হাসেন তাঁর সৌভাগ্য লক্ষ্মী। কারণ এমন অভাবনীয় ভাবে সেখান থেকে তিনি মুক্ত হন, যা চিরকালের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখে বিষ্ণুপুর রাজবংশকে।

একদিন রাজমহলের কারাগারে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন রঘুনাথমল্লদেব। এমন সময় তিনি দেখেন, সেই কারাগারের সামনের প্রাঙ্গণে সতেরজন অশ্বরক্ষী এক বিশালকায় অশ্বকে টহল দিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিকের মত মনে হয় সেই দৃশ্য। তাই তাঁর কৌতূহল হয়। সেই অশ্বরক্ষকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, এ তোমাদের কেমন কাজ? একটা গিধড়বাচ্চাকে পাকড়াবার জন্য তোমাদের এতগুলো জোয়ানের প্রয়োজন হয়? এই তোমরা হিম্মতের বড়াই কর? বলে হেসে ওঠেন তিনি।

রাজা কথা বলেন সাধারণ ভাবেই। কিন্তু ফল হয় তাতে বিপরীত। তাঁর সেই কথাকে ব্যঙ্গোক্তি মনে করে অশ্বরক্ষকের দল যেন ক্ষেপে ওঠে। রঘুনাথমল্লদেবের বিরুদ্ধে নালিশ করে তারা সুজার দরবারে।

সবকিছু শুনে গর্জে ওঠেন সুজা। সঙ্গে সঙ্গে তলব করেন তিনি রাজাকে। বলেন, তুমি যে আমার অশ্বরক্ষকদের বিদ্রূপ করেছ, জানো সে অশ্বের শক্তি কত?

একা পারবে তুমি তাকে সংযত করতে? কিন্তু সাবধান! বহু বিখ্যাত ঘোড়সওয়ারও ওকে হার মানাতে পারে নি। ওর সওয়ার হয়ে কাউকে বিকলাঙ্গ হতে হয়েছে, কাউকে জীবন দিয়ে করতে হয়েছে তার দম্ভের প্রায়শ্চিত্ত।

তাতে ভয় পাওয়া দূরে থাক, হেসে ওঠেন রাজা। বলেন, শাহজাদা, একাকী যারা ওকে হার মানাতে পারে নি, ফেরুর দল, ফেরুর জাতি তারা। কিন্তু এই রঘুনাথমল্লদেব তা নয়—সে সিংহ! আর সিংহেরই জাতি সে।

পুনরায় গর্জে ওঠেন সুজা! বলেন, ও মুখের কথায় হবে না। দেখাতে হবে তোমার সেই সিংহ বিক্রম।

সম্মত হন তাতে রাজা। বলেন, তার জন্য আমি প্রস্তুত শাহজাদা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুক্তি দেন সুজা। আরম্ভ হয় রঘুনাথমল্লদেবের জীবন-মরণ পরীক্ষা। কুলদেবী মৃন্ময়ী মায়ের নাম স্মরণ করে সেই দুষ্ট অশ্বে আরোহণ

করেন তিনি। সকলে প্রতীক্ষা করতে থাকেন তাঁর দম্ভোক্তির শাস্তি দেখবার জন্য। তাঁরা জানেন, ঐ দুর্দান্ত অশ্ব এখনই পায়ের তলায় ফেলে দেবে ওর জীবনান্ত করে। কিন্তু তার কিছুই হয় না। অশ্ব বুঝতে পারে কত শক্তিমান তার আরোহী। তাই তাঁর স্পর্শ পেয়ে যাদুকরের যাদুদণ্ড স্পর্শের মত শান্ত-সংযত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে তার সওয়ারের আদেশের জন্য। তারপর রঘুনাথমল্লদেবের ইঙ্গিতে তাঁকে নিয়ে ঝড়ের বেগে সে ছুটে যায়। মিলিয়ে যায় দিগন্তের বুকে। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সকলে তা প্রত্যক্ষ করেন।

কিন্তু তবুও মনে তাদের কত বিরূপ কল্পনার উদয় হয়। এমনকি অনেকে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিতই হয়ে থাকেন।

কিন্তু তার কিছুই হয় না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলের সব কল্পনার অবসান হয়। ফিরে আসেন রাজা। প্রবাদ আছে—কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করে আসেন তিনি সেই কয়েক ঘণ্টায়। প্রতীক্ষারত জনতা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তা প্রত্যক্ষ করেন। ঘর্মাক্ত দেহ রাজা ঘোড়া থেকে নেমে একাকীই টহল দিয়ে নিয়ে বেড়ান তাকে। ঘোড়ারও সারা শরীর দিয়ে ঝরণা ধারার মত ঝরতে থাকে ঘাম। সবকিছু দেখে সব বিরূপতা দূর হয়ে যায় সুজার। উচ্ছ্বাস ভরে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। বলেন, সাবাস জোয়ান! ধন্য তুমি রাজা! শক্তি, সততা, সবদিক দিয়েই তুমি অপরূপ! ইচ্ছে করলে আমার ঐ ঘোড়া নিয়ে অনায়াসে তুমি চলে যেতে পারতে। কিন্তু তা যাওনি। বীরত্ব, মহত্ব সব কিছুই তোমার অতুলনীয়! সিংহের মতই তোমার শৌর্য। সত্যই সিংহের জাতি তুমি। আজ থেকে তুমি আর রঘুনাথমল্লদেব নও তুমি রঘুনাথসিংহদেব। যাও, ঐ ঘোড়াকে পরিত্যাগ করে তুমি নিজে বিশ্রাম করগে।

কিন্তু তবুও রাজা সেই ঘোড়াকে টহল দিয়ে নিয়ে বেড়ান। বলেন, তাহলে আপনার এই ঘোড়া এখনই মারা যাবে শাহজাদা।

সুজা বলেন, যাক! যাবে দেও! তুমি আগে নিজেকে বাঁচাও!

তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজা তাঁর আদেশ পালন করেন। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পড়ে মারা যায় সেই ঘোড়া। পরে করের জন্য পীড়ন করা দূরে থাক, বহু মূল্যবান সব উপহারসহ তাঁকে মুক্তি দেন সুজা। আর সেই মুক্তিপত্রে রঘুনাথমল্লদেবের পরিবর্তে লিখে দেন রঘুনাথসিংহদেব নাম।

জয়ের গৌরব নিয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে ফিরে আসেন রাজা। সারা রাজ্য তাঁর জয়গানে ভরে যায়! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সেই অগাধ শক্তি ও

সততার খ্যাতি। আর সেই থেকে সিংহ উপাধি লাভ করে, সিংহদেব আখ্যায় ভূষিত হন বিষ্ণুপুর রাজবংশ। আর শুধু ঐ নয়, এর পরবর্তীকালেও তাঁর বিস্ময়কর শক্তিমত্তা এমন অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, যার বিজয় গৌরব বিষ্ণুপুরকে করভার থেকে মুক্ত করে তাকে পরিণত করে নবাব দরবারের স্বাধীন মিত্র রাজ্যে।

সুজার জন্মদিনের উৎসবে সুবে বাংলার সমস্ত রাজাকে তিনি একবার আমন্ত্রণ করেন রাজমহলে। সেখানের এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিশাল চন্দ্রাতপ ও বহু মূল্যবান সব উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয় এক সুদৃশ্য মণ্ডপ। রঘুনাথ সিংহদেবও আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যান। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যে সময়ে সেই মণ্ডপ মধ্যে সুজার দরবার আরম্ভ হয়, সেখানে যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হতে পারেন না। তাই আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গে সেখানের সমস্ত জায়গা তখন ভরে যায়। তাঁর বসবার উপযোগী কোন স্থানই তিনি দেখতে পান না। অথচ ফিরে আসা মহা অপরাধ। তাই বহু চিন্তার পর নিজের সম্মান রক্ষার জন্য নিরুপায় হয়ে এক বিস্ময়কর উপায় অবলম্বন করেন তিনি। অসীম শক্তিশালী রাজা তাঁর অপরিসীম শক্তি দিয়ে সেই মণ্ডপের বিশাল এক স্তম্ভকে তুলে ধরে সেখানে বসেন। আর সেই থামকে রাখেন নিজের জানুর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় সেখানের পরিবেশ। সেই স্তম্ভকে তোলার প্রচণ্ড আলোড়নে নড়ে ওঠে সমগ্র মণ্ডপ। সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন তার কারণ জানবার জন্য। এমন সময় সুজার কাছে গিয়ে পৌছায় সেই সংবাদ। সেখানে গিয়ে দেখেন তিনি সেই অলৌকিক দৃশ্য। নির্বিকার রঘুনাথমল্লদেবের জানুর ওপর সেই বিশাল স্তম্ভ। তাতে যেমন হন তিনি আশ্চর্য—তেমনি হন মুগ্ধ! 'বন্ধু' সম্বোধন করে নিয়ে গিয়ে পাশের আসনে তাঁকে বসান। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলেন, তোমার মতন অসীম শক্তিশালী বন্ধু লাভ করে নবাব দরবার ধন্য আজ থেকে সম্পূর্ণ কর ভার মুক্ত হবে বাংলার স্বাধীন মিত্র রাজা তুমি।

স্বাধীনচেতা বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের আশা পূর্ণ করেন ভগবান। স্বাধীনতার লীলাভূমি বিষ্ণুপুর প্রতিষ্ঠিত হয় তার নিজের মর্যাদায়। শুধু সর্ত থাকে, বিপদের দিনে প্রয়োজন হলে বিষ্ণুপুর তার দুর্ধর্ষ শক্তি দিয়ে নবাব দরবারকে সাহায্য করবে। আর যতদূর জানা যায়, বিষ্ণুপুরের নরপতিগণও তার ব্যতিক্রম করেন নি। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসনকাল পর্যন্ত তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে গেছেন তাঁরা পরিপূর্ণ ভাবে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই তৎকালীন নরপতি চৈতন্য সিংহদেবের রাজত্বকালে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসে যখন তার সর্বনাশের তিমির ঘন রাত্রি। কুখ্যাত মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে পলাশীর রক্তরাঙ্গা প্রান্তরে পরাজিত হয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন, তখন তাঁর সেই চরম বিপদের দিনে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান তিনি চৈতন্য সিংহ-দেবকে। বিষ্ণুপুরের শৌর্য তখন স্তিমিত প্রায়। তার ক্ষাত্রশক্তিলুপ্ত। তবুও তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহারাজ চৈতন্য সিংহদেব সিরাজদ্দৌলার সাহায্যের জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে যান মুর্শিদাবাদ অভিমুখে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের হীন চক্রান্তে সে অভিযান তাঁব বিফল হয়। নবাবের নামাঙ্কিত মিথ্যা এক আদেশ পত্র দেখিয়ে মাঝ পথ থেকে তারা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। শয়তানদের শয়তানীরই জয় হয়। অস্তমিত হয়ে যায় বাংলা-তথা ভারতের সৌভাগ্য রবি।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন চৈতন্য সিংহদেবের এই অভিযানের কথা বাংলার ইতিহাসে স্থান পায় নি কেন? তার প্রধান কারণ, প্রথমত বিষ্ণুপুরের কোন ঐতিহাসিক কাহিনীকেই বাংলা বা ভারতের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কোন সুধী এগিয়ে যান নি। দ্বিতীয়ত মহারাজ চৈতন্য সিংহদেবের ঐ অভিযানের কথা রাষ্ট্র হবার পূর্বেই ষড়যন্ত্রকারীর দল কর্তৃক তার প্রচারের পথ বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বেশ ভালভাবেই দেখতে পাওয়া যায় তার পরবর্তীকালে। সেই অভিযানের আক্রোশ ও আশঙ্কাবশতঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণুপুরের শক্তিকে নষ্ট করবার ব্যবস্থা করে। তার জন্য তারা বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয় বিষ্ণুপুরের নির্বাণ প্রায় সামরিক শক্তির শেষ সম্বল কামান বন্দুক প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্র। ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় তার বিখ্যাত ঘাটোয়াল বাহিনী। এবং তার অর্থবলকে নষ্ট করবার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করে সেই রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে তার বিশাল জমিদারীকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে সেই সমস্ত অংশ একের পর এক নীলামে বিক্রয় করিয়ে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারকে পরিণত করে তারা দীন ভিক্ষুকে। আর নবাব দরবারের সঙ্গে মিত্রতার চুক্তি ও চৈতন্য সিংহদেবের ঐ অভিযানের কথা যে মিথ্যে নয় তার আর এক প্রমাণ, উক্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিহারের শাসন কর্তা আলিবর্দী খাঁ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলার মসনদ দখল করবার জন্য অতর্কিতে নবাব সরফরাজখাঁকে আক্রমণ করেন এবং তার জন্য নবাব যখন হাতীর ওপর চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন আলিবর্দীর বিশাল বাহিনী দেখে তাঁর হস্তীচালক নবাবকে বলে, এই অসম যুদ্ধে অসংখ্য শত্রুর মধ্যে

প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। তার চেয়ে চলুন, আমরা বিষ্ণুপুরের দিকে দ্রুতবেগে হাতী ছুটিয়ে দিই। সেখানের রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত শত্রু দমনে সক্ষম হব। (বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, ৮৫৪ পৃষ্ঠা।) এর প্রধান কারণ ঐ চুক্তি। তাই বাংলায় আরও রাজা-মহারাজা থাকা সত্বেও হস্তী চালক বিষ্ণুপুরের নাম করেছিল।

এই প্রথম রঘুনাথসিংহদেবকে অনেকে বুড়ো রঘুনাথসিংহদেব বলে থাকেন। ইনি শুধু তাঁর বিস্ময়কর শক্তিমত্তার জন্যই প্রসিদ্ধ নন—জলাশয়, দেবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এঁর দান অপরিসীম। ইনি সায়র নামে পাঁচটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাটসায়র, লালসায়র, রঘুনাথসায়র, সীতাসায়র ও গৌরাঙ্গসায়র। আর ঐ রঘুনাথসায়রের পার্শ্ববর্তী পল্লীও তাঁর নামের স্মৃতি বিজড়িত রঘুনাথসায়র মহল্লা নামে প্রসিদ্ধ।

তারপর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের কয়েকটি দেব মন্দিরও এঁর কীর্তি। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ ও ৯৪৯ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় পাঁচচূড়া বিশিষ্ট সুদৃশ্য কারুকার্যপূর্ণ শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির। এর প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুদে শশাঙ্ক বেদাঙ্কযুক্তে নবরত্নরত্নম্।
শ্রীবীরহাম্বির নরেশ সুনুর্দদৌনৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহ॥

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬১ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য কারুকার্যপূর্ণ 'জোড়-বাংলা'। এর প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুদে সুধা শু রসাঙ্কেনে সৌধগৃহং শকাব্দে।
শ্রীবীরহাম্বির নরেশ সুনুর্দদৌনৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহ॥

এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬২ মল্লাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একচূড়াবিশিষ্ট কালাচাঁদ বিগ্রহের শ্রীমন্দির। এর প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেন্দ্বির শশাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ।
শ্রীবীরহাম্বির নরেশ শ্রীসুনুর্দদৌনৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥

বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত রঘুনাথ জীউয়ের অস্থলও তাঁরই কীর্তি। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনাথ জীউ, জানকী জীউ ও লক্ষণ জীউ বিগ্রহ। নিয়মিতভাবে তাঁদের সেবা পূজা ও অস্থলের আরও সব ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেন উপযুক্ত জমিদারী, সেই সমস্ত পরিচালনার জন্য রঘুনাথদাস মোহান্ত নামে সন্ন্যাসী জাতীয় উপযুক্ত এক পরিচালক নিয়োগ, রাজদরবার মহল্লায় অবস্থিত মূর্চার পাহাড়ের উত্তর দিকে তার নিম্নস্থিত পরিখার তীরে অবস্থিত পাথরের রথ, তার নিকটবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত রঘুনাথ জীউ বিগ্রহের মাসীর বাড়ী বা মাউসা

বাড়ী প্রভৃতি এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। আর শুধু ঐ রঘুনাথ জীউয়ের অস্থলই নয়, সারা মল্লভূমে বিষ্ণুপুরের নরপতিগণ ঐ ধরনের বহু অস্থল প্রতিষ্ঠা করে, তার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনমত জমিদারী দিয়ে চালনার জন্য মোহান্ত নিযুক্ত করে গেছেন।

ঐসব অস্থলে দেব বিগ্রহ ও নানা জাতীয় শালগ্রাম শিলা ছিল প্রচুর। মহাকালের আঘাত উপেক্ষা করে এখনও যে কয়েকটি অস্থল মল্লভূমের বুকে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাতে ঐসব জিনিস এখনও আংশিকভাবে বর্তমান আছে।

অস্থল অতিথিশালা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে বাইরের থেকে আসা সাধু সন্ন্যাসী ও অন্যান্য অতিথি-অভ্যাগতের দল আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের প্রয়োজনমত দু চারদিন বাস করে চলে যেতেন। ঐমত সাধু সন্ন্যাসী, এমনকি রাজকীয় বাহিনীর মতন হাতী, ঘোড়া, উট ও প্রচুর শিষ্য সেবক নিয়ে বিরাট মোহান্তের দল আসতেন। ঐ সব অস্থলে আতিথ্য গ্রহণ করতেন, চলে যেতেন। আর সারা মল্লভূমে ঐমত অস্থল প্রচুর পরিমাণে থাকার জন্য মল্লভূমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কোন সাধু-মোহান্তের দলকে আহার আশ্রয় কোন কিছুর জন্য চিন্তা করতে হত না। একের পর এক অস্থলে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা বেশ ভাল ভাবে আনন্দের সঙ্গে মল্লভূম পার হয়ে যেতেন। কিন্তু কালের প্রভাবে বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের শক্তি সমৃদ্ধিহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহান্তদের অনাচার ও অপরিণামদর্শিতার ফলে অধিকাংশ অস্থলই লয় হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যে কয়েকটি এখনও আছে সেখানেও আর অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান, সমাগম কিছুই নেই। সংসারের সব কিছু ভোগ স্পৃহা বর্জিত, সব মায়া মোহের অতীত মোহান্তের দল বর্তমানে মহাভোগী হয়ে পরিপূর্ণ গৃহীতে পরিণত হয়েছেন।

মহারাজা বুড়ো রঘুনাথ সিংহ বা প্রথম রঘুনাথসিংহদেব দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল সগৌরবে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬২ মল্লাব্দে তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়। বিষ্ণুপুর রাজবংশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইহলোকের সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে যান পরলোকের পথে। তারপর আরম্ভ হয় বীরসিংহদেবের রাজত্ব কাল।

মহারাজা বীরসিংহদেব। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬২ মল্লাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি বাদশাহ ঔরংজেবের সম-সাময়িক।

নামে বীরসিংহ হলেও, কাজে বীরত্বজনক কোন কীর্তি এঁর রাজত্বকালে

পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা তাঁর কুকীর্তি। বিষ্ণুপুরের নরপতিগণের মধ্যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা বলে ইনি কুখ্যাত হয়ে আছেন।

কথিত আছে—একবার পানে চুণ বেশী হয়ে তাঁর জিভ পুড়ে যাওয়ার জন্য সেই সামান্য অপরাধে তিনি প্রস্তুতকারিণীর শির নেবার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই জন্য সেই সময় থেকে বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর পানে চুণ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে আছে। আজও চলে আসছে সেই প্রথা।

কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলেও মহারাজ বীরসিংহ তাঁর পূর্ববর্তী নরপতিদের মতন দেববিগ্রহ, দেবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কাজে বিরত ছিলেন না। এমনকি বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গদ্বার বড় ও ছোট পাথর দরজা এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি বলে অনুমান করা হয়।

তারপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬৪ মল্লাব্দে নির্মিত রাধালাল জীউ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এর প্রতিষ্ঠা ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেহব্দি রসাঙ্ক যুক্তে নবরত্নমেতৎ।
মল্লাধিপ শ্রীরঘুনাথ সূনুর্দদৌনৃপঃ শ্রীযুত বীরসিংহ॥

বিষ্ণুপুরের প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সাবড়াকোন নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এই বিগ্রহের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বেশ মধুর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাবড়াকোন ভূখণ্ডের পুরন্দর নদীর তীরবর্তী অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে পশ্চিম ভারতের এক সন্ন্যাসী পাতার কুটির বেঁধে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন। সাধারণ বৈভব বলতে সঙ্গে ছিল তাঁর শুধু লোটা আর কম্বল। কিন্তু এমন অসাধারণ বৈভব তাঁর ছিল যার তুলনা হয় না। সে বৈভব তাঁর কৃষ্ণ বলরাম নামে দুটি ক্ষুদ্রাকার বিগ্রহ। লোকালয়ে গিয়ে ভিক্ষে করে নিয়ে এসে সেই বিগ্রহ দুটির তিনি সেবা-পূজা করতেন, আর নিজে আহারাদি করতেন। প্রবাদ আছে সেই মহাসাধক যখন ভিক্ষেয় যেতেন তখন সেই বিগ্রহ দুটি বালকের বেশ ধরে সেই কুটিরের কাছে খেলা করতেন। আবার অনেকে বলেন, ভক্তের ভগবান সেই বালক দুটি সেই সময় সন্ন্যাসীর জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে রাখতেন। হঠাৎ এক গোয়ালা সেখানে এসে হাজির হয় এবং সেই অপরূপকান্তি বালক দুটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তার কোন প্রত্যুত্তর তাঁরা দেন না। শুধু মাত্র একটি আম নিয়ে এসে সেই গোয়ালাকে দেন। বলেন, অসময়ের এই

আমটি এখানের রাজার কাছে পৌঁছে দেবে। বলবে তাঁর এক নতুন প্রজা তাঁকে এটি ভেট দিয়েছে।

ওখানের রাজা বলতে তখন বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীরসিংহদেব। তাই সে বলে, আজই আমাকে বিষ্ণুপুর যেতে হবে। সেই সময় এটি আমি সেখানের রাজবাড়ীতে পৌছে দেব। কিন্তু বাড়ীতে এসে সেই আমটি সেখানে রেখে সে-কথা সে ভুলে যায়। তখন গোয়ালা ও রাজা উভয়কেই স্বপ্নাদেশ হয়। তাই অতি প্রত্যুষেই সেই আমটি নিয়ে গোয়ালা বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হয়। আর রাজা তার প্রধান ভৃত্যকে পাঠান গোয়ালার কাছ থেকে সেই আমটি নিয়ে আসার জন্য। ফলে পথের মাঝে তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়। রাজভৃত্য গোয়ালাকে বীরসিংহদেবের কাছে নিয়ে যায়। সব কিছু শুনে স্থির থাকতে পারেন না তিনি। সেই গোয়ালার সঙ্গে রওনা হন সেই সন্ন্যাসীর কুটির অভিমুখে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও গোয়ালার-দেখা সেই বালকদের দেখা আর পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের লীলা বুঝতে পারেন সন্ন্যাসী, তাই বলেন, সাধারণ দৃষ্টিতে তঁাদের দেখা পাওয়া অসম্ভব মহারাজ, তাঁরা সাধনার ধন।

তখন সব কিছু বুঝতে পারেন রাজা। আর তাই বিগ্রহ দুটির ওপর অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। বিগ্রহ দুটি তাঁকে দান করবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন সন্ন্যাসীকে। কিন্তু তাতে স্বীকৃত হন না তিনি। শেষে বহু অনুনয় মিনতির পর একটি বিগ্রহ তাঁকে দান করে সেখান থেকে চলে যান সন্ন্যাসী। আর মহারাজ বীরসিংহদেব সেখানেই মন্দির নির্মাণ করিয়ে বিগ্রহটি তাতে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেটিব যে কি নাম, কৃষ্ণ কিম্বা বলরাম, কোন বিগ্রহটি যে সন্ন্যাসী তাঁকে দিয়ে গেছেন তার কিছুই বোঝা যায় না। তাই ঐ দুটি বিগ্রহের নাম কৃষ্ণ বলরাম এক সঙ্গে যুক্ত করে নাম রাখা হয় রামকৃষ্ণ। আর রামে তাঁর শ্রীরাধা নেই বলে, তাঁকে ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ বলা হয়। এঁর শ্রীমন্দিরের ওপর দিয়ে পাখী উড়ে যেতে পারে না। গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভূপতিত হয়। মন্দিরের মধ্যে মাছি যেতে পারে না। এঁর কৃপায় বহু দুরারোগ্য রোগী রোগমুক্ত হয়, ফলহীন বৃক্ষে ফল ধরে প্রভৃতি এঁর সম্বন্ধে বহু প্রবাদ আছে।

আর রামকৃষ্ণ জীউ, রাধালাল জীউ ব্যতীত বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বীরসিংহ গ্রাম, সেখানের বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি।

কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের কোন অস্তিত্বই এখন নেই। বর্তমানে সেখানে আছে শুধু জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙ্গা মন্দিরের বিরাট পাষাণ স্তূপ। আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেই মন্দির থেকে খসে পড়া পাথরের ওপর খোদাই করা মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি দেবমূর্তি। আর বিগ্রহ আছেন তারই অদূরে খড় মাটির গড়া এক কুটিরে।

অনেকে বলেন মহারাজা বীরসিংহদেব বিষ্ণুপুর থেকে ঐ বীরসিংহ গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি নিজে সেখানে গিয়ে বেশ ভালভাবে অনুসন্ধান করেও তার কোন প্রমাণ পাইনি।

মহারাজ বীরসিংহদেবের দুই রাণী। তার মধ্যে প্রথমাপত্নী চূড়ামণিদেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা নারী। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৭১ মল্লাব্দে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের মহাপাত্র পাড়া মহল্লার মুরলীমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির ও তার সংলগ্ন মা গোঁসাইয়ের পুষ্করিণী এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এই শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে লিখিত আছে—

শ্রীশ্রীদুর্জ্জনসিংহ ভূপ জননী মল্লাবনীবল্লভ।
শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরসিংহ মহিষী শ্রীল শ্রীচূড়ামণি॥
মল্লাব্দে শশীসপ্ত রন্ধ্র বিমিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োঃ।
প্রীতৈ সৌধ গৃহং নবেদয়দিদং পূর্ণেন্দু পোহপুজ্জথম॥

এবং উক্ত ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৭১ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুর মাধবগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিত মদনগোপাল জীউ বিগ্রহ ও তাঁর পুণ্যময় অবদান। এর প্রতিষ্ঠা ফলকে লিখিত আছে—

রাধাকৃষ্ণ পদপ্রান্তে সোম সপ্তাঙ্ক গেশকে।
রঘুনাথ মহীনাথ তনয়স্তোনতাশ্রয়াঃ॥
বীরসিংহ নরেশস্য ভীরবমান সংশয়।
মহিস্যাতি প্রমোদে নবরত্নং সমর্পিতং॥

এখানে একটা বিষয়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে। দুর্জনসিংহ তখনও রাজা হন নি। মুরলীমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালের প্রায় এগারো বৎসর পরে তিনি বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অথচ উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে শ্রীশ্রীদুর্জন সিংহ ভূপ জননী শব্দ ব্যবহৃত হল কি প্রকারে? আমার মনে হয়, তার একমাত্র কারণ ঐ মন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন যে কোন কারণবশতই হোক ওর প্রতিষ্ঠাফলক দেওয়া হয় নি। শোনা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠার পরই মহারাণী চূড়ামণিদেবী মারা যান। তাই সেই অসম্পূর্ণ কাজ আর শেষ

করা হয়নি। দুর্জনসিংহদেব রাজা হওয়ার পর তিনি তা সম্পূর্ণ করেন। আর তাই তিনি মায়ের পরিচিতিতে নিজের নাম ঐভাবে উল্লেখ করেছেন।

মদনগোপাল জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির তৈরী হয়েছিল মহারাজ বীরসিংহ-দেবের দ্বিতীয় সহোদর মাধসিংহের তত্ত্বাবধানে। তাই তাঁর নামে ঐ মহল্লার নাম করা হয়েছে মাধবগঞ্জ বলে।

নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্বামীর স্বভাবকে শান্ত করবার চেষ্টাই ছিল চূড়ামণিদেবীর জীবনের ব্রত। কিন্তু তাঁর সেই পুণ্য ইচ্ছাকে সফল করবার মতন সময় ও সুযোগ ভগবান তাঁকে দেন নি। অকালেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। দুর্জনসিংহ, শূরসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ নামে তিন পুত্রকে রেখে অকালেই চলে যেতে হয় তাঁকে পরলোকের পথে। তারপর মহারাজ বীরসিংহদেব বিবাহ করেন বরাহভূমের রাজকন্যা স্বর্ণময়ীদেবীকে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণা নারী। সপত্নীপুত্রেরা তাঁকে গর্ভধারিণী মায়ের মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও, তাদের সর্বনাশ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ। তাই অহরহ খোঁজ করতেন তিনি সুযোগের। এমন সময় তাঁর নিজের গর্ভেও একপুত্র হয়। তখন তাঁর অন্তরের সেই হিংসা ও নীচতা জেগে ওঠে আরও তীব্রভাবে। জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তিই বিষ্ণুপুর রাজবংশের চিরন্তন রীতি। তাই নিজের গর্ভজাত সন্তান বলদেবের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য গোপনে তিনি এক পৈশাচিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। এবং তাঁর সপত্নীপুত্রদের সরলতার সুযোগে সে আশা তাঁর পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়। গোপনে হত্যা করেন তিনি শূরসিংহ ও কৃষ্ণসিংহকে।

বিমাতার হীন চক্রান্তে সারল্যের প্রতিমূর্তি সন্তানেরা সন্তানের চলে যান অনন্তধামে তাঁদের মায়ের কাছে। অবশিষ্ট থাকেন শুধু দুর্জনসিংহদেব। তাঁকে সরাতে পারলেই সব আশা তাঁর পূর্ণ হয়। কিন্তু ভগবান সে সুযোগ তাঁকে দেন না। তাঁর ভাগ্যদেবী সে সাধে বাদ সাধেন। কনিষ্ঠ সহোদরদের সেই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ অবগত হয়ে রাজকর্মচারীদের সাহায্যে যুবরাজ দুর্জনসিংহদেব পলায়ন করেন। বিষ্ণুপুর থেকে বহুদূরবর্তী ইন্দাস নামক গ্রামে। তাঁর শিকার গ্রাসচ্যুত হওয়ার জন্য নিস্ফল আক্রোশে গর্জাতে থাকেন স্বর্ণময়ী। গোপনে অনুসন্ধান করতে থাকেন দুর্জনসিংহদেবের। কিন্তু সে আশাও তাঁর সফল হয় না। উপরন্তু ভগবানের অব্যর্থ বিধানে আরম্ভ হয় তাঁর পৈশাচিকতার প্রায়শ্চিত্ত। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন তাঁর জীবনে আসে সবচাইতে মর্মান্তিক

দুর্ঘটনা, যার জন্ম সব আশা তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সমাধি রচিত হয় তাঁর সব স্বপ্নের। তাঁর শিশুপুত্র বলদেব মারা যায়।

ফলে জীবন হয়ে ওঠে তাঁর দুঃসহ। সেই মর্মান্তিক আঘাত ভেঙ্গে চুরে তাঁকে যেন ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। হয়ে পড়েন তিনি সম্পূর্ণভাবে উন্মাদিনী। আর সেই অবস্থায় প্রলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন তাঁর জীবনের দুষ্কর্মের কাহিনী। তখন মহারাজ বীরসিংহদেবের চৈতন্য হয়। সেই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সবকিছু অবগত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। সংসারের সব কিছুর ওপর মন তাঁর তিক্ত হয়ে ওঠে। অন্তর হয়ে ওঠে আরও নিষ্ঠুর। সামান্য অপরাধেও কঠিন শাস্তি দেন। সামান্য কারণে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এমনি করে বহু দিক দিয়ে হয়ে ওঠেন তিনি মূর্তিমান বিভীষিকা। যেজন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা পর্যন্ত তা সহ্য করতে পারেন না। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর মাধবসিংহ ও ফতেসিংহ প্রকাশ্যে করেন তার প্রতিবাদ। তাঁরা বলেন, আপনার নির্মমতায় সমস্ত রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আপনার ঐ অমানুষিক আচরণ আপনি পরিত্যাগ করুন।

কিন্তু তাতে কিছু সুফল হয় না। যা হয়, তা তার বিপরীত। তিনি আরও নির্মম হয়ে ওঠেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি ফতে সিংহ ও মাধব সিংহকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং সেই অবস্থায় মাধব সিংহকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু ফতে সিংহকে তা করা সম্ভব হয় না। তিনি কোন-প্রকারে পলায়ন করে রায়পুর নামক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। এবং ধলভূমের রাজকুমারীকে বিবাহ করে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রায়পুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য।

আর এদিকে সব অনর্থের মূল স্বর্ণময়ী মারা যান। বীরসিংহদেব হয়ে পড়েন সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন শূন্য। সেই আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মন তাঁর শান্ত হয়ে আসে। বিবেক, মনুষ্যত্ব, সবকিছুই ফিরে পান তিনি। কিন্তু শরীর একবারে ভেঙ্গে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় আত্মীয়স্বজন শূন্য সংসার হয়ে ওঠে যেন তাঁর কারাগার। মন হাহাকার করতে থাকে। নিজের ভুলের জন্য এমন আক্ষেপ করতে থাকেন, যার জন্য সকলেরই মন তাঁর ওপর করুণায় ভরে ওঠে। দুর্জনসিংহদেবকে সব কিছু সংবাদ জানিয়ে তাঁকে আসার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেন। নামে দুর্জন হলেও কাজে তিনি খুবই সৎ। আর তার জন্য সব অনর্থ

দূর হয়ে যায়। পিতার রোগশয্যা পাশে ছুটে আসেন পুত্র। রাজা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পান। রোগ-পাণ্ডুর মুখে তাঁর ফুটে ওঠে আনন্দের জ্যোতি। সস্নেহে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। বিষ্ণুপুরের রাজমুকুট পরিয়ে দেন তাঁর মাথায়। সেই থেকে বিষ্ণুপুরের ভাগ্যদেবতার আসন অলঙ্কৃত করেন দুর্জনসিংহদেব।

প্রবাদ আছে—এক ব্রাহ্মণ বালকের হত্যার কারণ হয়ে, মহারাজ বীরসিংহদেব আত্মহত্যা করেন।

মহারাজ দুর্জনসিংহদেব। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দ ও ৯৮৮ মল্লাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনিও সম্রাট ঔরংজেবের সমসাময়িক। ইনি অত্যন্ত ন্যায়বান, সচ্চরিত্র, ধর্মপ্রাণ নরপতি ছিলেন। পিতা বীরসিংহদেব কর্তৃক প্রজাদের বাজেয়াপ্ত সমস্ত সম্পত্তি ইনি সকলকে ফিরিয়ে দেন। এঁর রাজত্বকাল একদিক দিয়ে বিষ্ণুপুর ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল। প্রবাদ আছে এক সময়ে বিষ্ণুপুরে টাকায় ৪ মণ করে চাল পাওয়া যেত। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ ও ১০০০ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মদনমোহনদেব শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এর প্রতিষ্ঠা ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধা ব্রজরাজ নন্দন পদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে।
মল্লাব্দে ফণীরাজশীর্ষ গণিতে মাসে সুচৌ নির্ম্মলে॥
সৌধং সুন্দর রত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধং সচেতোহলিনা।
শ্রীমদ্দুর্জ্জনসিংহ ভূমিপতিনাদত্ত বিমুগ্ধাত্মনা॥

মহারাজ দুর্জনসিংহদেব দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে রাজ্য শাসন করে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের রাজত্বকাল।

মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ইনি বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সম্রাট ঔরংজেব ও বাহাদুর শাহের সমসাময়িক। সম্রাট ঔরংজেব ও ইনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তি। ঔরংজেব তাঁর জীবনে স্বধর্মকে স্থান দিয়েছিলেন সবার ওপরে। তাঁর ধর্মের অনুশাসন মতন তাঁর রাজ্যমধ্যে গীত বাদ্যকে নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে।

আর মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব সেই নিষিদ্ধ সঙ্গীতকে তাঁর রাজ্য-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করাকেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জীবনের ধর্মরূপে। সেই জন্য দুর্ধর্ষ ঔরংজেবের কঠোর আদেশে সমস্ত ভারতবর্ষে সঙ্গীতজ্ঞেরা যখন সম্পূর্ণ

অবজ্ঞাত, অনাদৃত অবস্থায় কাল যাপন করছিলেন, সারা ভারতের মধ্যে কোন রাজা-মহারাজা বা রাজকল্প ব্যক্তি যখন দোর্দণ্ড প্রতাপ আলমগীরের আদেশের বিরুদ্ধাচারী হয়ে তাঁদের আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিতে সাহস করেন নি, তখন মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব তাঁর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বিপুল অর্থব্যয়ে দিল্লী থেকে বাহাদুর খাঁ নামে সেনী ঘরাণার এক ধ্রুপদীকে বিষ্ণুপুরে আনিয়েছিলেন। আর ঢোল সহরতে রাজ্যের চারদিকে ঘোষণা করিয়েছিলেন, সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারবেন। এমনকি দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ভরণপোষণের ব্যবস্থা পর্যন্ত করবেন। তাই বহু ছাত্র তখন বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছিল। আর রাজার নির্দেশে বাহাদুর খাঁ বহু ছাত্রকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তারমধ্যে বিষ্ণুপুর পাঠকপাড়া মহল্লার অধিবাসী গদাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল, চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী ও বিষ্ণুপুর বুড়াধর্মরাজতলার অধিবাসী নিতাই নাজীর, বৃন্দাবন নাজীর অন্যতম। বাহাদুর খাঁর ছাত্রদের মধ্যে এঁরাই সঙ্গীত বিদ্যায় উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। আর এদের মধ্যেও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। তাই বাহাদুর খাঁর পর তিনিই বিষ্ণুপুর রাজদরবারের সঙ্গীতাচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তারপর তার পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত গগনে কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, যদুভট্ট প্রভৃতি যেসব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের সাধনায় সঙ্গীতে বিষ্ণুপুর 'দ্বিতীয় দিল্লী' আখ্যায় ভূষিতা হয়েছে, তা এঁদেরই ছাত্র পরম্পরায় হয়ে এসেছে। তার মধ্যে সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও যাদুকর যদুভট্ট অন্যতম।

সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের দিক দিয়ে মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের অবদান যেমন অসামান্য, সামরিক দিক দিয়েও তাঁর কৃতিত্ব সেইমত অসাধারণ। এঁর অদ্ভুত শৌর্য বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্রশক্তিকে পুনর্জীবিত করে তোলে। আলো যেমন নিভবার পূর্বে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠে, ইনিও সেইমত বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্র-শক্তির শেষ দীপ শিখা, প্রচণ্ড তেজে জ্বলে ওঠেন। এঁর সময়ে বিষ্ণুপুরের সামরিক শক্তি উন্নতির চরমসীমায় উন্নীত হয়েছিল। এক ইঙ্গিতে ইনি লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন। এঁর সময়ে বাংলায় এক চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। চেৎবরদার রাজা শোভাসিংহ ও উড়িষ্যার রাজা দুর্দ্ধর্ষ পাঠান রহিম খাঁ তাদের মিলিত শক্তি দিয়ে এমন স্বেচ্ছাচার শুরু করে যার জন্য সারা পশ্চিম

বাংলা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সব চাইতে বেশী উৎপীড়িত হয় বর্ধমান। তারা বর্ধমান অবরোধ করে, সেখানের রাজা রাজকৃষ্ণকে হত্যা করে এবং অকথ্য অত্যাচার করে রাজ পরিবারের ওপর। আর তার ফলে বর্ধমান রাজকুমারী সত্যবতীর ছুরীর আঘাতে নিহত হন শোভাসিংহ।

কিন্তু সেই সমস্ত অত্যাচার ও বিপর্যয়ের মধ্যেও বর্ধমান রাজকুমার জগৎরাম নারীর ছদ্মবেশে পলায়ন করেন।

বাংলার রাজধানী ছিল তখন ঢাকা, নবাব ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। তাঁর দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করেন জগৎরাম। সব কিছু পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনি বাংলার দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর, সম্রাট আলমগীরের প্রতিভূ। এর প্রতিকার করে সেই অত্যাচারীদের হাত থেকে সন্ত্রস্ত বঙ্গবাসীদের রক্ষা করুন। কিন্তু নবাব ছিলেন ভীরু প্রকৃতির। যুদ্ধ-বিগ্রহকে এড়িয়ে চলাই ছিল তাঁর নীতি। তাই জগৎরামের সেই কথার কোন গুরুত্বই তিনি দেন না। শেষে বহু আবেদন নিবেদনের পর, নুরুল্লা নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষকে কিছু সৈন্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন। আর নুরুল্লাও সামান্য ভূঁইয়ার বিদ্রোহ মনে করে সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করেন। যার ফলে তাঁর সর্বনাশ হয়। সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য বিদ্রোহীদের মিলিত শক্তির কাছে ঝড়ের মুখে তৃণ খণ্ডের মতন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পরাজয়ের কালিমা নিয়ে প্রাণমাত্র সম্বল করে নুরুল্লা নবাব দরবারে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

তখন নবাবের চৈতন্য হয়, নিজের ভুল তিনি বুঝতে পারেন। সত্বর এক শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে পুত্র জবরদস্ত খাঁকে পাঠান তাদের বিরুদ্ধে। চেৎবরদা ও রহিমখাঁর মিলিত বাহিনীর সঙ্গে আরম্ভ হয় সংগ্রাম।

কিন্তু নামে জবরদস্ত হলেও, কাজে তিনিও বিপর্যস্ত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকেও ফিরে যেতে হয় নুরুল্লার মতন অবস্থায়। প্রমাদ গণেন ইব্রাহিম খাঁ। কালবিলম্ব না করে সেই সংবাদ পাঠান তিনি দিল্লীর দরবারে।

সম্রাট আলমগীর তখন স্থবির। তার উপর দুর্ধর্ষ মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন না। বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য পৌত্র আজীমউশসানকে দিয়ে পাঠান এক বাহিনী।

ইতিমধ্যে বাংলার বহু স্থান লুণ্ঠন করে, বহু রসদ, সৈন্য প্রভৃতি সংগ্রহ করে বিদ্রোহীদের শক্তি এত অধিক হয়ে ওঠে যার জন্য সেই বাদশাহী ফৌজকেও হটতে হয়। যার ফলে সকলের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে তারা বুঝি অজেয়।

আর তার ফলে স্পর্দ্ধা হয়ে ওঠে তাদের এমন আকাশচুম্বী যে, শুধু নবাব বাদশাই নয়, বাংলার অন্যতম শক্তি বিষ্ণুপুর ধ্বংস করে তারা সারা বাংলার অধিপতি হবার স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হয় না। মহারাজ রঘুনাথসিংহদেব ছিলেন যেমন শৌর্যশালী, রণনীতির দিক দিয়েও ছিলেন সেইরকম দক্ষ। তাই তাদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন তিনি নিপুণভাবে। আর তাই সেই দুরভিসন্ধির সংবাদ অবগত হয়ে সব দুরাশার পরিসমাপ্তি করে দেন।

তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাদের বাহিনী। চেৎবরদা পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। নায়ক রহিম খাঁ ও শোভাসিংহের কনিষ্ঠ হেমন্ত সিংহ পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রঘুনাথসিংহদেবের বীরত্বের খ্যাতি। নবাব ইব্রাহিম খাঁ তাঁকে ধন্যবাদ দেন। সম্রাট আলমগীরও তাঁর প্রশংসা করেন। আর বিদ্রোহীদের পতন হওয়ায় বাংলার অধিবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

মহারাজ রঘুনাথসিংহদেব চেৎবরদার বিপুল ধন রত্ন, দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ, বিশালাক্ষী দেবীর স্বর্ণপ্রতিমা, কামান, বন্দুক প্রভৃতি সেখানের যাবতীয় অস্ত্র, সব কিছু নিয়ে আসেন বিষ্ণুপুরে। সঙ্গে আসেন চেৎবরদার রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা।

আর রহিমখাঁ, হেমন্তসিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহী নায়কদের বন্দী করবার জন্য সেখানে রেখে আসেন তিনি তাঁর সেনাপতি, সামন্তসর্দার ও বিজয়ী বাহিনীকে।

কিন্তু দিন গত হয়ে চলে, কোন সংবাদ পর্যন্ত আসে না। তাই বিষ্ণুপুরে বসে চিন্তিত হয়ে ওঠেন রাজা এমনকি ভয়ও জাগে অনেকের মনে। এমনি দিনে ফিরে আসে তাঁর বাহিনী। সংবাদ আসে রহিমখাঁ নিহত, অধিকাংশ সৈন্য নিহত, কিন্তু হেমন্তসিংহ পুনরায় পলাতক।

কিন্তু তার জন্য বিচলিত হন না রাজা। অন্যান্য সংবাদ জানতে চান তিনি।

চেৎবরদা থেকে ফেরবার সময় নিয়ে আসে তারা রহিমখাঁর শিবির লুণ্ঠন করা ধন রত্ন; আর সঙ্গীত প্রিয় রাজাকে উপহার দেবার জন্য তার সঙ্গে নিয়ে আসে, রহিমখাঁর সঙ্গীত নিপুণা রূপসী বেগম সাহেবা লালবাঈকে।

অসন্তোষের কালো ছায়া জেগে ওঠে সমস্ত রাজদরবারে। সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় লালবাঈও হয়ে ওঠে আতঙ্কিতা। কিন্তু তার কিছুই হয় না। সকলের সব-ভাবনার অবসান হয়ে যায় রঘুনাথসিংহদেবের মহান ব্যবহারে।

তাই উচ্ছ্বসিত আবেগে সকলে তাঁর জয়গান করেন। আর লালবাঈ শুধু আশ্বস্তই হয় না, মুগ্ধা হয়ে যায় সে। মুক্তির পরিবর্তে আশ্রয়ের জন্য রঘুনাথ-সিংহদেবের কাছে সে প্রার্থনা জানায়। সরল প্রাণ উদারচেতা রাজা মঞ্জুর করেন তার সে আর্জি। বিষ্ণুপুর গড়ের বাইরে তার নিকটবর্তী স্থানে তার জন্য তৈরী হয় নূতন বাসভবন। নাম হয় তার নূতন মহল।

লোকচক্ষুর অগোচরে বিষ্ণুপুরের বুকে রোপিত হয় তার সর্বনাশের বিষবৃক্ষ।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে ধন রত্নাদির সঙ্গে চেৎবরদার রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভাও এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে। যুদ্ধ বিগ্রহের নিবৃত্তি হবার পর মহাসমারোহে রঘুনাথ-সিংহদেবের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। আনন্দের প্লাবন বইতে থাকে সারা বিষ্ণুপুরে।

নিয়তি দেবী হাসেন তাঁর ক্রূর হাসি। সঙ্গীত প্রিয় রাজা গান শোনার জন্য মাঝে মাঝে যান লালবাঈয়ের বাসভবন নূতন মহলে। সেই সুযোগে নিজের অপরূপ রূপ ও সঙ্গীতে মুগ্ধ করে তাঁকে গ্রাস করবার চেষ্টা করতে থাকে তাঁর গুণমুগ্ধা লালবাঈ।

দিন গত হতে থাকে। প্রকৃতির চিরন্তনী শক্তিরই জয় হয়। লাস্যময়ী লালবাঈয়ের মোহমদির রূপ ও তার প্রাণ মাতানো সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন রাজা। বিষ্ণুপুরের বুকে ঘনিয়ে আসে তার সর্বনাশের তিমির ঘন রাত্রি। নূতন মহলই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। তাই চিন্তিত হয়ে ওঠেন সকলেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকেন সেই মোহের আবর্ত থেকে তাদের প্রিয় রাজাকে মুক্ত করবার জন্য। কিন্তু বিষ্ণুপুরের দুর্ভাগ্য। সকলের সব চেষ্টা বিফল হয়। ছন্নমতি রাজা ক্রমশ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকেন। বাইরের জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক দিনে দিনে বিচ্ছিন্ন করেছেন, লালবাঈ হয়ে ওঠে তাঁর সব কিছু। গুণের আকর রঘুনাথসিংহদেব পরিণত হন এক দুশ্চরিত্রা নারীর যন্ত্রপুত্তলিকায়। তাঁকে নিয়ে খেয়ালের খেলা খেলতে থাকে সর্বনাশী লালবাঈ। তার প্ররোচনায় ছন্নমতি রাজা বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বিশাল এক দীঘি খনন করিয়ে তার নামে নাম দেন লাল বাঁধ।

ঐ লাল বাঁধ নাম নিয়েও অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, উক্ত বাঁধ খোঁড়ার পর ওর জল লাল হয়েছিল বলে ওকে লাল বাঁধ বলা হয়। কিন্তু এই জনশ্রুতি অতি ক্ষীণ। যুক্তির দিক দিয়েও ওর মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। পুকুর, বাঁধ, দীঘি—যাই হোক না কেন, প্রথম খোঁড়ার পর তাতে যে জল জমে তা স্বভাবতই লাল বা ঘোলাটে

হয়। তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যায়। লাল বাঁধের ক্ষেত্রেও তাই হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমে হয়েছিল ঘোলা জল। কিন্তু তারপর হয় তা এত পরিষ্কার, যার জন্য ভাল জলের নাম করলে বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা লাল বাঁধের কথাই বলেন। তাই লাল জলের জন্য নয় উক্ত নাম হয়েছে অন্য কারণ বশত। তার মধ্যে লালবাঈয়ের নামে নামকরণের তথ্য ও জনশ্রুতিই অধিক ও নির্ভরযোগ্য। আবার অনেকে বলেন লাল জীউ বিগ্রহের নামে লালবাঁধ নাম হয়েছে। কিন্তু সে জনশ্রুতি খুবই ক্ষীণ। প্রবাদ আছে—লাল বাঁধের দক্ষিণ-পূর্ব তীরবর্তী অরণ্যের মাঝে যে গড়, লালবাঈয়ের নামেই তার নাম দেওয়া হয় লালগড়। নূতন মহল তৈরীর পূর্বে সেখানেই তার বাসের ব্যবস্থা ছিল।

এমনি করে দিনের পর দিন স্বেচ্ছাচারে, অনাচারে সমস্ত বিষ্ণুপুর অসন্তোষে ভরে যায় এবং ক্রমে সেই ধূমায়িত রোষ পরিণত হয় বিদ্রোহে। তাঁর অনাচারে অবিচারের জন্য রঘুনাথসিংহদেবকে অস্বীকার করে, তিনি অপুত্রক থাকার জন্য, তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর গোপালসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার আয়োজন করে বিষ্ণুপুরবাসী প্রজা। কিন্তু কাজে পরিণত করা তাকে সম্ভব হয় না। পরম ভ্রাতৃভক্ত গোপালসিংহদেব তাতে সম্মত হন না।

তবুও সেই সূত্র নিয়ে শয়তানী এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যার জন্য আত্ম-গোপন করতে বাধ্য হন গোপালসিংহদেব। রাজ্যবাসী তাতে যেমন ক্ষুব্ধ হন, অন্বেষণও তাঁর চলতে থাকে সেইভাবে। কিন্তু তা সফল হয় না।

আর চিরদিন কখনও সমানে যায় না। আলোর পর আসে অন্ধকার, অন্ধকারের পর আসে আলো। এক্ষেত্রেও তাই হয়। সেই ঘনায়মান দুর্দিনের অন্ধকার ভেদ করে দেখা দেয় আশার আলো। এগিয়ে আসে শয়তানীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন।

লালবাঈয়ের গর্ভে এক পুত্র সন্তান হয়। আর সেই সন্তানকে উপলক্ষ্য করেই তাদের শিরে নেমে আসে বিধাতার রুদ্র অভিশাপ। রচিত হয় তাদের শেষ শয্যা। তাকে উপলক্ষ্য করে লালবাঈয়ের অন্তরে জেগে ওঠে এক ক্রুর ইচ্ছা। তাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে সে। রাজাকে অনুরোধ করে, হিন্দুদের সন্তান-সন্ততি হলে তার অন্নপ্রাশন ইত্যাদি যেমন হয়, তার গর্ভজাত সন্তানের জন্যও সেইরকম এক উৎসবের আয়োজন করতে। আর সেই উৎসব উপলক্ষ্যে তার মুসলমান বাবুর্চির পাক করা খাবার নগরের সমস্ত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চায় সে এক সঙ্গে।

রাজা তাতে সম্মতি দেন না। তিনি বলেন, এ কখনও হতে পারে না। এত বড় অন্যায় ভগবান কখনও সহ্য করবেন না। বলে, তার সেই ক্রুর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবার জন্য বার বার তাকে অনুরোধ করতে থাকেন।

কিন্তু সব চেষ্টা তাঁর বিফল হয়। ছন্নমতি নারী কিছুতেই তার সেই সর্বনাশা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে সম্মত হয় না। এবং রাজাকেও সম্মতি দিতে বাধ্য করে সে। উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়। মুসলমানী খাদ্য পাত্র সানকী আসতে থাকে হাজারে হাজারে। বিশাল জায়গা পরিষ্কার করা হয়। এখনও সেই জায়গা 'ভোজনটিলা' নামে অভিহিত। বর্তমানে সেখানে 'কুমারী টকি হাউস' প্রভৃতি হয়েছে।

তারপর দিন স্থির করে সেই সর্বনাশা আদেশ সমস্ত বিষ্ণুপুরে জানিয়ে দেওয়া হয়। আতঙ্কে অধীর হয়ে ওঠে বিষ্ণুপুরবাসী প্রজা। দলে দলে নগর ত্যাগ করে চলে যেতে থাকে তারা। কতকাংশ শরণাপন্ন হয় রাজ কর্মচারীদের। কিন্তু রাজার আদেশের বিরুদ্ধে কেমন করে তাঁরা অভয় দেবেন? তাঁদের অক্ষমতা তাঁরা জানিয়ে দেন। তাই নিরুপায় হয়ে তারাও নগর ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করে।

এমনি দিনে দেশের জাতির সেই ভয়াবহ দুর্দিনে তাঁর অজ্ঞাত বাস থেকে আত্মপ্রকাশ করেন গোপালসিংহদেব। কিন্তু রাজার আদেশের বিরুদ্ধে তিনিও কিছু করতে পারেন না। সেই সর্বনাশা সঙ্কটে তিনিও হয়ে পড়েন যেন দিশে-হারা। তখন রাজ্যের সেই সীমাহীন দুর্দিনে অসহায় প্রজার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন বিষ্ণুপুরের মহিয়সী মহারাণী চন্দ্রপ্রভা। তেজমাধুর্যময়ী নারী তাঁর সর্বস্ব পণ করেন সেই সর্বনাশ সঙ্কটের গতিরোধ করবার জন্য। রাজ-কর্মচারীদের আদেশ দেন, ছলে, বলে কৌশলে, যে কোন প্রকারে হোক প্রজার ধর্মরক্ষা করবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। শঙ্কিত প্রজা আশ্বস্ত হয়।

মহারাণীর জয়গানে ভরে যায় সারা রাজ্য।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আর এক সর্বনাশ হয়। লালবাঈয়ের কাছে গিয়ে পৌছায় সেই সংবাদ। দলিতা ফণীনির মতন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জাতে থাকে সে।

রঘুনাথসিংহদেবের অবস্থাও হয় সেইরকম। গর্জে ওঠেন তিনিও। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সকলকে তলব করেন তিনি নূতন মংলে। কিন্তু সব বিফল হয়। কেউ তাঁর সেই আদেশ পালন করে না। তাই তাদের

সেই ধৃষ্টতার শাস্তি দেবার জন্য যান তিনি রাজ দরবারে। কিন্তু সেখানেও কেউ তাঁর সম্মুখে আসে না। মহারাণীর আদেশ কার্যকরি করবার জন্য অন্তরালে অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। তাই মহারাণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য যান তিনি অন্তঃপুরে। মহারাণী ছিলেন তখন হাওয়া মহলের ওপরে। সেখানে গিয়ে তাঁকে বলেন, কোন সাহসে, কার প্ররোচনায় তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচারী হতে সাহসী হয়েছ? জানো, এর জন্য যে কোন শাস্তি তোমাকে আমি দিতে পারি! কিন্তু মহারাণী তাতে ভীতা হন না, ক্ষোভও প্রকাশ করেন না। সেই সর্বনাশা আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন তাঁকে। কিন্তু সব চেষ্টা তাঁর বিফল হয়। "চোরা কভু নাহি শোনে ধরম কাহিনী" সেই প্রবাদ বাক্যই সত্য হয়। রাজা অবিচলিত থাকেন তাঁর সঙ্কল্পে।

নিরুপায় মহারাণীকেও অগ্রসর হতে হয় তাই অতি নিষ্ঠুর বেদনাময় পথে। দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, তাঁর সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন তিনি। ইঙ্গিতে রাজকর্মচারীদের আদেশ দেন শেষ উপায় অবলম্বনের জন্য।

বেজে ওঠে ধর্মের বিজয় ভেরী। আততায়ীর হাতে আহত হয়ে পলায়ন করতে গিয়ে সেই হাওয়া মহলের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে নীচের হরিণ পিঞ্জরের ওপর পড়ে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় নিহত হন রাজা। হাওয়া মহল উঁচু স্তম্ভের আকার-বিশিষ্ট বায়ু সেবনের স্থান। বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুরের চার কোণে চারটি হাওয়া মহল আজও বর্তমান।

এদিকে রাজার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের সর্বত্র। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে আতঙ্কিত প্রজা। সকলের বুক থেকে পাষাণ ভার যেন নেমে যায়।

কিন্তু তারপরই আবার বিষ্ণুপুর ভরে ওঠে হাহাকারে। তার আকাশ বাতাসও হয়ে ওঠে যেন বেদনা-বিধুর।

সকলের সব অনুরোধ, অনুনয় উপেক্ষা করে, স্বামীর জলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করেন মহীয়সী মহারাণী চন্দ্রপ্রভা। "পতিঘাতিনী-সতী" নামে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি।

বিষ্ণুপুর হয়ে ওঠে উত্তাল। শোকে দুঃখে পাগলের মতন হয়ে ওঠে প্রজাগণ। সব অনর্থের মূল লালবাঈ। তাই তার বাসভবন ভেঙ্গে চুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তারা। নির্মম ভাবে ডুবিয়ে মারে লালবাঈকে তার বাসভবন নূতন মহল সংলগ্ন চৌবাচ্চা নামক জলাশয়ে।

আবার অনেকে বলেন, প্রজাদের হাতে লাঞ্ছিতা হবার আশঙ্কায় নিজেই উক্ত জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে লালবাঈ। সেই থেকে ঐ স্থানটি হয়েছিল মানুষের কাছে বিভীষিকাময় জনবর্জিত। তারপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ঐ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করে ওকে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। তখন ওখানে লালবাঈয়ের কঙ্কাল, বহু মুসলমানী খাদ্যপাত্র, এমনকি তার অলঙ্কার পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল।

অথচ খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরী মহাশয় তাঁর বহুল প্রচলিত 'লালবাঈ' উপন্যাসে লিখেছেন, উক্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল লালবাঁধে। কিন্তু তা যে কত বড় ভুল, কত অবাস্তব, তা যে কোন সুধী একটুখানি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন কারণ লালবাঁধের মতন হ্রদ-সদৃশ বিশাল বাঁধে খুব ভালভাবে পঙ্কোদ্ধার না করলে কঙ্কালের মতন ক্ষুদ্র জিনিস পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত সে পঙ্কোদ্ধার আংশিকভাবে হয়েছিল রমাপদ বাবুর লালবাঈ উপন্যাস লেখার পরবর্তীকালে। আজ থেকে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। আর একটি কথা, মানুষে কুমীরে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। মানুষকে খেয়ে কঙ্কালকে তারা অটুট রাখে না। নদীর সঙ্গে সংযোগ থাকার ফলে বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ বাঁধেই কুমীর ছিল। আর লালবাঁধে ছিল সব চাইতে বেশী। লালবাঁধের দক্ষিণ প্রান্তে জলের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দ্বীপের মতন আছে। সেখানে বনশিউলির গাছ জন্মায়। তাই সেটাকে 'শিউলি ডাঙ্গা' বলে। শীতের দিনে সেই শিউলি ডাঙ্গায় কুমীরকে রোদ নিতে আমি নিজেও দেখেছি। রমাপদবাবু অপুত্রক রঘুনাথসিংহদেবের কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল সিংহদেবকে করেছেন রঘুনাথসিংহদেবের পুত্র। রাজ অন্তঃপুরের প্রায় দুমাইল দূরবর্তী যমুনা বাঁধকে এনেছেন রাজপ্রাসাদের জানালার নীচের মতন নিকটবর্তী স্থানে, অতি ক্ষুদ্র বিড়াই নদীতে তিনি বজরা ভাসিয়েছেন। এবং জিতেন বসাক রচিত নাটক 'লালবাঈ', নবকুমার গরাই রচিত 'লালবাঁধ', ব্রজেন দে রচিত 'পতিঘাতিনী-সতী' ও ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বাঁদী লালবাঈ', সবই ঐ মতন ইতিহাসকে জবাই করা অমার্জনীয় উৎকট কল্পনায় ভরা। অথচ ইতিহাস মানব জাতির অতীত দিনের দর্পণ স্বরূপ। তার গুরুত্ব অসীম। আর সেই জন্যই জন-সাধারণের বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করতে আমি বাধ্য হলাম।

লালবাঈয়ের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনও নূতন মহল নামেই অভিহিত। বর্তমানে সেখানে মহাশ্মশান ও এক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত শ্মশান কালিকার

অধিষ্ঠান ভূমি। অনেকে তাঁর শ্রীমন্দিরে হত্যা দিয়ে তাঁর স্বপ্নাদ্য ঔষধে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হন। প্রতিদিন এবং সময় বিশেষে সেখানে বহু ভক্তি প্রাণ নর-নারীর সমাবেশ হয়। আর ঐ শ্মশান কালিকাদেবীর মন্দিরের নিকটেই তার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিখ্যাত সতীকুণ্ড অবস্থিত। সেখানেই স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে মহীয়সী মহারাণী চন্দ্রপ্রভা 'পতিঘাতিনী-সতী' আখ্যালাভ করেন। বর্তমানে তার চতুষ্পার্শ্ব আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। মূল সতীকুণ্ডকেও তার সঙ্গে যুক্ত করে সেখানেও হল চালনা করা হয়েছিল। তার মধ্যে মুসলমান কৃষকও ছিল। কিন্তু তাদের সেই ধৃষ্টতার জন্য কেউ তারা পার পায়নি। তাদের প্রত্যেককেই জীবন দিয়ে করতে হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত। তাই এখন আর কেউ সেখানে হল চালনা করতে সাহসী হয় না। বর্তমানে সেই সতীকুণ্ডকে-কুণ্ডেরই মতন করে রাখা হয়েছে।

বর্ষাকালে সেখানে জল জমে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী মতন দেখায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধ্বংসের যুগ

বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্র শক্তির অবসান ও প্রবল বৈষ্ণববাদের অভ্যুত্থান। রাজর্ষি গোপালসিংহদেব, চৈতন্যসিংহদেব, মাধবসিংহদেব, দ্বিতীয় গোপালসিংহদেব বর্গী হাঙ্গামা, সর্বনাশা গৃহবিবাদ, কলিকাতায় মদনমোহন বিগ্রহের গমন, সেখানে তাঁর অবস্থিতি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রূর চক্রান্ত, মহারাণী চূড়ামণিদেবী, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমা সারদামণিদেবী প্রভৃতি সাধক সাধিকা ও বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক এ. বি. রেনড প্রভৃতির বিষ্ণুপুর আগমনের কাহিনী।

অপুত্রক দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের মৃত্যুর পর ১৭১২ খৃষ্টাব্দ ও ১০১৮ মল্লাব্দে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর গোপালসিংহদেব বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ গোপালসিংহদেব। সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীতে যখন দ্রুত উত্থান-পতনের খেলা চলতে থাকে, ১৭১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে জাহান্দারশাহ, ফররুখ-সিয়র, রফিউদ্দরজাত, রফিউদ্দৌলা বা দ্বিতীয় শাজাহান প্রভৃতি ঔরংজেবের উত্তরপুরুষেরা, রূপকথার রাজা হওয়ার মতন একের পর এক দিল্লীর বাদশাহী তক্তে আরোহণ করে ইহজগৎ থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হন, এবং মহম্মদশাহের সিংহাসন আরোহণে সেই বিভীষিকাময় প্রহসনের অবসান হয়, মহারাজা গোপালসিংহদেব সেই সম সাময়িক।

মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব আততায়ীর হাতে আহত হয়ে হরিণ পিঞ্জরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করা সত্ত্বেও, তিনি তাঁকে রক্ষা করতে পারেন নি, সেই হিসেবে নিজেকে ভ্রাতৃহত্যার অংশভাগী বিবেচনা করে তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বিরাট দানসাগর সম্পন্ন করেন। এঁর দুই পুত্র, কৃষ্ণসিংহদেব ও গোবিন্দসিংহদেব। ইনি একজন পরমভক্তিমান পুরুষ ও সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। এমনকি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে তিনি একখানি ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন বলেও কথিত আছে। এবং কবিশ্চন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে পয়ার ছন্দে বিরাট মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। উক্ত কবিশ্চন্দ্র মহারাজ

দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রামায়ণ' ও মহারাজ বীরসিংহদেবের আদেশে 'শিবমঙ্গল' নামে এক কাব্য লিখেছিলেন বলেও কথিত আছে।

আর এই সমস্ত ব্যতীত বিষ্ণুপুরের নরপতিদের উৎসাহ ও সহযোগীতায় মল্লভূমে খ্যাত অখ্যাত এত ব্যক্তি এত গ্রন্থ রচনা করেছেন যার তুলনা বিরল। অতীতের মল্লভূম তার শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির মতন সাহিত্যেও ছিল খুবই উন্নত। বহুদিন ধরে বহু পুঁথি বাইরে চলে যাবার পরও বর্তমানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা'র সংগ্রহশালায় সাত হাজারেরও অধিক পুঁথি সংগৃহীত হয়ে আছে।

মহারাজ গোপালসিংহদেব মদনমোহনদেবের ওপর তাঁর ও রাজ্যের সবকিছু শুভাশুভভার অর্পণ করে, 'কর্তা তিনি, নিজে সামান্য কর্মীমাত্র,' এই মনোবৃত্তি নিয়ে জীবনের সবকিছু কাজ সম্পন্ন করতেন। গৃহী হয়েও, রাজা হয়েও, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীর মতন আমিত্ব বর্জিত ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাই তাঁকে রাজর্ষি বলা হয়।

তাঁর সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু বৈষ্ণব, বহু ভক্তিমান পুরুষ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তাঁদের ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠের সংকীর্তনের রোলে বিষ্ণুপুরের আকাশ-বাতাস তখন অহরহ মুখরিত হয়ে থাকত। গুপ্তবৃন্দাবনতীর্থ বিষ্ণুপুরের বুকে বৃন্দাবনের মাধুরিমা তখন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

মহারাজ গোপালসিংহদেবের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি নিজেই শুধু হরিনাম নিয়ে মত্ত হয়ে থাকতেন না, প্রজাদেরও ভগবৎ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তাদেরও নিয়মিত ভাবে হরিনাম করতে তিনি বাধ্য করেছিলেন। এখানের চলতি ভাষায় সকলে বলে তাকে 'গোপালের বেগার'। আর সেই আদেশ দিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। প্রজারা তাঁর সেই আদেশ পালন করে কিনা তা জানবার জন্য তিনি প্রয়োজন মতন গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন যার ফলে কেউ তার কিছু ব্যতিক্রম করলে পার পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না। কথিত আছে—বিষ্ণুপুরের বর্তমান বাহাদুরগঞ্জ মহল্লার অধিবাসী গোবিন্দ সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধ সন্ধ্যাতেই শয্যা গ্রহণ করায় তার স্ত্রী বলে, এরই মধ্যে শয্যা নিলে, রাজার বেগার দেবে না?

বৃদ্ধ বলে, হঁ্যা হরিনামের মালাটা দে, গোপলার বেগারটা শুধে দিই। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী তাকে মালা দেয়, সে হরিনাম করে।

এদিকে রাজার নিযুক্ত গুপ্তচর সেই কথা শুনে, হরিনাম যে সে করে, তা বুঝতে পারে। কিন্তু তবুও রাজাকে ঐভাবে কটূক্তি করার জন্য রাজদরবারে

করে তাকে অভিযুক্ত। বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয় কিন্তু মিথ্যে বলে না। সরল প্রাণে সব কিছু সে প্রকাশ করে। বলে, অভাবের জ্বালায় এই বুড়ো বয়সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করে মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। কিন্তু হরিনাম কোন দিন আমি বন্ধ করিনি। আপনার আদেশ আমি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পালন করে যাই।

রাজা বলেন, কিন্তু তার মধ্যে কতদিন তুমি আমাকে ঐভাবে কটূক্তি কর?

বৃদ্ধ পুনরায় তার অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করে। বলে, বিরক্তি বশত প্রায়ই বলে ফেলি মহারাজ।

হাসতে থাকেন রাজা। বলেন, বুঝেছি। তাই তোমার ঐ নষ্টামী আমার গুপ্তচরদের কাছে ধরা পড়েছে। বলে পুনরায় হাসতে থাকেন তিনি। কিন্তু রাজসভার অন্যান্য সকলের চোখে মুখে ঘনিয়ে আসে আশঙ্কার ছায়া! তাঁরা প্রতীক্ষা করতে থাকেন তার দণ্ডাদেশ শোনার জন্য। কিন্তু অবস্থা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেকে কটূক্তি করার জন্য শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, সরল মনে সত্য প্রকাশ আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে হরিনাম করার জন্য মহিমাময় রাজা করেন তাঁকে পুরস্কৃত। রাজসরকার থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাকে বলেন, শোনো বৃদ্ধ, অভাবের জন্য এই বুড়ো বয়সে তোমাকে আর মজুরী করতে হবে না। তোমার জীবনের অবশিষ্টকাল তুমি শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করেই অতিবাহিত কর।

তিনি প্রজাদের তাঁর নিজের সন্তানের মতন মনে করতেন। তাই তাদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর খুবই প্রখর। আর তাই নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতন তাদের পরকালকেও উজ্জ্বল করবার জন্য তাদের মধ্যে হরিনাম করাকে করেছিলেন তিনি বাধ্যতামূলক। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, শ্রদ্ধায়-অবজ্ঞায়, যে-কোন প্রকারেই হোক, অমৃত উদরস্থ হলেই যেমন তার অমরত্ব লাভ হয়, সেইমত যেইভাবেই হোক মহামৃত শ্রীহরির নাম-কীর্তন করলেই মুক্তি তার অবশ্যম্ভাবী। আর সেই বিশ্বাস তাঁর একদিক দিয়ে সার্থকও হয়েছিল। সেই ভক্তি-বিশ্বাস প্রজাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার ফলে, পরকালে যাইহোক, ইহকাল হয়ে উঠেছিল তাদের অপরূপ। নিয়মিত ভাবে মহিমাময়ের নাম-কীর্তনের মহিমার ফলে, অন্তর হয়ে উঠেছিল তাদের মহিমান্বিত। চরিত্র গড়ে উঠেছিল তাদের অমরার অধিবাসীদের মতন। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বিদেশী পর্যটকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং সারা রাজ্য ভরে প্রজাদের নিজস্ব দেবালয়, ধর্মশালা, জলাশয় প্রভৃতি সৎ প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে।

তারপর প্রজাদের ইহকালকেও স্বাস্থ্যে সম্পদে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টারও তাঁর অন্ত ছিল না। আর সে চেষ্টা ছিল কাজের ভেতর দিয়ে সত্যকার কল্যাণের চেষ্টা। বক্তৃতার ভাঁওতাবাজি নয়, রাজ্যে হরেক রকমের ভেজালে ভরা খাবার চলবে, দুর্নীতি-অনাচারে দেশ জাহান্নমে যাবে, আর সরকার বাহাদুর বড় বড় বক্তৃতা, আর কতকগুলো দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করবেন এ নীতি তাঁদের ছিল না। এ ভুল তাঁরা করেন নি। রোগ যাতে না হয়, রাজ্যবাসীর চরিত্র গড়ে উঠে প্রজাদের যাতে সত্যকার কল্যাণ সাধিত হয়, সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি ছিল তাঁদের খুবই প্রখর। মহারাজ গোপালসিংহদেব সেইজন্য তাঁর রাজ্যমধ্যে সেইমত শিক্ষা-দীক্ষা, সেইমত আহার-বিহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। খাদ্যের দিক দিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পরম সহায় গোদুগ্ধ। তাই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে তা সরবরাহের জন্য গো পালনকেও করেছিলেন তিনি বাধ্যতামূলক। তাঁর রাজ্যে গো সেবার স্থান ছিল দেব সেবারও উর্ধে। কোন আকস্মিক কারণবশতও কোন গোরু সেখানে মারা গেলে, সেখানে অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেও তিনি শাস্ত্রের বিধানমত গোবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

কেউ কোন খাবার জিনিসে ভেজাল দিলে, অথবা অন্য কোন রকমের প্রতারণা করে জনসাধারণকে কুখাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করলে, তাকে নরঘাতকের দণ্ডে দণ্ডিত করে, সেই সর্বনাশা পাপকে তাঁর রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে তিনি নির্মূল করে দিতেন। আর শুধু শাসন নয়, শাস্তির সঙ্গে সৎ শিক্ষা, সৎকর্মের জন্য পুরস্কার প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করে বিষ্ণুপুরকে পরিণত করেছিলেন তিনি এক আদর্শ জনপদে।

একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন যেমন মহা ভক্তিমান কুসুমের চেয়েও কোমল, অন্য দিকে কর্তব্যবোধে তিনি ছিলেন বজ্রের চেয়েও কঠোর। তাই তাঁর সুশাসনে ন্যায়, নীতি, স্বাস্থ্য, সম্পদ সকল দিক দিয়ে বিষ্ণুপুর পরিণত হয়েছিল ঐমত আদর্শ জনপদে। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত ভূপর্যটক এ, বি, রেনল্ড প্রভৃতি বিষ্ণুপুর পরিদর্শন করতে এসে রেনল্ড সাহেব তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, "বিষ্ণুপুর রাজ্যের ১৬০ মাইল বিস্তৃতি। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই রাজ্য রাজপুত বংশ দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। এখানে যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র শাসন প্রথা প্রবর্তিত আছে, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর শাসন প্রণালী। আমাদের মধ্যে প্রাচীন রাজ্য শাসন প্রণালী নাই। অনুমানের জন্যে কেবলমাত্র পিতলে, প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন রাজ্য শাসন প্রণালী দৃষ্ট হয়।

সে সময় কিরূপ আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, তাহা উহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতবাসী কি-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত, কোন সুধী বিষ্ণুপুরে আসিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন রাজ্যের অধিবাসীগণ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাহাদিগের ব্যবহার অতি নম্র. রাজ্যটি চারিদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত। নদীর স্রোত দ্বার খুলিয়া দিলেই দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। শত্রু এই রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া বহুবার জলমগ্ন হইয়াছে। এজন্য এ রাজ্যের স্বাধীনতা হরণে কেহ অগ্রসর হয় না। বিষ্ণুপুর রাজ্যে স্বাধীনতা ও সম্পত্তি অতি পবিত্র। চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি এ রাজ্যে অজ্ঞাত। কোন বিদেশী এ রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিলেই রাজ বিধানে তিনি নিরাপদ হন, বিনা ব্যয়ে তিনি পথ প্রদর্শকের সাহায্য পান। এই পথ প্রদর্শক তাঁহার সহিত স্থান হইতে স্থানান্তরে সহগামী হয়, সে পথিকের সম্পত্তি ও জীবনের জন্য দায়ী থাকে। কেহ কোন মূল্যবান সামগ্রী কুড়াইয়া পাইলেও নিকটবর্তী প্রহরীর হাতে তা জমা দেয় এবং রাজসরকার হইতে ঢোল সহরতে তা প্রচার করিয়া তার প্রকৃত অধিকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়.." ইত্যাদি। এবং তিনি আরও বলেছেন, 'যে সমস্ত সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রজাপীড়ক অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কত তফাত। এই রাজ্যের ভিত্তি সুশৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক ধর্মনীতি যাহা চিরকাল অক্ষয়' আর এই কথা এক দিক দিয়ে খুবই সত্য। সংসারের সবই নশ্বর। তাই কালের বিবর্তনে রাজ্য নষ্ট হলেও বিষ্ণুপুরের আদর্শ অমর। যুগ যুগ ধরে তা মানবজাতিকে তাঁর পথ প্রদর্শনে সাহায্য করবে।

হলওয়েল সাহেবও প্রায় ঐমত কথাই বলে গেছেন। সেইজন্য বহুদিক দিয়ে বোঝা যায়, অতীতের বিষ্ণুপুর ছিল সত্যকার অমরাবতী।

কিন্তু মানুষের দেবত্ব যেমন আছে, সেই মতন আছে তার শয়তানী আর নীচতাও। তাই মানবতার লীলাভূমি হলেও, সেইমতন এক শয়তানের শয়তানীতে লয় হয়ে যায় এখানের সব কিছুর।

গৃহশত্রু কুখ্যাত দামোদরসিংহের নীচতা, নিষ্ঠুর মারাঠা শক্তির অত্যাচার ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রুর চক্রান্তে এখানের সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয়। তখন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। একদিকে ব্রিটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির উপদ্রব, অন্যদিকে নিষ্ঠুর মারাঠা শক্তির অত্যাচার। দুদিক থেকে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ ও রাজশক্তি তখন জর্জরিত।

বিষ্ণুপুরের রাজশক্তিও তখন দুর্বল। তার ক্ষাত্রশক্তি স্তিমিত প্রায়।

ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের পর ভারতের বাইরে থেকে বহু মুসলমান তখন ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় এদেশে আসত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হাজী মহম্মদ ও আলিবর্দী খাঁ নামে দুজন মুসলমান বাংলাদেশে এসে নবাব সরকারের অধীনে চাকরী নেন। আর নিজের কর্ম-দক্ষতায় পদোন্নতি করে, আলিবর্দী খাঁ বিহারের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং পরে তিনি বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে, বাংলার নবাব হন। আর দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহকে প্রচুর টাকা উপঢৌকন দিয়ে একসঙ্গে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু বেশী-দিন তাঁকে শান্তিতে রাজ্য পরিচালনা করতে হয় না। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নবাবী পদ লাভ করে বৎসরাধিক কাল গত হবার পর বাংলার বুকে শুরু হয় মারাঠা শক্তির নির্মম অত্যাচার! বাংলার অধিবাসীদের কাছে তারা বর্গী নামে পরিচিত। শীতের শেষে তারা আসত। আর বর্ষা পড়বার আগেই চলে যেত। এমনি করে দীর্ঘ এগারো বৎসর ধরে বাংলার বুকে চলেছিল তাদের ধ্বংসলীলা। তারপর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ ও উড়িষ্যার একাংশ তাদের দিয়ে, নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলার বুক থেকে বর্গী উপদ্রবের নিবৃত্তি করেন।

গঙ্গারাম চৌধুরী তাঁর মারাঠা পুরাণে লিখেছেন, নবাবী ফৌজের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করবার মতন শক্তি মারাঠাদের ছিল না। তারা বর্শা, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অতর্কিতে দস্যুদলের মতন গ্রামের বুকে এসে হানা দিত। শিশু, নারী নির্বিচারে হত্যা করত। এমন কি মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী যে নারীজাতিকে মায়ের মতন শ্রদ্ধা করতেন, সেই মায়ের জাতের ধর্মনাশ করতেও তারা দ্বিধা করত না। তাই বাংলার অধিবাসীদের কাছে তারা মূর্তিমান বিভীষিকা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যার ফলে গ্রামে বর্গী আসার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করত। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাঁদের বাধা দেবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে কৃতকার্য হতে পারেন নাই। ধূর্ত বর্গীর দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে বহু জায়গায় হানা দিত। আর নবাবী ফৌজ আসার পূর্বেই লুটতরাজ করে চলে যেত। এমনি করে তারা সামন্তভূম, শিখরভূম, বরাহভূম, তুঙ্গভূম, মালভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি শ্মশান করে তুলেছিল। তাদের সেই নিষ্ঠুরতার প্রতিকার করবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে

বালাজী বাজীরাও একবার বর্গী দলপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে দমন করবার জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন। কিন্তু তা সাময়িকভাবে। স্থায়ী ব্যবস্থা তাতে কিছুই হয়নি। আর সেইজন্য ভাস্কর পণ্ডিতের দুরাশা হয়ে উঠেছিল আকাশস্পর্শী। নবাব আলিবর্দীর অনুপস্থিতির সুযোগে, মুর্শিদাবাদে গিয়ে একবার তিনি হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কৃতকার্য হওয়া দূরে থাক, শাস্তি হয়েছিল তাঁর চরম। নবাবী ফৌজ কর্তৃক তাঁকে অবরুদ্ধ হতে হয়েছিল। বন্য ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছিল নিজের নির্বুদ্ধিতায়। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত। নিজের শক্তিতে সেখান থেকে মুক্তিলাভের উপায় নেই দেখে, নবাবের এক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে বারোজন সর্দারসহ কোনপ্রকারে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

মারাঠারা যখন এদেশে আসত তখন এখানের নিম্নবর্ণের বহু দস্যু তাদের সঙ্গে যোগ দিত। এমনকি ঐ জাতীয় বহু মুসলমান পর্যন্ত লুঠের আশায় তাদের দলে আসত। সেইজন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুক্তিলাভ করে পলায়নপর অবস্থাতেও সেইরূপ দস্যু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে থাকা বর্গী সৈন্যতে দল তাঁর বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

নবাব আলিবর্দী তখন তাঁর মেদিনীপুর শিবিরে ছিলেন মুর্শিদাবাদে বর্গীদের হানা দেওয়ার সংবাদ পেয়ে মুর্শিদাবাদ যাত্রার পথে বর্ধমান হয়ে তিনি কাটোয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন।

ভাস্কর পণ্ডিত তাই আর কোন দিকে না গিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল অতিক্রম করে মল্লভূমে প্রবেশ করেন এবং তার রাজধানী বিষ্ণুপুর লুট করবার জন্য বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে বিষ্ণুপুর গড়ের বাইরে ছাউনি ফেলেন।

এদিকে বর্গী সৈন্যের এক বৃহৎ দল তখন বিষ্ণুপুরের প্রায় ৩২ মাইল পূর্বে অবস্থিত গড়মান্দারণ লুট করে বর্তমান হাওড়া রোড ধরে কোতুলপুর, কুম্ভস্থল, জয়পুর প্রভৃতি গ্রাম ছারখার করে বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মাঝখানে কুম্ভস্থল, জয়পুর প্রভৃতি গড়ের অধিনায়কেরা বাধা দিলে নির্মমভাবে তাঁদের হত্যা করে দুর্বার গতিতে এসে তাদের নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর আরও শক্তি বৃদ্ধি করে। তাতে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হন কুম্ভস্থল আর জয়পুরের অধিনায়কেরা। তাদের নির্মমতায় তাঁরা একেবারে নির্মূল হয়ে যান। বিষ্ণুপুর রাজদরবারে এসে সেই সংবাদ পৌছায়। কিন্তু মদনমোহনদেবের ওপর আত্মনিবেদিত রাজা তার প্রতিকারের কোন উপায়ই করেন না। তিনি তাঁর ভক্তি বিশ্বাস নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকেন। যুবরাজ

কৃষ্ণসিংহদেব তখন অসুস্থ তবুও কুমার গোবিন্দসিংহদেবকে নিয়ে পিতার অজ্ঞাতসারে সামরিক শক্তিকে যতদূর সম্ভব তিনি সক্রিয় করে তোলেন। এবং বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে বর্গীদের ছাউনী ফেলার সংবাদ অবগত হয়ে পিতার অগোচরে বিষ্ণুপুরী ফৌজ নিয়ে লালগড় দুর্গে তৈরী হয়ে সেখান থেকে মারাঠাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। ভাস্কর পণ্ডিতও ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা। যেখানে তিনি ছাউনী ফেলেছিলেন, তার পিছনদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সেই দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কা, আর লালগড় দুর্গে বিষ্ণুপুর ফৌজের প্রস্তুতি সব কিছু লক্ষ্য করে সেখান থেকে কাজ হাসিল হবার সম্ভাবনা নেই দেখে তিন দিনের দিন তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে বিষ্ণুপুর গড়ের বাইরে তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত বর্তমান কাছারী ময়দান ও বীরদরজার কাছে সরে আসেন। এবং সেখান থেকে তার পিছন দিকে যাদবনগর গড়ে বিষ্ণুপুরী ফৌজের অবস্থিতির সংবাদ অবগত হয়ে সেই দিক থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় চতুর্থ দিনে তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে বিষ্ণুপুরের উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের পরপারে ধানগড়ার মাঠে গিয়ে তিনি ছাউনী ফেলেন। দিনের পর দিন এক দিক থেকে আর একদিকে গিয়ে বিষ্ণুপুরকে লক্ষ্য করে শিকারী বাঘের মতন সেই পরিক্রমায়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বহু গ্রামবাসী গ্রাম পরিত্যাগ করে বিষ্ণুপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু তাতেও মহারাজ গোপালসিংহদেবের মনের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি অবিচলিত থাকেন তাঁর নিষ্ঠায়। সকলকে আদেশ দেন ভগবানের ওপর আত্মনির্ভর করবার জন্য। বলেন, বিপদবারণ তিনি, তাঁর ওপর সবকিছু সমর্পণ করলে সব কিছু অশুভ নাশ তিনিই করবেন।

কিন্তু মহারাণী ছিলেন বীরাঙ্গনা। ভগবানের ওপর অচলা ভক্তি-বিশ্বাস থাকলেও তাঁর ওপর সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর কর্মময় রূপের উপাসক। কাজের ভেতর দিয়ে তাঁর কৃপা লাভ করার পক্ষপতী। তাই স্বামীর অগোচরে সব কিছু করবার ব্যবস্থা করেন তিনি।

ধানগড়ার মাঠে বর্গীদের ছাউনী ফেলার সংবাদ অবগত হয়ে ধানগড়ার দক্ষিণে মুঝবাটির ঘাটিতে যাবার জন্য কুমার গোবিন্দসিংহদেবকে আদেশ দেন মহারাণী। তিনি মায়ের আদেশমতন সৈন্য নিয়ে সেখানে গিয়ে সেখানের পরিখা-পাহাড়ের ওপর থেকে মারাঠাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। আর খুঁজতে থাকেন তাঁদের আক্রমণ করবার সুযোগ। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন

অত্যন্ত চতুর। যতদূর সম্ভব নিজেদের নিরাপদ জায়গায় রেখে গুপ্তচর দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি। তাতে অবগত হন, তার নিকটবর্তী মুণ্ডমালা ঘাটের পরিখা-পাহাড়ের ওপর বহু কামান সাজানো আছে, কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর তৎপরতা নেই। রাজা গোপালসিংহদেব হরিনাম নিয়ে মত্ত। এদিকের কোন সংবাদই রাখেন না। তাই তিনি স্থির করেন, রাতের অন্ধকারে দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে পরিখা কেটে তার মধ্যে আত্মগোপন করে এগিয়ে গিয়ে সেই কামানগুলো দখল করে নেবেন। তাহলে বিষ্ণুপুর প্রবেশে কেউ আর তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আর কাজ আরম্ভও করেন তিনি সেইভাবে। কিন্তু তা সফল হয় না। সেইভাবে পরিখা কেটে এগিয়ে যাবার সময় মুণ্ডমালা ঘাটের ওপর অবস্থিত এক টহলদারী গোলন্দাজ সেনার সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়তে থাকে তারা।

কিন্তু ফল তাতে কিছুই হয় না। পরিখার ভেতর আত্মগোপন করে থাকা বর্গীবাহিনীর মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে যায় সেই গোলা। তাই তৎপর তারা সংবাদ দেয় গোপালসিংহদেবকে। বলে, আর রক্ষা নেই মহারাজ। বর্গীর দল পরিখা কেটে তার মধ্যে মাথা লুকিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের কামানের গোলা কিছুই করতে পারছে না।

কিন্তু তাতেও বিচলিত হন না রাজা। অবিচলিত থাকেন তাঁর নিষ্ঠায়। বলেন, এতে আমাদের করবার কিছু নেই। মদনমোহনকে ডাক। তাঁর ওপর সমর্পিত রাজ্য তিনিই রক্ষা করবেন। সমস্ত বিষ্ণুপুরেও তিনি ঐ আদেশ জানিয়ে দেন। কেউ কোন প্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে, সকলে একাগ্রচিত্তে মদনমোহনের নাম গান করুক। আর তিনি নিজেও সংকীর্তনের দল নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজপথে বের হয়ে পড়েন। রাজার নিজের সংকীর্তন করতে বের হওয়া, আর বর্গী আক্রমণের আতঙ্ক, সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীকে জাগিয়ে দেয়। হাজার হাজার ব্যক্তি খোল করতাল নিয়ে রাজার সঙ্গে রাজপথে বের হয়। অবশিষ্ট সকলেও বিষ্ণুপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আকুল হয়ে ডাকতে থাকেন মদনমোহনকে।

কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণ সিংহ প্রকাশ্যেই বিরুদ্ধাচরণ করেন পিতার। তিনি মায়ের আদেশমতন কিছু সৈন্য গড় রক্ষার জন্য রেখে, অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে চলে যান মুণ্ডমালা ঘাটে। সেখান থেকে মারাঠাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন, আর খুঁজতে থাকেন তাঁদের আক্রমণ করার সুযোগ।

দুদিক থেকে চলতে থাকে বর্গীদের ধ্বংসের প্রচেষ্টা। একদিকে রাজার ভক্তিবিশ্বাসমতন ঐশী শক্তির কাছে আকুল প্রার্থনা, অন্যদিকে সক্রিয় পন্থায় সশস্ত্র আয়োজন। দুই দিকেরই তৎপরতা ও নিষ্ঠা অসীম।

ওদিকে বর্গীদের লক্ষ্য করে পরিখা-পাহাড়ের ওপর সাজানো হয় বিধ্বংসী সব কামান। প্রস্তুত হয়ে থাকে গোলন্দাজ ও অন্যান্য বাহিনী।

এদিকে মহারাজ গোপালসিংহদেব তাঁর ভক্তিবিশ্বাসমত অসংখ্য খোল-করতাল ও ভক্তিপ্রাণ নর-নারীদের নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজপথে ফিরতে থাকেন সংকীর্তন করে।

গৃহবাসীদের কণ্ঠও মিলিত হয় তার সঙ্গে। সেখান থেকেও উচ্চকণ্ঠেই ওঠে মদনমোহনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বাণী। অসংখ্য খোল-করতাল ও অগণিত মানুষের মিলিত কণ্ঠের শব্দে বিষ্ণুপুর ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গার আকাশ-বাতাস যেন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

মারাঠাদের মধ্যেও সেই গুরু গম্ভীর ধ্বনি প্রবেশ করে তাদের মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার করে। মনে তাদের সন্দেহ জাগিয়ে দেয়, এ দেবতা রক্ষিত গড় সত্যই বুঝি সবার অজেয়। প্রবাদ আছে—

সহরময় ওঠে শুধু হরিনামের ধ্বনি।
এইবার রাম মদনমোহন গুণমণি॥

সমস্ত রাত্রি ভরে সেইভাবে মদনমোহনের উদ্দেশে চলতে থাকে কাতর প্রার্থনা। কিংবদন্তীতে প্রকাশ— অসংখ্য ভক্তের সেই আকুল আহ্বানে জাগেন ভক্তাধীন মদনমোহন। শেষরাত্রে বিষ্ণুপুরের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে গর্জে ওঠে ভয়াল কামান দলমর্দন। তার প্রচণ্ড গর্জনে আলোড়িত হয়ে ওঠে দিগ্বিদিক। বিষ্ণুপুর ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে জেগে ওঠে যেন খণ্ডপ্রলয়। বহু ঘরবাড়ী হয় ভূমিসাৎ। গরু, মানুষ, ছাগল প্রভৃতি বহু গর্ভিণীর হয় গর্ভপাত। আতঙ্কে অধীর হয়ে আরও আকুল স্বরে ডাকতে থাকেন সকলে মদনমোহনকে।

ওদিকে বর্গীদেরও প্রচুর হতাহত হয়। সর্বোপরি দলমর্দন কামানের প্রচণ্ড বিধ্বংসী শক্তি তাদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করে, যার জন্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে কতকাংশ তাদের চলে যায় উত্তরদিকে। বাকী অংশসহ ভাস্কর পণ্ডিত পলায়ন করেন বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হেঁড়ে পর্বতের জঙ্গলের পথে।

এদিকে সংকীর্তনে বিভোর রাজা ও সংকীর্তনকারী দল সেই ভীষণ শব্দে

চমকে ওঠেন। সংকীর্তন তাঁদের বন্ধ হয়ে যায়, গোপালসিংহদেব তলব করেন তাঁর গোলন্দাজ সেনাদের। বলেন, আমার আদেশ অমান্য করে, কে দলমর্দন কামানে অগ্নিসংযোগ করলে?

কিন্তু কেউ তার প্রত্যুত্তর দেয় না। পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে তারা। এমন সময় এক গোলন্দাজ সেখানে এসে করযোড়ে বলে, মহারাজ, উত্তরগড় মুণ্ডমালা ঘাটের পরিখা-পাহাড়ের ওপর আমি ছিলাম। আপনার আদেশ মতন সমস্ত রাত আমি মদনমোহনকে ডেকেছি। আর বর্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। এমনি করে রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বর্গীরাও গড়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে, সেই সময় দেখি,—প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়ায় চড়া নীল পোষাক পরা প্রায় বারো বৎসর বয়সের এক ছেলে সহরের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। এক আশ্চর্য সুন্দর গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। আর চারিদিক আলোয় আলো হয়ে উঠেছে তার অঙ্গের জ্যোতিতে। সে এক অপরূপ দৃশ্য মহারাজ। সেইসব দেখে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম, সংজ্ঞাশক্তি আমার আচ্ছন্ন হয়ে এল, জ্ঞান হারিয়ে আমি সেখানে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ যে সেই অবস্থায় ছিলাম জানি নে। তারপর এক ভীষণ শব্দে জেগে উঠে দেখি, বর্গীদের মধ্যে চলেছে প্রলয় তাণ্ডব। তাদের বহু সৈন্য মরেছে! অবশিষ্ট প্রাণ নিয়ে পলায়ন করছে দিগ্বিদিকে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও সেই বালককে আর কোথাও দেখতে পেলাম না।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে সব কিছু শুনছিলেন সকলে। তখন উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠেন গোপালসিংহদেব—পাবি নে, তাঁকে আর দেখতে পাবি নে। আমি বুঝেছি তিনি কে। তিনি ভক্তাধীন মদনমোহন। ভক্তের রাজ্য রক্ষার জন্য অচল বিগ্রহ সচল হয়েছিলেন, তারমধ্যে এসেছিল প্রাণের জোয়ার। বলতে বলতে মদনমোহন মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করেন তিনি। সঙ্গীরাও হন তাঁর সহগামী। কিন্তু তাঁদের আর মন্দিরে যাওয়া হয় না। মাঝ পথে এসে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় এক গোয়ালা। করযোড়ে গোপালসিংহদেবকে বলে, দোহাই মহারাজ! আমার অপরাধ নেবেন না। আপনার আদেশ মতন আমি মদনমোহনের জন্য দই নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় নীল পোষাক পরা সাদা ঘোড়ায় চড়া প্রায় বারো বৎসর বয়সের এক ছেলে আমার পথ আগলে দাঁড়াল। বললে, আমি রাজার ছেলে, বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করে খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছি। পিপাসায় ভেতর আমার শুকিয়ে গেছে। আমাকে কিছু দই দাও, খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। আমি অবিশ্বাস করতে পারলাম না মহারাজ। দেখলাম সারা

অঙ্গে তার বারুদের কালি, সমস্ত পোষাক ঘামে ভিজে গেছে। আর তেমনি মধুর মূর্তি। দেখে সাধ মেটে না। মনটা আমার কেমন হয়ে গেল, সব দই তাকে দিয়ে দিলাম। এক নিঃশ্বাসে যেন সে তা খেয়ে নিলে। আর যাবার সময় দাম দিলে না, দিলে একগাছি সোনার বালা। বললে, বাবাকে এটা দেখালেই সব কসুর তিনি তোমার মাফ করবেন, সব দাম দিয়ে দেবেন। বলতে বলতে একগাছি সোনার বালা দেয় সে গোপালসিংহদেবের হাতে।

অভিভূত হয়ে যান তিনি। সেই বালাগাছি দেখে গোয়ালাকে বলেন, ধন্য তুই! সার্থক জন্ম তোর। এ বালা মদনমোহনের, আমার ছেলে নয়, দই খেয়েছেন মদনমোহন। বলতে বলতে পুনরায় চলতে শুরু করেন তিনি। সঙ্গের বিশাল দলও চলেন তাঁর সঙ্গে। শ্রীমন্দিরে গিয়ে দেখেন মন্দির দ্বার উন্মুক্ত। রত্নবেদীতে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শ্রীমতী শায়িতা। নীচে দণ্ডায়মান অবস্থায় মদনমোহন। পরনে তাঁর নীল পোষাক, সারা অঙ্গে বারুদের কালি, সমস্ত শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মন্দির মধ্যে বারুদের তীব্র গন্ধ, আর মদনমোহনের এক হাতের সোনার বালা নেই।

সব কিছু দেখে অভিভূত হয়ে যান সকলে। আর ভাবের আবেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন গোপালসিংহদেব। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ব্যক্তি তাঁকে বাতাস করতে থাকেন। অবশিষ্ট সকলে বিভোর হয়ে ওঠেন সংকীর্তনে। সেই থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মদনমোহনের মহিমার খ্যাতি। দিনের পর দিন অসংখ্য ভক্তের সমাগম হতে থাকে তাঁর শ্রীমন্দিরে।

ভক্ত, ভগবানের এই লীলা কাহিনী সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক প্রকারের প্রশ্নের হয়ত উদয় হতে পারে। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি ও প্রচার এত অধিক, এবং ভক্ত প্রাণ নর-নারীর মনে এর সত্যতা সম্বন্ধে ধারণা এত গভীর, যার জন্য নিশ্চিতভাবে কোন অভিমত এতে প্রকাশ করা যায় না। যে ঘটনা ঘটেছিল, পাশাপাশি দুইই তা এখানে দেওয়া হল। যার যেভাবে খুশী, নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসমতন সেই ভাবেই তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন।

কথিত আছে—দলমর্দন কামানে অগ্নিসংযোগের ফলে আতঙ্কিত বর্গীদল যখন প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে থাকে, সেই সময় বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত হেঁড়ে পর্বতের জঙ্গলের পথে পলায়নপর ভাস্কর পণ্ডিতকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত ভল্লের আঘাতে কৃষ্ণসিংহদেব আহত হন। আর অসুস্থ শরীরে সেই আঘাতের ফলে একমাত্র পুত্র চৈতন্যসিংহদেবকে রেখে তিনি মারা যান। বিষ্ণুপুর রাজ পরিবার, বিষ্ণুপুরবাসী সকলেই তাঁর অকাল মৃত্যুতে খুবই আঘাত পান।

কিন্তু সেই মর্মান্তিক আঘাতেও নির্বিকার থাকেন গোপালসিংহদেব। তিনি পুত্র শোক বুকে চেপে, পৌত্র চৈতন্যসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনের উপযোগী করে গড়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দসিংহদেবকে বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ১৪/১৫ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত জামকুড়ি পরগণার সব কিছু কর্তৃত্ব অর্পণ করে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তাঁর সেই ব্রত শেষ করেন। আর সেই থেকে সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে অহরহ হরিনাম নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকেন। শ্রীহরির নাম কীর্তন করাই হয় তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ।

কিন্তু মহারাজ গোপালসিংহদেব হরিনাম ও তাঁর চিরউপাস্য মদনমোহন নিয়ে মত্ত হয়ে থাকলেও শ্রীমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিরত ছিলেন না। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ ও ১০৩২ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তের বিখ্যাত সরোবর লালবাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জোড়ামন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। উক্ত জোড়ামন্দিরের নিকটেই তার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ও ১০৩২ মল্লাব্দে নির্মিত রাধাগোবিন্দ জীউয়ের শ্রীমন্দির তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসিংহদেব ও ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ ও ১০৪৩ মল্লাব্দে নির্মিত রাধামাধব জীউয়ের শ্রীমন্দির তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ধর্মপরায়ণা চূড়ামণিদেবীকে দিয়ে তিনিই প্রতিষ্ঠা করান।

দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল এক অপরূপ ভক্তি-বিশ্বাসের ওপর নিষ্ঠা অবিচলিত রেখে সেইভাবে রাজ্যশাসন ও জীবনের শেষ চার বৎসর সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে অহরহ ভগবত চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রেখে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ ও ১০৫৮ মল্লাব্দে গোপালসিংহদেবের পুণ্যময় জীবনের অবসান হয়।

মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব। পূর্বেই উল্লিখিত আছে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। রাজর্ষি গোপালসিংহদেবের মৃত্যুর পর সমারোহে পিতামহের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেন।

ইনি বাদশাহ আহম্মদশাহ, দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের সমসাময়িক। ইনি ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যা লীলাবতীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এঁর জীবনে পিতামহ গোপালসিংহদেবের ধর্মপ্রাণতা ও মদনমোহন-প্রীতি প্রবলভাবে স্থানলাভ করেছিল। কিন্তু তাঁর মতন মদনমোহনের ওপর সব কিছু সঁপে দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা, পিতামহী প্রভৃতির মতন তাঁর কর্মময় রূপের উপাসক। ভক্তির জন্য শক্তিকে তিনি বর্জন করেন নি। তাই সেই প্রবল বৈষ্ণববাদের দিনেও বিষ্ণুপুরের নির্বাণপ্রায় সামরিক শক্তিকে ইনি যতদূর সম্ভব সক্রিয় করে

রেখেছিলেন। যার ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আহ্বানে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অভিযান করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

ইনি অত্যন্ত দানশীল নরপতি ছিলেন। এঁর মুক্তহস্ত দান এত ব্যাপক ছিল যার জন্য তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্যবাসী কোন ব্রাহ্মণের যদি তাঁর দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি না থাকত তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হত না। আর এই সমস্ত ব্যতীত অন্যান্য দিক দিয়েও রাজ্যের কল্যাণের জন্য তাঁর দান অপরিসীম।

একাধারে তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি, সুহৃদ সব কিছু ছিলেন কমল বিশ্বাস। এঁর উপাধি ছিল ছত্রপতি। বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লার পশ্চিমে কুম্মকুঁদার বাজার মহল্লায় অবস্থিত তাঁর বাসভূমি এখনও 'ছতরপতির ডি' নামে অভিহিত।

মহারাজ গোপালসিংহদেবের কাছ থেকে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দসিংহদেব জামকুড়ি পরগণার আধিপত্য লাভ করে নিজে সন্তুষ্ট থাকলেও তাঁর পুত্র দামোদরসিংহদেব তাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনের ওপর তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আর তার জন্য চৈতন্যসিংহদেবের ওপর ছিল তাঁর প্রচণ্ড জাতক্রোধ। কিন্তু পিতামহ জীবিত থাকাকালীন কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতন সঙ্গোপনে প্রতীক্ষা করেছেন। আর তাই গোপালসিংহদেব গত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুরু করেন তাঁর শয়তানী।

তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ভাস্কর পণ্ডিত গত। তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মারাঠা অধিপতি রঘুজী ভোঁসলে তখন মারাঠা বাহিনীর অধিনায়ক। তখন বাংলার বুকে চলেছে তাঁরই তাণ্ডবলীলা।

কিন্তু বিষ্ণুপুর লুণ্ঠন করতে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের সেই শোচনীয় পরিণতির জন্য মল্লভূমের দিকে দৃষ্টি দিতে তারা সাহস করেনি। তাই সেখানের অধিবাসীরা সেদিক দিয়ে ছিল নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাদের সর্বনাশ করে তাদের ঘর শত্রু বিভীষণ কুখ্যাত দামোদরসিংহ। চৈতন্যসিংহদেবকে বিপর্যস্ত করে বিষ্ণুপুরের সিংহাসন দখল করবার দুরাকাঙ্খায় দামোদরসিংহ মারাঠাদের কাছে গিয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাদের বিপর্যয়ের বিভীষিকা স্মরণ করে তারা সম্মত হতে চায় না। তখন সব কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের মল্লভূমে নিয়ে আসেন তিনি। দুর্বার গতিতে শুরু হয় তাদের

অত্যাচার। হাহাকারের ঝড় বইতে থাকে সারা মল্লভূমে। অসহায় প্রজার রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে পল্লীপথ।

মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাতে সফল হন না। শুধু লুণ্ঠনই নয়, দামোদরের প্ররোচনায় শস্যক্ষেত্র পর্যন্ত তারা নষ্ট করে দিয়ে যায়। যার ফলে প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয় সারা মল্লভূমে। মহৎ প্রাণ রাজা তাঁর নিঃস্ব প্রজাদের রক্ষার জন্য তাঁর শস্য ভাণ্ডার, ধনভাণ্ডার সব কিছু উন্মুক্ত করে দেন। প্রজারা তাতে বহু পরিমাণে রক্ষা পায়। আর সেই বৎসরই নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে রঘুজী ভোঁসলের সন্ধি হয়ে বাংলার বুক থেকে বর্গী অত্যাচারের শেষ হয়ে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে বঙ্গবাসী প্রজা।

কিন্তু সর্বনাশ হয় দামোদরসিংহদেবের। সব আশায় ছাই পড়ে তাঁর। অথচ করবার কিছু নেই। তাই ক্ষুব্ধ মন নিয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাল কাটাতে থাকেন তিনি তার জামকুড়ির বাসভবনে।

আর মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব আত্মনিয়োগ করেন প্রজার কল্যাণে। বর্গী উপদ্রব নিবারিত হওয়ায় রাজ্যের শ্রী ফিরে আসতে থাকে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল গত হয় সেইভাবে। তারপর আবার বিপর্যয় বাধে। পাঁচ বৎসর নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করবার পর আবার দামোদর সিংহ শুরু করেন তাঁর শয়তানী। আর এবার গুপ্তভাবে নয়, প্রকাশ্যভাবে চৈতন্যসিংহদেবের কাছে দাবী করেন তিনি অর্ধেক রাজ্য।

কিন্তু সে দাবী তিনি অগ্রাহ্য করেন। বলেন, পিতামহ যে ব্যবস্থা করে গেছেন, পিতৃব্য যা মেনে নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুর রাজবংশের যা চিরন্তন নীতি, আমি তা পরিবর্তন করতে পারব না। আর তোমারও তা দাবী করা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু চোরা বভু ধরম কাহিনী শোনে না। দামোদরসিংহ চিন্তা করতে থাকেন অন্য কোন উপায়ে কাজ হাসিল করা যায় কিনা।

তখন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ। নবাব আলিবর্দী খাঁ তখন গত। তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা তখন বাংলার নবাব। বহু চিন্তার পর ধূর্ত দামোদরসিংহ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর আর্জি পেশ করেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যের অর্ধাংশ পাবার দাবী দিয়ে চৈতন্যসিংহদেবের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ রুজু করেন। আর তরলমতি নবাব সে দাবী তাঁর ন্যায় সঙ্গত মনে করে তাঁর স্বপক্ষে এক পরোয়ানা দেন। আর সেই পরোয়ানা অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্য তাঁকে আদায় দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেন এক সশস্ত্র বাহিনী।

দামোদরসিংহের মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সেই পরোয়ানা আর নবাবী ফৌজ নিয়ে বিপুল উল্লাসে আসেন তিনি বিষ্ণুপুরের দিকে। মনে মনে কত সুখের স্বপ্ন রচনা করেন। কিন্তু সে আশা, সে স্বপ্ন তাঁর সফল হওয়া দূরে থাক পথের মাঝেই তাঁর সব কিছুর সমাধি রচিত হয়। অনেকে বলেন বিখ্যাত দামোদরের নিকটবর্তী সাংহাত গোলায়, আবার অনেকে বলেন বিষ্ণুপুর প্রবেশের মুখে তার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গোপালপুর গ্রামের নিকট, বিষ্ণুপুরের দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছত্রপতি কমল বিশ্বাস বিষ্ণুপুরী ফৌজ নিয়ে সিরাজদ্দৌলার সেই বাহিনী আক্রমণ করেন। দামোদরসিংহের সব দুরাশার পরিসমাপ্তি হয়। সেই প্রচণ্ড আক্রমণে ঝড়ের মুখে তৃণ খণ্ডের মতন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নবাবী ফৌজ। আর শুধু মাত্র প্রাণ সম্বল করে কোনরকমে তাঁর জামকুড়ির বাস ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেন দামোদরসিংহ। কিন্তু অতিরিক্ত ধূর্ত তিনি, তাই সেই শোচনীয় ভাবে লাঞ্ছিত হয়েও তাঁর শয়তানী ত্যাগ করেন না। নবাবের পরোয়ানা অমান্য ও তাঁর ফৌজ ধ্বংসের জন্য চৈতন্যসিংহের বিরুদ্ধে যান তিনি তাঁকে উত্তেজিত করতে।

কিন্তু দূরদর্শী চৈতন্যসিংহদেব তার পূর্বেই নবাব দরবারে তাঁর আর্জি পেশ করে রাখেন। তাতে তিনি জানিয়ে দেন, জ্যেষ্ঠের বংশধরের সিংহাসন প্রাপ্তিই বিষ্ণুপুর রাজবংশের চিরন্তন নীতি, কনিষ্ঠেরা শুধু বৃত্তির অধিকারী মাত্র। যার ফলে দামোদরসিংহ তখন নবাব দরবার থেকে পুরস্কৃত হবার পরিবর্তে তিরস্কৃত হয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু তবুও তাঁর শয়তানী প্রবৃত্তির পরিবর্তন হয় না। প্রতীক্ষা করতে থাকেন তিনি সুযোগের। আর চিন্তা করতে থাকেন সে সুযোগ আসবে কি উপায়ে।

তাই দেশদ্রোহীদের চক্রান্তে পলাশীর রক্ত রাঙা প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে যায়, বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন হয়ে কুখ্যাত মীরজাফর খাঁ যখন বাংলার নবাবীতক্তে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ধূর্ত দামোদরসিংহ পুনরায় তাঁর পূর্ব দাবী নিয়ে সৈন্য সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেন। আর সিরাজদ্দৌলার আহ্বানে তাঁকে সাহায্য করতে যাওয়ার জন্য চৈতন্যসিংহদেবের ওপর বিরূপতাবশত মীরজাফর খাঁ দামোদরসিংহদেবকে দেন এক শক্তিশালী বাহিনী। তিনি সেই ফৌজ নিয়ে এক দুর্যোগময়ী রাতে অতর্কিতে বিষ্ণুপুরে এসে হানা দেন।

আর দুর্ভাগ্যবশত নবাবী-ফৌজ-বিজয়ী কমল বিশ্বাস তখন বিষ্ণুপুরে ছিলেন না। তাঁর স্থলে ছিল পদ্দল খাঁ নামে এক পাঠান।

কিন্তু তবুও দামোদরসিংহের শয়তানী হয়ত সফল হত না পদ্দল খাঁ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত। কারণ দামোদরসিংহ অতর্কিতে এসে হানা দিলেও গড় দখল করতে—পারেন নি। বিষ্ণুপুরের দুর্গরক্ষী বাহিনী দুর্গদ্বার বন্ধ করে নবাবী ফৌজের ওপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল। যার ফলে গড় প্রবেশের কোন আশাই দামোদরসিংহের ছিল না। তাই বলের পরিবর্তে ছলের আশ্রয় নেন তিনি। প্রচুর ধন রত্নের লোভ দেখিয়ে বন্ধ দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন তিনি পদ্দল খাঁকে। ফলে ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হয়। নির্বোধ পদ্দল খাঁ তাঁর শয়তানী বুঝতে না পেরে লোভের বশবর্তী হয়ে মুক্ত করে দেয় দুর্গ দ্বার। সঙ্গে সঙ্গে নবাবী ফৌজ দুর্দমনীয় বেগে প্রবেশ করে নিরস্ত্র হতে বাধ্য করে দুর্গরক্ষী বাহিনীকে। আর সেই সঙ্গে হয় পদ্দল খাঁর জঘন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ধন রত্ন উৎকোচ দেওয়া দূরে থাক, বজ্রমুষ্ঠিতে তার কণ্ঠ চেপে ধরেন দামোদরসিংহ। সগর্জনে চিৎকার করে বলেন, উৎকোচের বশীভূত হয়ে যে বিশ্বাসঘাতক শয়তান নিজের অন্নদাতার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না, এখানেই তার সব জঘন্যতার শেষ হয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে পদ্দল খাঁর শির। বিজয়ী দামোদরসিংহ দখল করেন বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসন। তাঁর কাছে যা ছিল সত্যকার স্বপ্ন, রূপায়িত হয় তা বাস্তবে। মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দেন তিনি মীরজাফর খাঁকে। একবারও চিন্তা করেন না, তাঁর সেই সৌভাগ্য লাভের একমাত্র কারণ মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব ও ছত্রপতি কমল বিশ্বাসের বিষ্ণুপুরে অনুপস্থিতি। কোন অনিবার্য কারণবশত পদ্দল খাঁর ওপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ময়ূরভঞ্জে।

রাজ্য ও রাজপরিবারের অভিভাবক স্বরূপ বিষ্ণুপুরে ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মদনমোহনসিংহদেব। তাই পদ্দল খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে দামোদরসিংহ গড় মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় সৈন্যাধ্যক্ষ শ্যাম বিশ্বাসের সাহায্যে বিষ্ণুপুরের প্রায় বারো মাইল পূর্বে অবস্থিত কুচিয়াকোল দুর্গে সপরিবারে তিনি আশ্রয় নেন। আর সেই দুঃসংবাদ পিতাকে অবগত করাবার জন্য, সেখান থেকেই এক যোগ্য ব্যক্তিকে পাঠান ময়ূরভঞ্জে। দুঃসংবাদ খুবই মর্মান্তিক; তাই খুবই দ্রুতগামী অশ্বে তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন দেখেন বিষ্ণুপুরে ফেরবার উদ্যোগ করছেন চৈতন্যসিংহদেব। সেই দুঃসংবাদ শুনে সে সঙ্কল্প তিনি পরিত্যাগ করেন।

সেনাপতি কমল বিশ্বাস ও আরও অন্যান্য সুহৃদদের পরামর্শ মতন দামোদরের

বিরুদ্ধে নালিশ রজু করবার জন্য সেখান থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উপস্থিত হন তিনি মুর্শিদাবাদে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে শ্রম তাঁর নিরর্থক হয়। সেখানে গিয়ে কোন কাজই তাঁর হয় না। সেখানে চলেছে তখন দ্রুত উত্থান-পতনের খেলা। মীরজাফর খাঁ তখন সিংহাসনচ্যুত। তাঁর জামাতা মীরকাশেম তখন বাংলার নবাব। আর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম চাক্‌লা তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত।

মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান হয়ে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাবী পদ লাভ করে, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে নূতন ভাবে বন্দোবস্ত করেন। আর মহলের পরিবর্তে পরগণা ও কতকগুলি পরগণা নিয়ে চাক্‌লা গঠন করেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ ১৬৬০ পরগণা ও ১৩ চাক্‌লায় গঠিত হয়। তার মধ্যে সামন্তভূম, বরাহভূম, শিখরভূম, মালভূম, শূরভূম ছিল মেদিনীপুর চাক্‌লা। আর মল্লভূম হয় বর্ধমান চাক্‌লার অন্তর্গত। তাই নিরুপায় হয়ে চৈতন্য-সিংহদেবকে কলকাতায় এসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালত সুপ্রীম কোর্টে নালিশ রজু করতে হয়! আর বহু অর্থব্যয় ও তদ্বিরাদি করে, দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দসিংহের সহায়তায় সেই মামলায় তাঁরই জয় হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ক্লাইভ সব কিছু অবগত হয়ে তাঁরই স্বপক্ষে রায় দেন। ক্যাপ্টেন লগীন সাহেব সসৈন্যে বিষ্ণুপুরের এসে তাঁকে দখল দিয়ে যান।

দামোদরসিংহ পুনরায় ফিরে যেতে বাধ্য হন তাঁর জামকুড়ির বাসভবনে। সন্দেহ নিরসনের জন্য এখানে একটা উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

উপরিউক্ত সময়ে দামোদরসিংহদেব বিষ্ণুপুরের সিংহাসন দখল করে যখন রাজার স্থলাভিষিক্ত হন, তখন নিজের নাম জাহির করবার জন্য, সেই সময় বিষ্ণুপুরের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে জমিদার করে, দাতা হিসেবে নিজের নাম লিখে, সেই নামের পূর্বে 'রাজা' শব্দ তিনি ব্যবহার করেন। আর অতি উন্নতমনা চৈতন্যসিংহদেব মোকদ্দমায় জয়লাভ করে পুনরায় বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর, সেই বেআইনি দান বাতিল করে দেন নি। আর তিনি অতি আমিত্ব বর্জিত, অত্যন্ত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন বলে নিজের নামের পূর্বে বহুক্ষেত্রে রাজা শব্দ ব্যবহার করেন নি। তাই সেই সূত্রে কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন, চৈতন্যসিংহদেবের পূর্বে দামোদরসিংহদেব রাজা ছিলেন। কিন্তু সে ধারণা তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। জ্যেষ্ঠের বংশধরের সিংহাসন প্রাপ্তিই বিষ্ণুপুর রাজবংশের চিরন্তন রীতি। আর তাই দামোদরসিংহ দূরের কথা তাঁর পিতা গোবিন্দসিংহদেব রাজা হননি।

আর দামোদরসিংহকেও মোকদ্দমায় হার স্বীকার করে তাঁর জামকুড়ির বাস-ভবনে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর খাঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নগদ দুকোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার মসনদ লাভ করেন। আর কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন না। তাই কোম্পানীর নূতন গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট ও কাউন্সিলের মেম্বাররা তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। ক্লাইভ তখন ইংলণ্ডে। তারপর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম চাকলা কোম্পানী ও সপরিষদ গভর্নর নগদ দুলক্ষ টাকা উৎকোচ নিয়ে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশেমকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু তাঁরও ঐ একই অবস্থা হয়। ইংরেজদের দুর্ব্যবহারের জন্য তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুনরায় মীরজাফর খাঁকেই বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ উপঢৌকন নিয়ে মীরজাফরের অপদার্থ পুত্র নজমউদ্দৌলাকে কোম্পানী বাংলার নবাবী পদ দান করেন।

শুধু উৎকোচ আর উৎকোচ। কোম্পানীর কর্মচারীদের তখন যেন উৎকোচের এক নেশায় পেয়ে বসেছিল, যার ফলে কোম্পানীর কাজ পর্যন্ত নষ্ট হবার উপক্রম হতে বসেছিল। তাই সেই দুর্নীতি দূর করবার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা পুনরায় ক্লাইভকে বাংলাদেশে পাঠান। তিনি পুনরায় সেখানে এসে এমন কঠিন ভাবে উৎকোচ নেওয়ার দুর্নীতি প্রতিরোধ করেন যার জন্য উপহার বা উপঢৌকনস্বরূপ কিছু নেওয়াও তিনি বন্ধ করেছেন। আর প্রত্যেকের কাছ থেকে লিখিত ভাবে তার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন।

তারপর এলাহাবাদ, কারাজেলা ও নগদ পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিয়ে, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি করে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সব বিরোধের নিষ্পত্তি করেন। আর সদ্য পাওয়া সেই দুই জেলা ও বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বাদশাহ্ শাহ্ আলমের কাছ থেকে সেই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দেই কোম্পানীর প্রতিভূস্বরূপ হয়ে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। আর সেই হয় বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের সর্বনাশের সূচনা। তার শোচনীয় সর্বনাশের কারণ গৃহবিবাদ, স্বাধীন ও সৎ মনোবৃত্তির জন্য অবস্থানুযায়ী নিজেদের রক্ষায় বেপরোয়া ঔদাসীন্য ও সব চাইতে বড় কারণ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ। বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবারকে সর্বহারা দীন ভিক্ষুতে পরিণত করার সব চাইতে বড় কারণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সীমাহীন অর্থ লালসা; আর সেই জঘন্যতম বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রুর চক্রান্ত।

না হলে সৎ মনোবৃত্তি নিয়ে তার আভ্যন্তরীণ সব কিছু দেখে সেইমত ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি করতেন তাহলে দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত এই প্রাচীন রাজবংশকে সর্বহারা হতে হত না।

এখানে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় না হওয়ার কারণ, এখানের নর-পতিদের অতিরিক্ত প্রজা বাৎসল্য, ধর্মপ্রাণতা। আর তার জন্য তাদের অপরিমিত নিষ্কর ভূমি দান প্রভৃতি। আর এরই জন্য পরবর্তীকালে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও এক সময় রাজস্ব আদায় করতে খুবই বিব্রত হতে হয়েছিল।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, সেটা তাঁদের অব্যবস্থা। কিন্তু তাঁদের সব কিছু বিচার করে দেখলে সে ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

রাজস্বের প্রয়োজন হয় সাধারণত রাজসিক ভোগ বিলাস, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের জনহিতকর কাজ করা প্রভৃতির জন্য। বিষ্ণুপুরের নরপতিগণ করেছিলেন তা আশাতীতভাবে।

কিন্তু সে অন্য প্রকারে। তার জন্য প্রজাদের করভারে জর্জরিত করার প্রয়োজন তাঁদের হয়নি। প্রথমত অপরিমিত ভোগ বিলাস তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়ত বহু বিভাগের বহু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তাঁরা স্থায়ীভাবে।

যেমন-সৈন্যাধ্যক্ষদের জন্য সেনাপতি মহল, দুর্গরক্ষীদের জন্য মহলবেরা মহল, গোলন্দাজবাহিনীর জন্য তোপখানা মহল, যুদ্ধের বাদ্যকরদের জন্য দম মহল, ধর্ম দান প্রভৃতির জন্য বেতলবী মহল, বিরাট ঘাটোয়ালী মহল প্রভৃতি বহু বিভাগের কাজের জন্য অনেক কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা তাঁদের করা ছিল।

আর এই সমস্ত ব্যতীত, নবাব সরকারকে যে রাজস্ব তাঁরা দিতেন তা খুবই নগণ্য। কিন্তু তার জন্য কোন উৎপীড়ন তাঁদের প্রতি হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা করেন। তার জন্য বেত্রাঘাত, রাজ্যচ্যুতি, এমনকি তাঁর তৈরী বৈকুণ্ঠবাস প্রভৃতি অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

বৈকুণ্ঠ অর্থে মল, মূত্র প্রভৃতি যতকিছু কদর্য, পুতিগন্ধময় জিনিসে ভরা, কৃমি কীট পূর্ণ প্রকাণ্ড এক গর্ত। হিন্দুরা উপহাস করে তার নাম দিয়েছিল বৈকুণ্ঠ। রাজস্ব বাকী করে দিতে না পারলে বাংলার ভূস্বামীদের খোলা গায়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হত। আর রাজস্ব বাকী করে বাংলার কোন রাজা বা জমিদার সেই অমানুষিক অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি বাংলার বহু রাজবংশ তাঁর অত্যাচারে একবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব ও গোপালসিংহদেব সেই সমসাময়িক নরপতি। কিন্তু তাঁদের ওপর কোন প্রকার উৎপীড়ন হয়নি। অথচ সেই নবাব বাদশাহের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আচরণ করেছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ নিয়ে যখন রাজস্ব আদায় করতে আরম্ভ করেন, তখন দামোদরসিংহের সঙ্গে দীর্ঘদিন-ব্যাপী মোকদ্দমার ব্যয় বাহুল্য প্রভৃতিতে বিষ্ণুপুরের রাজকোষ শূন্য। চৈতন্য-সিংহদেব একবারে নিঃস্ব। কিন্তু তার জন্য কোন সহানুভূতি কোম্পানী দেখায় নি। দেওয়ানী পদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব আদায় করতে আরম্ভ করেই বিষ্ণুপুরের বাকী-পড়া রাজস্বের অতি সামান্য মাত্র ৭৪২৮.০০ টাকা রফা ছাড় বাবদ বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত রাজস্ব দেবার জন্য তাঁরা কঠোর আদেশ জারি করেন।

কিন্তু নিঃস্বতার জন্য চৈতন্যসিংহদেবের পক্ষে সে আদেশ পালন করা সম্ভব হয় না। কোম্পানীর কাছে কিছু সময় চান তিনি। কিন্তু সে আর্জি তাঁর মঞ্জুর করা দূরে থাক, এমন অকথ্য জঘন্যতম আচরণ কোম্পানী করেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দেবসেবা ও রাজপরিবারের ভরণ পোষণের জন্য মাত্র ৫৫১৪৮.০০ টাকা আয়ের ক্ষুদ্র এক জমিদারী অবশিষ্ট রেখে বাকী সমস্ত সম্পত্তি তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে মল্লভূমের ভাগ্যদেবতা মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব পরিণত হন বিদেশী বণিকের অধীনস্থ ক্ষুদ্র এক জমিদারে।

কিন্তু বেশীদিন সে অবস্থায় অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক তিনলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকার করে, কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁর বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বন্দোবস্ত নেন তিনি। সম্পত্তি তাঁর ফিরে আসে। কিন্তু তার সঙ্গে আসে বিপদ।

কারণ বিষ্ণুপুরের অধিপতিগণ চিরকাল প্রজার কল্যাণেই তাঁদের সবকিছু নিয়োজিত করে গেছেন। প্রজার ওপর উৎপীড়ন তাঁরা কোনদিন করেন নি।

তাই রাজস্বের জন্য কোম্পানী তাঁর ওপর উৎপীড়ন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার জুলুম জবরদস্তি করে প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ আয়ের তুলনায় রাজস্ব বেশী হওয়ার জন্য, তা দেওয়া সম্ভব হয় না। রাজস্ব যে পরিমাণ আদায় হয় তাতে আবশ্যকীয় খরচ সঙ্কুলান করে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

নবাবী আমলে তার জন্য তাঁদের কিছু চিন্তা ছিল না। রাজস্ব পাওয়া না-পাওয়া বা স্বল্পতার জন্য বিষ্ণুপুরের ওপর কোন বিরূপতা তাঁদের ছিল না। রাজস্বের চেয়ে বিষ্ণুপুরের সখ্যতাই তাঁরা কামনা করে গেছেন বেশী।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আচরণ তার বিপরীত। সখ্যতা, মানবতা কিছুই তাঁরা জানেন না, তাঁদের চাই টাকা। টাকাই তাঁদের সব। তার জন্য প্রিয়-অপ্রিয়ের বিচার নেই, ন্যায়-ধর্মের বালাই নেই, তার জন্য যত নির্মমতা, যত অবিচার, অত্যাচার সব কিছুই করতে তাঁরা প্রস্তুত।

তাই উপর্যুপরি রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন চৈতন্য-সিংহদেব। অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করবার জন্য আদেশ দেন কর্মচারীদের। কিন্তু ভাগ্য যার বিমুখ, দুর্ভাগ্য যাঁর চির সহচর—কোন আশাই তাঁর পূর্ণ হয় না। মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবের ক্ষেত্রেও তাই হয়। সেই বৎসরই ১৭৬৯/৭০ খৃষ্টাব্দ ও বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলার বুকে আসে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। কয়েক বৎসর ধরেই অজন্মা চলছিল। আর তার জন্য দেশের অধিকাংশ অধিবাসী নিঃস্বদের মধ্যে চলছিল অর্ধাহার, অনাহার। তার ওপর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশকে একবারে শেষ করে দেয়। অনাহার ও মহামারীতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

দেশের জমিদাররা পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েন। দেশের বুকে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব। রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে দেশরক্ষার দায়িত্বও কোম্পানী নিয়েছিল। কিন্তু সে তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। আর আইনত নবাবের দায়িত্ব থাকলেও তিনি তখন সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন, কোম্পানীর বৃত্তিভোগীমাত্র। কে কাকে রক্ষা করবে? দেশের সর্বত্র চুরি, ডাকাতি, বিশৃঙ্খলা। সবাই সন্ত্রস্ত। কে কাকে সাহায্য করবে? আত্মরক্ষার চিন্তাতেই সবাই অস্থির। কিন্তু তবুও কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের বিরাম থাকে না। তার জন্য কোম্পানীর নিযুক্ত বাংলার নায়েব নাজীম রেজা খাঁ, আর বিহারের নায়েব নাজীম সীতাব রায়ের অত্যাচার। দেশবাসী মরুক, দেশ জাহান্নমে যাক, কোম্পানীর চাই টাকা।

বিষ্ণুপুরের বুকেও তখন তারই তাণ্ডব চলেছে। সেখানেও তখন চারদিকে হাহাকার, চারদিকে বীভৎসতা, ঘরে ঘরে মৃত্যুর পদধ্বনি। অনাহারক্লিষ্ট, রোগ-শোক জর্জরিত মানুষের মরণ চিৎকার!

বিষ্ণুপুরের রাজকোষ তখন শূন্যপ্রায়, কোম্পানীর রাজস্ব বাকী। সব দিক দিয়েই চৈতন্যসিংহদেব তখন নিরুপায়, সর্বনাশ তাঁর শিয়রে। তবুও মহৎপ্রাণ, প্রজা বৎসল রাজা তাঁর অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদের রক্ষার জন্য তাঁর ধন ভাণ্ডার, শস্য ভাণ্ডার সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেন। তাতে প্রজা রক্ষা পায়। কিন্তু তিনি হয়ে পড়েন সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব।

কিন্তু শয়তান যে, শয়তানী প্রবৃত্তি তাঁর কিছুতেই যায় না। এক্ষেত্রেও তাই হয়। চৈতন্যসিংহদেবের সেই দুঃসহ অবস্থার সুযোগে বহুকাল নিশ্চেষ্ট থাকার পর দামোদর সিংহ আবার শুরু করেন তাঁর শয়তানী। মুর্শিদাবাদে গিয়ে কোম্পানীর রেসিডেন্টের কাছে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবার দাবী জানিয়ে চৈতন্যসিংহদেবের বিরুদ্ধে এক মামলা রজু করেন। আর যে কোন কারণবশতই হোক, রেসিডেন্ট তাঁরই অনুকূলে ডিক্রি দেন।

তখন মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব কোম্পানীর ঊর্ধ আদালত সুপ্রীম কোর্টে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে আপীল করেন। সব কিছু অবগত হয়ে সেই আপীল তিনি মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার জন্যে সে মামলা খুবই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অথচ সেই মামলার জয়-পরাজয়ের ওপরই নির্ভরই করছে তাঁর উত্থান-পতন। তাই তার ভালভাবে তদ্বির করবার উদ্দেশ্যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহের উপদেশ মতন মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব কলকাতার সালিমা অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া করে সেখানেই বাস করতে আরম্ভ করেন। আর মদনমোহনদেবের চরণামৃত পান না করে তিনি জল গ্রহণ করতেন না বলে সেই সময় উক্ত বিগ্রহ, তাঁর সেবাইত পূজারী ব্রাহ্মণ, পাচক প্রভৃতি সকলকেই তিনি সেখানে নিয়ে যান।

মদনমোহনদেবের মহিমার খ্যাতি অসীম। তাই সেখানে তাঁর অবস্থিতির সংবাদও ছড়িয়ে পড়ে সেইভাবে। আর তার জন্যে তাঁকে দর্শন করতে আসেন অনেকেই। কোন্নগরের প্রসিদ্ধ লবণ ব্যবসায়ী গোকুল মিত্র মহাশয়ও আসেন। ভক্ত ব্যক্তি তিনি। সেই সূত্রে রাজার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। মোকদ্দমার সব কথা তাঁর কানে যায়। অর্থ সামর্থ্য সব কিছু দিয়ে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। সেই মোকদ্দমায় জয় হয় চৈতন্যসিংহদেবেরই।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তাঁর সর্বনাশ হয়। দীর্ঘস্থায়ী মোকদ্দমার জন্য দীর্ঘদিন

কলকাতায় বাস আর সেই মোকদ্দমার ব্যয় বাহুল্যে আকণ্ঠ ঋণে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন। আর বিপদ যখন আসে সর্বনাশ যখন হয়, তখন বিভিন্ন দিক দিয়ে সে তাকে আক্রমণ করে। মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবের অবস্থাও হয় তাই। যখন তিনি ঋণ পরিশোধের চিন্তায় অস্থির, সেই সময় তাঁর জীবনে আসে আরও এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহনসিংহদেব মারা যান। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন সেই সংবাদ কলকাতায় গিয়ে যখন পৌঁছায় তখন তা শুনে পাগলের মতন হয়ে পড়েন রাজা। বুকে করতে থাকেন করাঘাত। আর মুখ দিয়ে বের হতে থাকে তাঁর অন্তর মথিত করা হাহাকার। শুধু এক কথা, হায় মদনমোহন একি করলি ! হায় ঠাকুর এ কি করলে।

গোকুল মিত্র প্রভৃতি বহু সুহৃদ সেই সংবাদ শুনে তাঁর কাছে ছুটে আসেন। নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেন! কিন্তু সব বিফল হয়। কিছুতেই তাঁকে শান্ত করা যায় না। মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ব্যয় করে অবশিষ্ট যা ছিল মিত্রমহাশয়কে তা ফেরত দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে ঋণ-নেওয়া বাকী টাকার জন্য মদনমোহন বিগ্রহকে গোকুল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে রেখে, পুত্র ও পুত্রাধিক বিগ্রহ দুই মদনমোহনহারা শোকাতুর রাজা ফিরে আসেন বিষ্ণুপুরে। তার বুকে ঘনিয়ে আসে সর্বনাশের তিমির ঘন রাত্রি।

সন্দেহ নিরসনের জন্য এখানে একটা কথা উল্লেখ করলাম। মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মদনমোহনসিংহদেব পিতা চৈতন্যসিংহদেবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাজকার্য সম্পন্ন করতেন। সেইজন্য সেই সূত্রে ভুলবশত অনেকে মনে করেন তিনি রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তা নয়। চৈতন্যসিংহদেবের জীবিতকালে মদনমোহনসিংহদেবের মৃত্যু হওয়ার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যসিংহদেবের পৌত্র মাধবসিংহদেব বিষ্ণুপুরের অধিপতি হন। মদনমোহন-দেবের কলকাতায় অবস্থান গোকুল মিত্র মহাশয়ের জীবনে এনে দেয় আলোর জোয়ার। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে তাঁর। আর বিষ্ণুপুরের বুকে বাড়তে থাকে হাহাকার। ক্রমাগত সর্বনাশ হতে থাকে তার।

অন্যান্য জমিদারের হিসাব দেখে পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্ত করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রে তা করেন না। যে-কোন কারণ-বশতই হোক, এক সিভিলিয়ানকে নিয়োগ করেন তাঁরা বিষ্ণুপুরে। কিন্তু মন্বন্তর ও মোকদ্দমা প্রভৃতিতে চৈতন্যসিংহদেব তখন দীনের চেয়েও দীন। রাজস্ব দেওয়া দূরে থাক, তখন তিনি রাজ্য পরিচালনার ব্যয় বহন করতেও

অক্ষম। কিন্তু কোম্পানী তা শোনে না। তারা সক্ষম অক্ষম জানে না, তাদের চাই টাকা। এই রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ার জন্য কোম্পানী তাঁর চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাঁকে আবদ্ধ করেন কারাগারে। বিষ্ণুপুরে সব আশা-ভরসার পরিসমাপ্তি হয়। স্বাধীনচেতা মল্লভূমের ভাগ্যদেবতা বন্দী হন বিদেশী বণিকের কারাগারে।

যুবরাজ মদনমোহনসিংহদেবের মৃত্যু, পরমপ্রিয় মদনমোহন বিগ্রহের কলিকাতায় অবস্থিতি, সর্বশেষ চৈতন্যসিংহদেবের কারাবাস। একের পর এক আঘাতে রাজপরিবারবর্গ, রাজকর্মচারী, সকলেই হয়ে পড়েন যেন দিশেহারা। রাজ্যব্যাপীও আঘাত পান প্রচণ্ডভাবে। সকলেই তাঁদের প্রিয় রাজাকে মুক্ত করবার জন্য হয়ে ওঠেন অধীর।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে? প্রচুর রাজস্ব বাকী। কোথা থেকে তা আসবে? ছিয়াত্তরের সর্বনাশা মন্বন্তরে প্রজারা নিঃস্ব! মন্বন্তর ও মোকদ্দমায় রাজকোষ শূন্য, রাজপরিবারবর্গ সর্বশান্ত! তাই কারাগারের মধ্যে রাজা, বাইরে রাজভক্ত প্রজা, রাজকর্মচারী, রাজপরিবারবর্গ, সকলেই কাল কাটাতে থাকেন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায়।

এখানের চলতি ভাষায় বলে বারো মাসে তের পার্বণ, তারপর অসংখ্য দেবালয়ে নিত্যপূজা, ভোগ, আরতি, পর্বের সময় তার যথাযথ নিয়ম পালন—সবই বিধিবদ্ধ অবস্থায় চলতে থাকে। কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন কিছু থাকে না। পরমপ্রিয়ের অভাবে উৎসবের দিন আনন্দ মুখর হওয়ার পরিবর্তে হয়ে ওঠে আরও মলিন, আরও অশ্রুমাখা।

কারণ মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব ত শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কার প্রতিপালক। একাধারে পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয় বলতে সবকিছু। কিন্তু বিদেশী কোম্পানী সে মর্মবেদনা বোঝে না। তাই একইভাবে দিন গত হতে থাকে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হেসিলিজ নামে এক ইংরেজ বিষ্ণুপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার পান। আর ঐ সঙ্গে ন্যায্য রাজস্ব ধার্য করবার জন্যও কোম্পানী তাঁকে আদেশ দেন। তাই তিনি বিষ্ণুপুরের রাজস্ব বিভাগ পরীক্ষা করে দেখেন, চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ টাকা আদায়। তার এক অংশ মালিকানা রেখে, তিন লক্ষ একাশী হাজার তিনশত নিরানব্বই টাকা এক আনা ন'পাই তিনি ন্যায্য রাজস্ব ধার্য করেন। রাজার থাকে মাত্র আটত্রিশ হাজার একশত উনচল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা ন' পাই। তাতে প্রজার কাছ থেকে আদায় করবার তহশীলদার,

গোমস্তা, পাইক প্রভৃতির বেতন দিয়ে রাজার কিছুই থাকে না। এই হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায্য রাজস্ব ধার্য। এখানের চলতি ভাষায় এক ছড়া আছে। "যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।" বিষ্ণুপুরের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরিপূর্ণভাবে সেই নেপোর ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। সেই থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বেশ পরিমাণ করা যায়।

কিন্তু উপায় নেই। তারাই তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্যদেবতা। দণ্ড মুণ্ডের অধীশ্বর। কিন্তু জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করেও প্রজার কাছ থেকে কোম্পানী পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতে পারে না। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ফিটিং নামে এক ইংরেজের সঙ্গে মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবকে ইন্দাসে আনিয়ে নূতনভাবে জমিদারী বন্দোবস্ত দেবার আদেশ দেন। এবং তাঁর চিরশত্রু দামোদরসিংহ বন্দোবস্ত নেবার আশঙ্কায় মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব বার্ষিক চার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকার করে নূতনভাবে জমিদারী বন্দোবস্ত নেন। তার জন্য কোম্পানীর কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। তখন সব চাইতে আগে মনে জাগে তাঁর মদনমোহনের কথা। তিনি মুক্ত। কিন্তু তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় মদনমোহন বিগ্রহ কলকাতার বাগবাজারে ঋণের দায়ে আবদ্ধ। তাই বিষ্ণুপুরে এসেই নিজের পরিবারবর্গের অলঙ্কারের বিনিময়ে টাকা সংগ্রহ করে তিনি কলকাতায় যান। তাঁর ঋণ নেওয়া অর্থ ফেরত দিয়ে মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকে তাঁর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে ফিরে চান।

কিন্তু সে আশা তাঁর বিফল হয়। ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে সেই বিগ্রহ তাঁকে দান করবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন তাঁকে গোকুল মিত্র মহাশয়। কারণ মদনমোহন বিগ্রহ তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করার পর থেকে এরূপ দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি তাঁর হতে থাকে যার জন্য মনে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, এর একমাত্র কারণ মদনমোহন। আর তাঁর পরমভক্তিমতী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মদনমোহন বিগ্রহের ওপর আকৃষ্টা হয়ে পড়েন খুবই।

কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁর সেই প্রাণের ঠাকুরকে দান করতে সম্মত হন না। বলেন, আপনি চলুন, মদনমোহনের মতন বিগ্রহ আমার আরও আছে। তার মধ্যে যে বিগ্রহ আপনি চাইবেন, হাসি মুখে আমি তা আপনাকে দান করব। কিন্তু আমার প্রাণেরও প্রিয় মদনমোহন। ওঁকে আমি দান করতে পারব না।

কিন্তু মিত্র মহাশয়ের চাই মদনমোহনকে। তাই তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন

তিনি। কথিত আছে—ছলে, বলে, কৌশলে যে কোন প্রকারে হোক মদন-মোহন বিগ্রহকে কুক্ষিগত করবার জন্য রাজার অজ্ঞাতসারে প্রচুর টাকার দাবী জানিয়ে তাঁর নামে হেস্টিংস সাহেবের কাছে নালিশ করে এক তরফা ডিক্রি করিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তখন সেই অপকৌশলের আশ্রয় নেন। কোম্পানীর দেওয়া সেই ডিক্রি দেখিয়ে তত টাকার দাবী করেন। রাজা বোঝেন মদনমোহন তাঁর ওপর বিরূপ তাই তাঁর ঐ অবস্থা। তাই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে সেই অপকৌশলের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে কলকাতার বাগ-বাজারে রেখে আসতে বাধ্য হন তিনি। শেষ হয়ে যায় চৈতন্যসিংহদেবের সব আশা ভরসা। বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যেই তিনি যে মদনমোহনকে ওখানে রেখে এসেছিলেন সেই কথাই সত্য। তার জন্যই সেবাইত, পুরোহিত প্রভৃতিকে তিনি বিষ্ণুপুরে নিয়ে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু মদনমোহন অন্ত প্রাণ তাঁরা। তাই বিষ্ণুপুরে এসে তাঁরা স্থির থাকতে পারেন না। অহরহ চোখের জলে ভাসতে থাকে তাঁদের বুক। আহার-নিদ্রাও চলে যায়। আকুল হয়ে ডাকতে থাকেন সেই অকূলের কাণ্ডারী মদনমোহনকে। বলেন, তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই আমরা থাকতে পারব না। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। এর উপায় তুমি কর। আমাদের কৃপা কর প্রভু।

নিষ্ঠা তাঁদের অবিচল। ভক্তি তাঁদের অসীম। আর তার জন্যই তাঁর কৃপা হয়। তাঁদের সেই আকুল প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ওঠেন ভক্তের ভগবান। মিত্র মহাশয়ের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। স্বপ্নে মদনমোহন তাঁকে বলেন, আমার সেবাইত, পুরোহিত ব্যতীত অপরের হাতে সেবা-পূজা নিয়ে আমার তৃপ্তি হয় না। তাদের অভাবে আমি উপবাসী আছি। আমার স্বপ্নাদেশের কথা রাজাকে জানিয়ে তাদের এখানে নিয়ে আয়। নৈলে এইরকম উপবাসী অবস্থাতেই আমাকে দিন কাটাতে হবে।

বাণী নীরব হয়ে যায়, ঘুম ভেঙ্গে যায় মিত্র মহাশয়ের। স্থির থাকতে পারেন না তিনি। শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে আসেন। আহ্বান করেন তাঁর লোকজনদের। রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হয়ে যান তাঁরা।

সব কিছু শুনে রাজা কাঁদতে থাকেন। দ্বিরুক্তি করেন না। সেবাইত, পুরোহিতকে পাঠিয়ে দেন তাঁদের সঙ্গে। মদনমোহনের সেবায় স্থায়ীভাবে তাঁদের নিয়োগ করেন মিত্র মহাশয়। তাঁদের সব আশা পূর্ণ হয়। আজও তাঁদের বংশধরগণ মদনমোহনের সেবায় নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ,

কৌশল-অপকৌশল যাই হোক না কেন, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, বলতে বাধ্য হতে হয়—বিষ্ণুপুরের রাজা ও বিষ্ণুপুরবাসীর যে ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভক্তি অন্তপ্রাণ মদনমোহন বীরভূমের বৃষভানুপুর গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে আসেন, দীর্ঘকাল ধরে সেখানে অবস্থান করে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন, সেখানের রাজা, প্রজা সকলকে ধন্য করেন ; সেখানের ধূলিকণাকে তীর্থ রেণুতে পরিণত করেন ; সেই ভক্তির বন্ধন শিথিল হওয়ায় আর এক ভক্তের আকর্ষণে তিনি কলকাতায় চলে যান। শেষ হয়ে যায় তাঁর বিষ্ণুপুর লীলার।

এদিকে মদনমোহনকে ফিরে না পাওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বিষ্ণুপুরে। হাহাকারে ভরে ওঠে বিষ্ণুপুরবাসীর অন্তর। অশ্রুর তুফান বইতে থাকে সেখানে। প্রবাদ আছে—

রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদে হয়ে অচেতন।
হাতীশালায় হাতী কাঁদে ঘোড়া না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে যতেক রমণী।

সব চাইতে আঘাত পান মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব। মদনমোহন হারা হয়ে তাঁর এরূপ অবস্থা হয়। যার জন্য পুত্রশোক, কারাবাস, অতীতের সব কিছু বেদনা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। চোখের জলই হয় তাঁর সম্বল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন অবিরত। এমনি করে জীবন্মৃত অবস্থায় গত হতে থাকে দিন। কিন্তু তাতেও তাঁর দুঃখের অন্ত হয় না। আবার আসে বিপর্যয়। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন চৈতন্যসিংহদেবের মাথায়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ঘটে আবার এক দুর্ঘটনা। বীরভূমের কালেক্টারের কাছে আদেশ আসে, চৈতন্যসিংহদেব ও দামোদরসিংহদেব, দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিদারী সমানভাবে ভাগ করে দেবার জন্যে। তার কারণ অনেকে বলেন, দামোদরসিংহ গোপনে নালিশ করে এক তরফা ডিক্রি করে, তার রায়। আবার অনেকে অনুমান করেন, মোকদ্দমা বাধিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের উপার্জনের হীন চক্রান্ত।

যাই হোক সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা বুকে চেপে সেই অন্যায় আদেশ বাতিল করবার জন্য বৃদ্ধ রাজা ছুটে যান বীরভূমে। সেখানকার সদর আদালতে সেই আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ রজু করেন। মোকদ্দমা চলতে থাকে। তারপর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের চেষ্টায় সেই মামলার পরিসমাপ্তি হয়। শেষ হয় সর্বনাশা গৃহবিবাদের। দামোদরসিংহ তখন মৃত্যুশয্যায়, আর চৈতন্যসিংহদেব জীবন্মৃত অবস্থায়

এদিকে আবার সর্বনাশ হয়। রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য আবার তিনি কারাগারে আবদ্ধ হন। আর তাতেই সব কিছুর নিবৃত্তি হয় না। এবার অন্য পথ ধরেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির একাংশ বারহাজারী ও কড়িগুণ্ডা নামে দুই মহল নিলামে বিক্রয় করবার আদেশ দেন। বর্ধমানের মহারাজা তা খরিদ করেন। রাজস্বের বহু অংশ তাতে পরিশোধ হয়, রাজা মুক্তি পান আর অবশিষ্ট জমিদারীও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়ার জন্য বহু সাবধানতা সত্বেও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আবার রাজস্ব বাকী পড়ে। আর সেই জন্য মিষ্টার ফিটিং পুনরায় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে জীবনলাল নামে এক ব্যক্তিকে সাজাওয়ালা নিযুক্ত করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেইভাবে চলে। রাজা রাজস্ব কমাবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের কাছে বার বার আবেদন করতে থাকেন। মল্লভূমির প্রাচীন রাজবংশকে রক্ষা করবার জন্য অনুনয়-মিনতি করতে থাকেন। তাতে বর্ধমানের কালেক্টার মিষ্টার ডেভিডের মনে সাড়া জাগে। তিনি রাজার দুঃখে মর্মাহত হয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। রাজার অনুকূলে কোম্পানীকে লেখেন, মল্লভূমের বর্তমান জমিদারীর চার লক্ষ টাকা সদর জমা অসঙ্গত। তার ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব ধার্য করবার সময় মিষ্টার হেসিলিজ যে হিসাবে রাজস্ব ধার্য করেছেন, রাজা আইনত তা আদায় করতে পারেন না। আর যে দুমহল নীলামে বিক্রয় করা হয়েছে, তার রাজস্ব ধরা হয়েছে অতি অল্প। আর রাজার যা অবশিষ্ট আছে তার রাজস্ব ধরা হয়েছে অতিরিক্ত।

ফল হয় তাতে আশাতীত। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ড বাকী রাজস্ব রেহাই দিয়ে রাজাকে জমিদারী ফিরিয়ে দেন এবং অবশিষ্ট জমিদারীর সদর জমা কম করে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা করেন। আর মিষ্টার ডেভিডের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত নেন। কিন্তু তবুও তাতে শেষরক্ষা হয় না। কারণ—জমিদারীর এক বৃহৎ অংশ নীলামে বিক্রয় হয়ে গিয়ে রাজ্যের আয় কমে গিয়েছে তখন অতিরিক্তভাবে। কিন্তু রাজ্য পরিচালনা, দেব সেবা প্রভৃতির যে ব্যয় তা রয়ে গিয়েছে পরিপূর্ণ ভাবেই। তাই সেই রাজস্বও দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী পুনরায় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন। আর বাকী পড়া রাজস্বের জন্য ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নীলামে বিক্রয় করবার আদেশ দেন। তাতে সামান্য পরিমাণ রেখে অবশিষ্টসমস্তজমিদারীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নীলাম করা হয়। সেই পাঁচ খণ্ডের সদর জমা এক লক্ষ একানব্বই

টাকা। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাজাওয়ালা জীবনলাল বিষ্ণুপুরে ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান মিষ্টার সার্টেন কমিশনার হয়ে বিষ্ণুপুরে এসে সেই সময় পর্যন্ত সামান্য যে জমিদারী অবশিষ্ট ছিল, উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত উনআশী টাকা তার সদর জমা ধার্য করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কমিশনার ব্র্যান্ট হিসাব করে দেখেন, প্রজাদের বার্ষিক খাজনা পঁয়ষট্টি হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা তের আনা ন'পাই। তার থেকে শতকরা উনচল্লিশ টাকা মাত্র রাজার মালিকানা থাকে।

ক্রমাগত গৃহবিবাদ, বর্গী উপদ্রব, মন্বন্তর, রাজস্ববাকী, কারাবাস, প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব অনাদায়, তবুও প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের জন্য চৈতন্য সিংহদেবের দানপত্রে সহির বিরাম ছিল না। তাঁর সেই নিঃস্ব, অতিরিক্ত অস্বস্তি-অশান্তিকর অবস্থাতেও যোগ্য প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন নি। আর সেই অপরিমিত দানের জন্য জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে খুবই বিব্রত হতে হয়। তাই বহুচিন্তার পর সমস্ত নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা।

কিন্তু তাতে অন্যদিক দিয়ে আসে বিপদ। মল্লভূমের সমস্ত প্রজা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বলে আমাদের রাজার দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি, এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার কোন অধিকার কোম্পানীর নেই। এমনকি সেই সূত্র নিয়ে স্থানে স্থানে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত দেখা দেয়, যার জন্য বিচলিত করে তোলে তাঁদের। সেই বিক্ষোভের নিবৃত্তির জন্য হিজলী স্বপন নামে এক ইংরেজকে পাঠান তাঁরা বিষ্ণুপুরে। তিনি প্রজাদের কাগজপত্র দেখে সব কিছু অবগত হয়ে, তাঁর নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি, অথবা নিজের খেয়াল-খুশী মত বহু জমির ছাড়পত্র লিখে নিয়ে যান। আমাদের এখানের চলতি ভাষায় তা জানী ছাড় নামে পরিচিত। অনেকে উক্ত বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন। এবং মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবকে তার উদ্যোক্তা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। ও বিদ্রোহ প্রজাদের স্বতন্ত্র—স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ।

মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব নিজে গৃহ বিবাদের জ্বালায় সর্বস্বান্ত হওয়ার জন্য নিজের জীবিত কালেই তাঁর পুত্রদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুপণ্ডিত নিমাইসিংহদেবকে কুচিয়াকোল পরগণা, তৃতীয় পুত্র প্রথম ক্ষেত্র মোহনকে নাট কাঞ্চনপুর ও চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রমোহনকে ইন্দাজের জমিদারী ও সেই নিজের জমিদারীতে তাঁদের বাসের ব্যবস্থা করে দেন। এঁর দুই পুত্রের নাম ক্ষেত্রমোহন ছিল।

মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব পরম ভক্তিমান পুরুষ হলেও, বিভিন্ন দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত হওয়ার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী নরপতিদের মত মন্দির নির্মাণ বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেননি। শুধু ১০৬৪ মল্লাব্দ ১৬৮০ শকাব্দ ও ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজদরবারের সংলগ্ন বুড়ো রাধা-শ্যাম জীউ বিগ্রহও তাঁর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রতিষ্ঠা ফলকে লিখিত আছে—

শ্রীরাধাশ্যাম চন্দ্রাঙ্ঘ্রী সরসীজতলে দিব্যমেতৎ সুশোভং
মল্লাব্দে বেদকালাম্বর বিধুগণিতে ব'হুল্যে পৌণমাস্যাং
গেহং নানা বিচিত্রমতি দৃঢ়ং পূজিতশ্চোপিভক্তৈ
শ্রীচৈতন্য নৃপেন্দ্রঃ শুভকৃতিনিপুণ সম্প্রবচ্চেৎ সভায়াম।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মল্লভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর ধ্বংসকাল পর্যন্ত যে ষাটজন নরপতি মল্লভূমে রাজত্ব করেন, তার মধ্যে এমন দুঃখপূর্ণ বিড়ম্বিত জীবন আর—কারও দেখা যায় না। এঁর রাজ্যভোগের কালও যেমন দীর্ঘ, দুখ ভোগও সেই মত অন্তহীন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল ইনি রাজত্ব করেন। তারপর শেষ জীবনে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে পৌত্র মাধবসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবের বিড়ম্বিত জীবনের অবসান হয়।

মহারাজ মাধবসিংহদেব পূর্বেই উল্লিখিত আছে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়।

ইনি দ্বিতীয় শাহ আলম ও দ্বিতীয় আকবরশাহের সম-সাময়িক। এঁর জীবনও পিতামহ চৈতন্যসিংহদেবের মত দুর্ঘটনায় ভরা। তবে এঁর দুঃখ-ভোগের কাল দীর্ঘ নয়, সংক্ষিপ্ত। দেশের দুরবস্থার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আদায় না হওয়া ও আয়ের তুলনায় রাজস্ব অতিরিক্ত ভাবে ধার্য হওয়া প্রভৃতির জন্য কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়ে বর্দ্ধমান আদালতে চৈতন্যসিংহদেবের নামে ডিক্রির টাকা ও তার পরবর্তীকালের বাকী একলক্ষ সাতাশী হাজার নয়শত ষোল টাকার জন্য বিষ্ণুপুরের অবশিষ্ট জমিদারী তার ঘাটোয়ালী মহল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর নীলামে বিক্রয় হয়। আর দু'লক্ষ পনেরো হাজার টাকায় বর্দ্ধমানের মহারাজা তা খরিদ করেন। সেই থেকে তার শেষ সম্বলটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়ে বিষ্ণুপুর রাজপরিবার সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিঃস্ব রাজা মাধবসিংহদেবকে মাসিক চারশ টাকা ও রাজ-

পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য ৫৯৭ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মহারাজ মাধবসিংহদেব পিতামহ চৈতন্যসিংহদেব বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপালসিংহদেবের মত নিরীহ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব প্রভৃতির মত ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন উগ্র প্রকৃতির মানুষ। তাই তাঁদের সর্বনাশকারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দয়ার দান তাঁকে তৃপ্ত না করে তিক্ত করে তুলেছিল। জোর করে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

কিন্তু বিষ্ণুপুরের সামরিক শক্তি তখন বিনষ্ট প্রায়। তাকে সক্রিয় করে তুলতে না পারলে সে স্বপ্ন সফল করা অসম্ভব। অথচ তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজকোষ বলতে তখন কিছুই নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমানুষিকতায় সমস্ত জমিদারীও নষ্ট। কেমন করে তা সম্ভব হবে? কোথা থেকে আসবে সেই অর্থ? তাই বহু চিন্তার পর তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঁকুড়ার সদর ট্রেজারী লুট করবার ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজন মত লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে বাঁকুড়ার সদর ট্রেজারী বাড়ী আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই সময় কোম্পানীর ফৌজের হাতে বন্দী হয়ে তাঁর সব আশা-ভরসার পরিসমাপ্তি হয়। সেই মর্মান্তিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে, সেই বন্দী অবস্থাতেই ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীর কলিকাতার জেলে মারা যান। বিষ্ণুপুরের নির্বাণপ্রায় ক্ষাত্রশক্তির শেষ দীপশিখা বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে। তখন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপালসিংহদেব শিশু। কিন্তু বয়স্ক কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকার জন্য সেই শিশুকেই বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।

মহারাজ দ্বিতীয় গোপালসিংহদেব। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি দ্বিতীয় আকবরশাহ ও দ্বিতীয় বাহাদুরশাহের সমসাময়িক। পিতা মাধবসিংহদেবের অপরাধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এঁর বৃত্তি বন্ধ বা তার পরিমাণ কম করেননি। এঁর দুই পুত্র। রামকৃষ্ণসিংহদেব ও রামকিশোরসিংহদেব। বিষ্ণুপুর রাজবংশের নরপতিগণের মধ্যে এত দীর্ঘদিন রাজ্য ভোগ কেউ করেননি। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৭ বৎসর কাল ইনি বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেষ জীবনে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণসিংহদেবকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহলোক হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণসিংহদেব। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি

ব্রিটিশ সরকারের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম-সাময়িক। বিষ্ণুপুর রাজবংশের চিরন্তন প্রথামত যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু তবুও পিতা দ্বিতীয় গোপালসিংহদেবের প্রাপ্য বৃত্তি রাজা রামকৃষ্ণসিংহদেব ও কনিষ্ঠ রামকিশোরসিংহদেব উভয়কেই দেওয়া হত। ইনি বিষ্ণুপুরে হিকিমসাহেব নামে পরিচিত। বয়সে কনিষ্ঠ হলেও, বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের ইনি একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামের শ্যামচাঁদ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি। এই শ্যামচাঁদ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দিরই বিষ্ণুপুর রাজবংশের শেষ বিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা।

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বশূন্যভাবে প্রজাপালন প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের যে জনপ্রিয়তা ছিল, এই হিকিমসাহেব রামকিশোরসিংহদেব মশায়ের সময়ে তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ঐ রাধামোহনপুর মহল নিয়ে সে সময়ের এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সেই জমিদার বিরাট এক বাহিনী নিয়ে ঐ রাধামোহনপুর মহল থেকে হিকিমসাহেব মশায়কে বেদখল করতে আসেন। কিন্তু তা কাজে পরিণত হওয়া দূরে থাক, সে আশা তাঁর আকাশ কুসুমে পরিণত হয়।

কারণ হিকিমসাহেব মশায়কে ঐ মহল থেকে বেদখল করবার সংবাদ অবগত হয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ঐ রাধামোহনপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এতলোক সেখানে এসে হাজির হয়, যার ফলে তাঁর আদেশে প্রত্যেকে দু-চার গাছি করে ধান কেটে নিয়ে উধাও-হওয়ায় সেই বিবাদী জমির ধান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর দাঙ্গাতেও খুন-জখম হয়ে সেই জমিদারকে হটতে বাধ্য হতে হয়।

মহারাজ রামকৃষ্ণসিংহদেব অপুত্রক ছিলেন। চন্দ্রকুমারী নামে তাঁর এক কন্যা ছিলেন। তিনি ঘাটশিলা রাজ্যের মহারাণী হয়েছিলেন। তিনি এমন তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর ঘাটশিলা রাজ্যের সব কিছুর অধীশ্বরী হয়ে ব্রিটিশ সরকারের মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজশক্তিকে রক্ত চক্ষু দেখাতেও দ্বিধা করতেন না।

হিকিমসাহেব রামকিশোর সিংহদেবের এক পুত্র ছিলেন। নাম তাঁর মনমোহনসিংহদেব। কিন্তু তবুও বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অন্য ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করতে হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজের অভিষেকের সময় আমন্ত্রিত হয়ে ফেরবার পথে দামোদর নদের তীরবর্তী পানাগড় নামক স্থানে বিসূচিকা রোগে

আক্রান্ত হয়ে মনমোহন সিংহদেব মারা যান। বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের সব ভরসার পরিসমাপ্তি হয়। সেই মর্মান্তিক আঘাতে, শোকে, হতাশায় পাগলের মত হয়ে যান তাঁরা।

সব চাইতে বেশী আঘাত পান রামবিশোর সিংহদেব। তার ফলে সেই সূত্র নিয়ে কিছু দিনের মধ্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান তিনি। আর তার মাত্র দু বৎসরের ব্যবধানে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণসিংহদেবও পরলোক গমন করেন।

এই রামকৃষ্ণসিংহদেবের সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ীদেবী—বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী দর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে, পরমহংসদেব ভক্তদের বলছেন, "আমি একবার বিষ্ণুপুর গিয়েছিলুম। রাজার বেশ ঠাকুরবাড়ী আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুর বাড়ীর কাছে দীঘি আছে। কৃষ্ণ বাঁধ, লালবাঁধ। আচ্ছা দীঘিতে আবাটার গন্ধ কেন পেলুম বল দেখি? আমি ত জানতুম না যে মেয়েরা মৃন্ময়ী দর্শনের সময় আবাটা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হল, কোমর পর্যন্ত।"

আর শ্রীমৎস্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গের দ্বিতীয় ভাগে আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাসারদামণিদেবীকে বলছেন, "বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন অতি পবিত্র স্থান! সারদা, তুমি একবার বিষ্ণুপুর দেখিয়া আসিবে।"

স্বামীর সেই নির্দেশ, অথবা নিজের ইচ্ছাতেই হোক, শ্রীমাসারদামণিদেবী ভক্ত সুরেশ্বর সেনমশায়ের বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে বহুবার এসেছেন। জয়রামবাটি, কামারপুকুর থেকে পালকীতে করে তাঁকে নিয়ে আসা হত। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব ও শ্রীমাসারদামণিদেবী, এঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মল্লভূমের অধিবাসী। মল্লভূম এঁদের ধাত্রী, জন্মদাত্রী হিসাবে ধন্যা।

বিষ্ণুপুর গড়দরজা মহল্লার অধিবাসী সুরেশ্বর সেনমশায় ছিলেন শ্রীমাসারদা-মণিদেবীর মহাভক্ত শিষ্য। তাই শ্রীমা মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে আসতেন। জয়রামবাটি, কামারপুকুর থেকে পালকীতে করে তিনি যাতায়াত করতেন। সেই সময় তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, উক্ত বাড়ীতে তাঁর সংরক্ষিত কীর্তির মত করে রেখে ওখানে কোন স্থায়ী শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য।

কিন্তু সুরেশ্বর সেনমশায় তার কিছু ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। তাঁর

পুত্র বশীশ্বর সেনমশায় ছিলেন বিষ্ণুপুরের একজন কৃতী সন্তান। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। উদ্ভিদবিদ্যায় ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। শ্রীমার নির্দেশ পালনের আগ্রহ ছিল তাঁর খুবই বেশী। কিন্তু তার জন্য বিশ হাজারের বেশী অর্থ তিনি সংগ্রহ করে যেতে পারেননি। বিবাহ করেছিলেন তিনি গাইড এমারসেন নামে এক আমেরিকান মহিলাকে। তিনি স্বামীর অসম্পূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার কাজ আরও কিছু এগিয়ে দিয়ে যান। বর্তমানে তাঁদের সে ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। 'সারদামণি শিশুশিক্ষা আশ্রম' নামে সেখানে এক শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হয়েছে। আর সুরেশ্বর সেনমশায়ের বাড়ী, যেখানে এসে শ্রীমা থাকতেন; গোঁসাই পুকুর নামে সেখানের ক্ষুদ্র এক জলাশয়—শ্রীমা বিষ্ণুপুরে এসে সেখানে স্নানাদি করতেন, যার জল শ্রীমার পবিত্র স্নানজল হিসেবে এখনও তাঁর ভক্ত সন্তান-সন্ততিরা দিল্লী, আলমোড়া প্রভৃতি দূর দূরান্তরে নিয়ে যায় ও সেই বাড়ী ও জলাশয়কে সংরক্ষিত কীর্তির মত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখা হয়েছে।

এঁরা ব্যতীত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি খ্যাত-অখ্যাত বহু সাধক বিষ্ণুপুরে এসেছেন।

আমার পিতৃদেব মাখনলাল কর্মকারের কাছে শুনেছি, তাঁর নিজের দেখা এখানে একবার এক অখ্যাত নাম-না-জানা উলঙ্গ পরমহংস এসেছিলেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা শুনলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। তাঁকে খাইয়ে দিলে তিনি খেতেন, পরিয়ে দিলে পরতেন। কিন্তু সে কাপড় খুলে পড়ে গেলে, নিজে কুড়িয়ে আর তা পরতেন না। খাবার ব্যাপারেও ছিল ঠিক তাই। যে কোন জাতি যে ভাবেই হোক যে খাবার তাঁকে খাইয়ে দিত তিনি তাই অম্লানবদনে খেতেন। তাতে তাঁর কোন বিকারও ছিল না, আর কোন ক্ষতিও হত না। এখানের এক দুর্বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্যে তাঁকে এক পোড়ামাটির পাত্রে প্রায় দুকেজির মত পানে খাবার চুন খাইয়ে দিয়েছিল। পানের সঙ্গে খাবার সময় যার একটু বেশী হয়ে গেলে মুখের ভেতর পুড়ে গিয়ে সেখানে ক্ষত হয়ে যায়। সেই মত ক্ষতিকারক বস্তু ঐ মত অধিক পরিমাণে খেয়েও কোন ক্ষতি তাঁর হয়নি। এবং ঐ মত আরও বহু আশ্চর্যজনক কাজ তিনি করতেন, সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যার কোন কূল কিনারাও পেত না। বহু চেষ্টা করেও কেউ তাঁকে কথা বলাতে বা এক জায়গায় আটকে রাখতে পারত না। এ কিংবদন্তী নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সরোবর লালবাঁধের উত্তর তীরবর্তী তার পাড়ের ওপর অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিজয় যোগাশ্রম, উক্তসরোবরেরই পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলাদেবী ও তাঁর শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম তাঁর শ্রীমন্দির, তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শ্রীমা-সারদামণিদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের অতি মনোরম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঐ দুই আশ্রমেই নিয়মিতভাবে শাস্ত্রপাঠ, নামসংকীর্তন ও সময় বিশেষে উৎসবাদি হয়ে থাকে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণসিংহদেবের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী মহারাণী ধ্বজামণিদেবী, কর্মচারি নীলমাধব সেনগুপ্ত ও সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। তারপর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চৈতন্যসিংহদেবের দ্বিতীয় পুত্র নিমাইসিংহদেবের বংশের সন্তান, কুচিয়াকোলের নীলমণিসিংহদেবকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

মহারাজ নীলমণিসিংহদেব। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এঁর অভিষেক হয়। ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সম-সাময়িক। এঁর অভিষেকে বিষ্ণুপুরের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হয়। কিন্তু তাঁর ভেতরের গোলযোগ-বৈষয়িক বিপর্যয় বাড়তেই থাকে। ভগবান যখন বিরূপ হন, ভাঙ্গন যখন ধরে, তখন সেখানে সৃজনী প্রতিভা নিয়ে কেউ আসে না। আসে ধ্বংসের দুর্মতি নিয়ে। তাই বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার সেই চরম দুর্দিনে যে যেখান থেকে এসেছে সব ধ্বংসের দুর্মতি নিয়ে। রাজা নীলমণিসিংহদেবও তারই প্রতিচ্ছবি। তিনিও বিষ্ণুপুরের উন্নতির স্বপ্ন কোনদিন দেখেন নি। গতানুগতিকভাবে তিনিও ধ্বংসের পথেই এগিয়ে গেছেন। বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের যে সামান্য সম্পদ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল, তাও তাঁর অপরিণামদর্শিতার ফলে চলে গেছে।

ঘোড়ার সখ ছিল তাঁর অত্যধিক। তাই সেই সুযোগে কুখ্যাত গোলক বক্সী ও আনন্দ বক্সী নামে দুব্যক্তি বিরুদ্ধ পক্ষের উৎকোচে বশীভূত হয়ে ঘোড়া খরিদ করবার লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলে যায় হরিহর ছত্রের মেলায় আর সেই সুযোগে, কৃষ্ণ বাঁধ, পোকা বাঁধ প্রভৃতি সাতদফা মূল্যবান সম্পত্তি বিনা বাধায় বর্দ্ধমানের মহারাজা খরিদ করে নেন। পরে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়া ও বাজবৌরী নামে এক পাখী নিয়ে নীলমণিসিংহদেব হরিহরছত্র থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন আর কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু তারপরও যে সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্র তখন পর্যন্ত ছিল, যা নিয়ে মোকদ্দমা করলে বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের বহু সম্পত্তি ফিরে আসতে পারত, বিরুদ্ধপক্ষের উৎকোচ নিয়ে কুখ্যাত সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সমস্ত দলিলপত্র নষ্ট করে দেয়। যার জন্য বিষ্ণুপুর রাজপরিবারকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। মহারাজ নীলমণিসিংহদেব অলস প্রকৃতি ও অপরিণামদর্শী হলেও ক্ষত্রিয়ের উপযোগী শৌর্য তাঁর ছিল। তাঁর কার্যকলাপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর রাজদরবারের শারদীয়া দুর্গোৎসবের তোপের ব্যাপার নিয়ে সেই সময়ের এক মহকুমা শাসকের খামখেয়ালিতে বাধে এক বিপর্যয়।

বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর দুর্গোৎসব খুবই এক বড় অনুষ্ঠান, বিস্তৃত ব্যাপার। তাই তার সবকিছু উল্লেখ না করে যা নিয়ে বিপর্যয় হয়েছিল শুধুমাত্র মহাষ্টমীর সেই তোপের কথাই এখানে উল্লেখ করলাম।

বিষ্ণুপুর গড়ের সংলগ্ন মূর্চার পাড়ের ওপর স্থাপিত কামানের তোপধ্বনি শুনে ও অগ্নিশিখা দেখে মল্লভূমের অধিবাসীরা শারদীয়া মহাপূজার সন্ধিক্ষণ পালন করে থাকেন। সে এক অপরূপ, অনির্বচনীয় বস্তু। মহাপূজার সন্ধি বলিদানের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বের থেকে ভক্তিপ্রাণ হিন্দু নর-নারী এক অপূর্ব ভাব নিয়ে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ নির্দেশক তোপধ্বনি শোনার জন্য। তারপর যথাসময়ে রাজা আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মূর্চার পাড়ের ওপর গর্জে ওঠে কামান। সেই তোপধ্বনি শুনে পূজারীরা সন্ধিক্ষণ পালন করেন। আর সমবেত নর-নারী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মা মা বলে চিৎকার করে ওঠে। সেই সময় ভক্তিপ্রাণ নরনারী মাত্রের অন্তর এক অপূর্ব ভাবে ভরে ওঠে. সেই ভাবের আবেগে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখা যায় সারা বিশ্বভরে মহিষমর্দিনী মায়ের মহিমাময়ী মূর্তি। সেই সময় দেবীর কাছে দেওয়া ঘৃত ও তৈলের প্রদীপ দ্বিগুণ তেজে জলে ওঠে। আর দিক দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে এক অভিনব শব্দ উত্থিত হয়। এখানের চলতি ভাষায় বলা হয় তাকে 'মল্লের রা'।

আর সেই সময়ের বিচার-বিবেকহীন মহকুমা শাসক সেই তোপ বন্ধ করবার আদেশ জারি করেন। তখন ব্রিটিশ সরকারের অখণ্ড প্রতাপ। সারা ভারতবর্ষ তাদের ভয়ে কম্পমান! তাই সেই সর্বনাশা আদেশ শুনে চিন্তিত হয়ে ওঠেন সকলেই। কিন্তু রাজা নীলমণিসিংহদেব তাতে ভয় পান না। তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটুট থাকেন। তোপ সাজাবার জন্য যথাসময়ে তাঁর

গোলন্দাজদের আদেশ দেন। আর তার সঙ্গে হুকুম দেন, তাতে প্রতিবন্ধকতা কেউ করলে তাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবার জন্য।

আর গোলন্দাজেরাও তাঁর সেই আদেশের ব্যতিক্রম করে না। মূর্চার পাড়ের ওপর তোপ সাজিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তারা দ্বিতীয় আদেশের জন্য।

সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মূর্চার পাড় ও তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত জায়গা পুলিশবাহিনীতে ভরে যায়। সমস্ত বিষ্ণুপুর রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাকে তার ভয়াবহ পরিণতির জন্য।

কিন্তু রাজা নীলমণিসিংহদেব থাকেন তাঁর সঙ্কল্পে অবিচল। যথা সময়ে গোলন্দাজদের তিনি আদেশ দেন। তারা তোপে আগুন দেয়। গর্জে ওঠে ভয়াল কামান। সন্ত্রস্ত পুলিশ বাহিনী প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে দিগ্বিদিকে।

তারপর ভারতীয় দণ্ডবিধির দোহাই নিয়ে রাজা নীলমণিসিংহদেবকে অভিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের আদালতে শুরু হয় তাঁর বিচার।

কিন্তু তাতেও জয় হয় নীলমণিসিংহদেবেরই। শুধু মহাষ্টমীর তোপই নয়, আরও বহু ব্যাপারের বহু তোপের ছাড়পত্র লিখে দেন ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হয়ে একমাত্র পুত্র যুবরাজ রামচন্দ্র সিংহদেবকে রেখে কলিকাতার পটলডাঙ্গা হাসপাতালে তিনি মারা যান।

মহারাজ রামকৃষ্ণসিংহদেবের দ্বিতীয়া পত্নী প্রসন্নময়ী ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা পেতেন। কিন্তু রাজা নীলমণি-সিংহদেব ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছুই পেতেন না। তবে তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর পত্নী মহারাণী চূড়ামণিদেবী ও পুত্র যুবরাজ রামচন্দ্রসিংহদেব মাসিক পঁচিশ টাকা করে মাসোহারা পেতেন।

যুবরাজ রামচন্দ্রসিংহদেব। তিনি ছিলেন রামচন্দ্রের মতই সুদর্শন দীর্ঘ দেহধারী কান্তিমান কিশোর। তিনি বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেই কিশোর বয়সেই তাঁর যে অসাধারণ শক্তির কথা তাঁর সহপাঠী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে শুনেছি তা খুবই বিস্ময়কর। তার দুই একটা এখানে আমি দিলাম।

বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর সামনে এক কামরাঙ্গা গাছের নীচে এক ভাঙ্গা কামানের গোড়ার দিকে প্রায় আধখানা পড়ে থাকত। যার ওজন পাঁচ ছয় মণের কম নয়। বর্তমানকালের প্রায় দু কুইণ্টালের ওপর হবে। সেই কামানখণ্ডকে লোহার তার দিয়ে বেঁধে, সেই কিশোর বয়সেই অবলীলাক্রমে তিনি তুলে দিতেন। প্রকাণ্ড মোটা লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত পাকা বেউড়

বাঁশের লাঠির একটা দিক মাটি বা কোন শক্ত দেওয়ালে লাগিয়ে এক হাতের কব্জির জোরে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দিতেন, যা সেকালের বহু বড় বড় পালোয়ানেরাও পারত না। অসীম শক্তি, অপরূপ রূপ প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই রাজোচিত লক্ষণ ছিল তাঁর অপরিমিত।

তাঁর জীবিতকালে রাজদরবারের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত রাধালাল জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে একবার এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি তাঁর সেই রাজোচিত লক্ষণাদি দেখে বলেছিলেন, হাঁ বেটা তুই পারবি। তুই যদি আমার কথামত কাজ করিস তাহলে তুই পারবি তোদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। আমি যোগবলে দেখতে পাচ্ছি তোদের এই দুরবস্থার কারণ তোদের কুলদেবী মৃন্ময়ীমায়ের বিরূপতা। তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে, তোদের সব কিছু আবার ফিরে আসবে। আর তার জন্য এক সময় নির্দিষ্ট করে তিনি বলেছিলেন, ঐ সময়ে মৃন্ময়ী মন্দিরে গিয়ে এক মনে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে আমার দেওয়া মন্ত্র জপ করতে হবে। তার ফলে দেখবি এক অপরূপ কান্তি নারী তোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সময় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তোদের দুরবস্থার প্রতিকারের প্রার্থনা জানাতে হবে। তাঁর কৃপা হলে তোদের সবকিছু আবার ফিরে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে সাধনার সময়-সুযোগ তাঁর আসে না। তার পূর্বেই মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সকলের সব আশা ভরসার পরিসমাপ্তি করে তাঁকে পরলোকের পথে চলে যেতে হয়।

সেই দারুণ আঘাত সকলেরই বুকে বাজে বজ্রের মত। সারা বিষ্ণুপুর হয়ে পড়ে শোকমগ্ন। হায় হায় করতে থাকেন সকলেই। আর মহারাণী চূড়ামণিদেবী হয়ে পড়েন প্রায় উন্মাদিনীর মত।

মহারাণী চূড়ামণিদেবী ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। মহারাণী চূড়ামণিদেবী সেই অসহনীয় আঘাত সহ্য করতে না পেরে সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে এক অজ্ঞাতস্থানে বাস করতে থাকেন। দিন গত হতে থাকে তাঁর জীবন্মৃত অবস্থায়। ভগবানের কাছে অহরহ মৃত্যু প্রার্থনা করতে থাকেন তিনি। কিন্তু বেশী দিন সে অবস্থায় থাকা তাঁর সম্ভব হয় না। হঠাৎ করে বিষ্ণুপুরের বুকে এক সর্বনাশের উদয় হয়।

সেই বৎসর ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্র পূজা ও মুসলমানদের মহরম পর্ব একদিনেই অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে বিষ্ণুপুরে জনসমাগম হয় সেদিন অপরিমিত। বিষ্ণুপুরের পথ ঘাট উৎসবমত্ত জনতায় হয়ে ওঠে পূর্ণ। সেই সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান যুবকের হঠকারিতায় হয় এক প্রচণ্ড বিপর্যয়।

ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্রপূজা বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের এক বিশিষ্ট উৎসব। মল্লভূমবাসী সাঁওতাল নরনারীরও তাই। তারজন্য সেই উৎসব উপলক্ষে সেদিন বহুদূর থেকে বহু সাঁওতাল ও হিন্দু নর-নারী সেদিন বিষ্ণুপুরে সমবেত হয়। তার ওপর একই দিনে মহরম পর্ব হওয়ায় সেদিন বিষ্ণুপুরে জনসমাগম হয় অপরিমিত।

সেই অবস্থায় রাজদরবার থেকে রাজপুরোহিত অমূল্য মহাপাত্র ও বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের কুলদেবতা অনন্তদেব শালগ্রামশিলা যেখানে ইন্দপর্ব অনুষ্ঠিত হয় সেই ইন্দ তলায় যাবার সময়, মহরম পর্বের উৎসবমত্ত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। মুসলমানদের লাঠির আঘাতে অনন্তদেবের ছাতা ভেঙ্গে যায়। রাজপুরোহিতের ওপরও লাঠির আঘাত পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে সংবাদ দেওয়া হয়। আর বিষ্ণুপুরেও বিদ্যুৎগতিতে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তেজিত সাঁওতাল ও হিন্দু জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন রাজদরবারের আদেশের প্রতীক্ষায়। কিন্তু সেখান থেকে আদেশ আসে তার বিপরীত। মহারাণী চূড়ামণিদেবীর নাম দিয়ে সকলকে অনুরোধ করা হয়, কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করে সকলকে শান্তভাবে ঘরে ফিরে যাবার জন্য।

তাই হয়। মনের ক্রোধ মনে চেপে সকলে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু সেই তিক্ত স্মৃতি কারও মন থেকে মুছে যায় না। সমস্ত বিষ্ণুপুরের বুকে জেগে থাকে এক তীব্র অসন্তোষ। তাই মহারাণী চূড়ামণিদেবী তাঁর অজ্ঞাতবাসের স্থান থেকে ফিরে আসেন। এবং দিন স্থির করে সমস্ত প্রজাদের তিনি আহ্বান করেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে গিয়ে সমবেত হন তারা। বিরাট জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে মহারাণীর আদেশ শোনবার জন্য। অনেকের মনে অনেক বিরূপ কল্পনার উদয় হয়। কিন্তু তার কিছুই হয় না।

যথাসময়ে মহারাণী চূড়ামণিদেবী যবনিকার অন্তরাল হতে প্রজাদের উদ্দেশে বলেন, "বাবা, হিন্দু-মুসলমান জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মল্লভূমের সব প্রজাই বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কাছে সন্তানরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের ওপর বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই সেই সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তোমরা পরস্পরের কাছে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু মায়ের সব সন্তান, ভাইয়ের সব ভাই সমান হয় না। কেউ থাকে শিষ্ট, কেউ থাকে দুষ্ট, কেউ থাকে জ্ঞানী, কেউ থাকে অজ্ঞান। সেই মত আমার মুসলমান সন্তানেরা ভুলবশত যে অন্যায় সেদিন করেছে, তার

জন্য তোমাদের উত্তেজিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সেই উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তোমরাও যদি তাদের মত ভুল কর, তাহলে তোমরাও সেই অন্যায়কারী বলেই গণ্য হবে। আর বিদ্বেষ বেড়ে সকলেরই জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠবে। তাই আমি তা করতে নিষেধ করছি। আমার মুসলমান সন্তানদের সেদিনের সেই ভুলের জন্য মা-আমি, তাদের হয়ে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার অনুরোধ, সেদিনের সেই দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যে ভালবাসা নিয়ে এতকাল মল্লভূমের বুকে বাস করে আসছে, এখনও তার ব্যতিক্রম কর না। আর আমার মুসলমান সন্তানদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন আর কোনদিনের জন্য ভাই হয়ে ভাইয়ের মনে আঘাত দেবার মত কোন কাজ না করে।"

ফল হয় তাতে আশাতীত। অসন্তোষের কালোছায়া সকলের মন হতে মুছে যায়। মহিমাময়ী মহারাণীর জয়গান করতে করতে সবাই ফিরে যায়।

রাজকার্য চলতে থাকে সেই মত ভাবে। তারপর অন্যব্যবস্থা করবার সঙ্কল্প করা হয়। তখনও বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের যা অবশিষ্ট ছিল, তা পত্তনি দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তারজন্য কেহ কেহ আসতেও থাকেন। তার মধ্যে কলিকাতার বিখ্যাত চর্ম ব্যবসায়ী আরিফ কাশিম অন্যতম। তাঁরা বিষ্ণুপুর রাজষ্টেটের সমস্ত কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করে দেখে বলেন, আমরা সমস্ত হারানো সম্পত্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব। আর তার দখল নেব আমরা জোর করে। তারপর চলবে যে মোকদ্দমা, তাতে আইন আমাদের স্বপক্ষে। আর তার জন্য জয় আমাদের নিশ্চিত। কিন্তু তাতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। কিন্তু রাজকোষ বলতে বিষ্ণুপুরের তখন কিছুই নেই। তাই তা সংগ্রহ করবার পরামর্শ দেন তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে।

কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজপরিবার প্রজাদের ওপর কোন চাপ দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই তাঁদের সে আবেদন নামঞ্জুর করে দেন তাঁরা।

তারপর কলিকাতারই আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হরিপদ মৈত্র, আনন্দকৃষ্ণের নামে বিষ্ণুপুর রাজষ্টেট পত্তনি নেন। কিছুদিন সেইভাবে চলে। তারপর বাঁকুড়ার সূর্য্যনারায়ণ রক্ষিত, আনন্দকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁর অধীনে ইজারা নেন এবং পরে তাঁর পত্নী জ্ঞানদাবালা রক্ষিতের নামে আনন্দকৃষ্ণের মূল পত্তনির স্বত্ত্ব গ্রহণ করেন। সেইভাবে প্রায় এগার বৎসরকাল গত হয়।

তারপর মহারাজ রামকৃষ্ণদেবের কনিষ্ঠ রামকিশোরসিংহদেব মশায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কালীপদসিংহঠাকুর মশায়কে বিষ্ণুপুরের রাজপাটে অধিষ্ঠিত করা হয়।

শ্রীশ্রীরাজা কালিপদসিংহঠাকুর। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ ও ১২৩৬ মল্লাব্দে এঁর অভিষেক হয়। বর্তমানে ইঁনিই বিষ্ণুপুরের মহামান্য রাজাবাহাদুর। এঁর সময়ে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ ও বাংলা ১৩৬৬ সালের শারদীয়া মহাপূজার সময় ঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তা উল্লেখ করলাম।

পূর্বেই উল্লিখিত আছে বিষ্ণুপুর রাজদরবারের তোপধ্বনি শুনে ও অগ্নিশিখা দেখে মল্লভূমবাসী মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ পালন করে থাকেন। সেইজন্য উক্ত মহাষ্টমীর তোপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। আর সেই তোপ সাজান, তাতে আগুন দেওয়া প্রভৃতি সব কিছু কাজ করে বিষ্ণুপুর হতে আট মাইল দূরবর্তী তীরবঁক নামক গ্রামের মহাদণ্ড উপাধিধারী মাডড় নামে এক জাতি। তারাই চিরকাল তোপ দেওয়ার কাজ করে। ১৩৬৫ সালের মহাপূজাতেও করালী মহাদণ্ড উক্ত তোপ দেওয়ার কাজ করে যায়। কিন্তু সেই বৎসরই চৈত্র মাসে করালী মারা যাওয়ায় আর কেউ ও-কাজ করতে এগিয়ে আসে না। ১৩৬৬ সালের মহাপূজার সময় 'ও কাজ আমরা আর কেউ পারব না' বলে, রাজাবাহাদুরের কাছে তাদের আর্জি তারা পেশ করে যায়। তাই রাজাবাহাদুর নিজে এবং মহাপূজার উদ্যোগী আরও সব ব্যক্তি তার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কেহ কেহ যুঝঘাটি নামে বিষ্ণুপুরের উত্তরগড় ঘাটির মুসলমান তোপদারদের কথা বলেন। কিন্তু মহা-পূজার মহাষ্টমীর তোপ বলে অনেকেই তাতে আপত্তি করেন। তাই নিরুপায় হয়ে, যাঁর কাজ তিনিই এর উপায় করবেন বলে, হতাশ হয়ে বসে থাকেন সকলে।

আর তারপরই ঘটে সেই অভাবনীয় ঘটনা। দ্বারকেশ্বর নদের অপর পারে, বিষ্ণুপুর হতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্তী আমড়াশোল নামক এক গ্রামে, মহাদণ্ডদের এক পরিবার কিছুদিন যাবত বাস করছিল। রাজাবাহাদুর বা মহা-পূজায় উদ্যোগী কোন ব্যক্তিই তা জানতেন না। তাই তীরবঁক গ্রামের মহাদণ্ডরা জবাব দেওয়ায় তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করে হতাশ হয়ে তাঁরা বসে-ছিলেন। সেই অবস্থায় ঘটে সেই অভাবনীয় ঘটনা। ২১শে আশ্বিন মহাপূজা। ১৯শে আশ্বিন সেই গ্রামে বসবাসকারী যমুনাদাস মহাদণ্ড তার নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত এক ক্ষেতে ক্ষেতমজুরের কাজ করছিল। দুপুরবেলা, সঙ্গীরা সব স্নানাহারের জন্য চলে যায়, যমুনাদাসও যাবার উদ্যোগ করে। এমন সময় কোথা থেকে এক অপরিচিতা পাগলী এসে বলে, "হ্যাঁরে, তোরা থাকতে বিষ্ণুপুরের রাজার মহাষ্টমীর তোপ বন্ধ হয়ে যাবে? এখনই চল্, এখনই তোকে বিষ্ণুপুর রওনা হতে হবে।"

কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকদিন যাবত প্রবল বৃষ্টির জন্য নদীতে তখন ভীষণ বন্যা। পারাপার প্রায় বন্ধ। তাই যমুনাদাস নদীর রুদ্র রূপ দেখিয়ে সেই কথা জানায়। বলে ঐ প্রবল বন্যায় নদী পার হয়ে যাব কেমন করে?

তখন নদীর বুকে সেই পাগলী তাকে নৌকা দেখিয়ে দেয়। যমুনাদাস কেমন যেন অভিভূতের মত হয়ে যায়। আর কোন ওজর আপত্তি না করে বিষ্ণুপুর রওনা হবার জন্য তৎপর সে বাড়ীতে গিয়ে তৈরী হয়ে আসে। কিন্তু সে পাগলী বা তার দেখান নৌকা কিছুই সে দেখতে পায় না। কিন্তু তারজন্য কোন দ্বিধা না করে আরও দূরে গিয়ে নৌকায় চড়ে নদী পার হয়ে তীরবঁক গ্রামে গিয়ে সে হাজির হয়। তার আত্মীয় স্বজনদের সেই কথা পরিচয় দেয়। সবকিছু শুনে তারাও সব যেন কেমন হয়ে যায়। সেই রাতে ঘুম তাদের আর হয় না! সেখানের মহাদণ্ডদের প্রতিনিধি স্থানীয় গোষ্ঠ মহাদণ্ড সেই যমুনাদাসকে নিয়ে শেষ রাতে বের হয়ে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে এসে হাজির হয়। যমুনাদাস মৃন্ময়ী মায়ের শ্রীমন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে। আর গোষ্ঠ মহাদণ্ড রাজা-বাহাদুরের কাছে গিয়ে সব কথা পরিচয় দেয়। বলে "বাবা, মায়ের কাছে আমরা মহা অপরাধ করেছি। আর কোন দিনের জন্য আমরা ওকথা বলব না। আমাদের মহাদণ্ডবংশ যতদিন থাকবে, আমরা যেমন করে হোক, মায়ের মহা-পূজার কাজ সমাধা করে যাব।"

কারণ তাদের ও অন্যান্য বহু ব্যক্তির ধারণা, স্বয়ং মৃণ্ময়ীদেবীই সেই অপরিচিতা পাগলী। তিনিই তাঁর তোপের সমস্যার সমাধান করেছেন, নৈলে, রাজাবাহাদুর ও মহাপূজায় উদ্যোগী অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত যে কথা আর কেউ জানে না, সেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই দূরবর্তী গ্রামের এক অপরিচিতা পাগলী তা জানলে কেমন করে? আর সেই সমস্যা সমাধানের চিন্তাই বা তার মনে উদয় হল কেমন করে? আর সে উধাও হলই বা কোথায়?—যার জন্য তার কোন সংবাদই আর পাওয়া গেল না? হৃতবীর্য, হৃতসর্বস্ব আজ বিষ্ণুপুর! তন্দ্রাতুর বিষ্ণুপুরবাসী ভুলতে বসেছে তাদের অতীতের ঐতিহ্যকে। কিন্তু মৃণ্ময়ীদেবী ভোলেননি তাঁর অধিষ্ঠান ভূমিকে। তাঁর বহু কার্যকলাপে বেশ বোঝা যায়, এখনও সদাজাগ্রতা প্রহরিণীর মত অহরহ তিনি বিরাজ করছেন তাঁর শ্রীমন্দিরে। জানিনা, কতদিনে তাঁর কৃপা হবে। মানব কল্যাণে বিষ্ণুপুরের অপরূপ অবদানের কথা প্রচারিত হয়ে, পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে তার পথ প্রদর্শনে সাহায্য করবে। কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোষিত হবে বিষ্ণুপুর তথা বাংলা ও বাঙ্গালীর জয়গান।

উপসংহার

বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রনীতি, শাসনতন্ত্র, রাজস্ব বিভাগ রাজ্যের রক্ষা ব্যবস্থা, বিচার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম, দান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, উৎসব, কামান, মন্দির, বাঁধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কাহিনী।

বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রনীতি

'অধর্মেন রাজন্তী যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'।—এই পরম সত্যকে আশ্রয় করেই এখানের সব কিছু পরিচালিত হয়ে এসেছে। ধর্মই ছিল এঁদের মর্ম। কিন্তু সে ধর্মের মধ্যে অন্ধতা বা সঙ্কীর্ণতা কিছু ছিল না। সে ছিল সত্যকার মানবধর্ম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' পরম বাস্তব, এই মহান সত্যকে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সকল ধর্ম, সকল জাতির ওপর শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের সমান। তাঁরা জানতেন, পানি আর জল যেমন একই বস্তু, বিভিন্ন নামে প্রত্যেক ধর্মের উপাস্যও সেইমত একই বস্তু। সেই পরম পিতা পরমেশ্বর। তাই সারা মল্লভূমে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্মকে তাঁরা সমান ভাবে সমর্থন করে গেছেন, সমান সুযোগ-সুবিধা দান করে গেছেন। হিন্দু দেব-দেবীদের জন্য যেমন তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে গেছেন, মুসলমান পীর-পয়গম্বরদের জন্যও সেইমত দান করে গেছেন পীরোত্তর সম্পত্তি। হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জ্ঞানী গুণীরা যেমন শ্রদ্ধা সমাদর পেয়ে এসেছেন, মুসলমান পীর-ফকিরেরাও তাঁদের কাছে সেইমতভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছে। এবং আরও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁদের কাছে পেয়েছেন ঠিক ঐ একই মত ব্যবহার।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, রাজসরকারে চাকুরীদান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ঐ একই নীতির তাঁরা অনুসরণ করে গেছেন। সেখানেও কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষকে প্রশ্রয় বা প্রাধান্য তাঁরা দেননি। যোগ্যতা মত প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী সেখানে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন। যদিও রাজনীতি সংসারের সব চাইতে কুটিল ও জটিল বস্তু, তবুও সকল ক্ষেত্রে সরলতাই ছিল

তাঁদের নীতি। কেবল মাত্র পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ বিগ্রহাদির ব্যাপারে প্রয়োজন অপরিহার্য হলে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতি বাক্যকে তাঁরা অনুসরণ করেছেন।

তাঁদের আর এক মহৎ গুণ ছিল, কোন বিষয়ে হঠকারিতা বা গোয়াতুর্মী করে রাজ্য বা রাজ্যবাসীদের তাঁরা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেননি। সকল ক্ষেত্রে ধীর স্থিরভাবে বিচার করে তাঁরা কর্তব্য স্থির করে গেছেন। আর তার জন্যই সকল ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন।

ভারতে হিন্দু আধিপত্যের অবসান হওয়ার পর এখানে প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে প্রধানত তিন শক্তির! প্রথম পাঠান, তারপর মুঘল বা মোগল, সর্বশেষ ব্রিটিশ জাতির। আর প্রয়োজন মত সেই তিন শক্তির সঙ্গেই সখ্যতা অটুট রেখে বিষ্ণুপুরের অধিপতিগণ তাঁদের রাজ্য পরিচালনা করে গেছেন। আর তার জন্যই দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরে কত রাজশক্তির উত্থান-পতন, কত রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছেন। তারপর ধরেছে ভাঙ্গন। কিন্তু তা তাঁদের রাষ্ট্রনীতির কোন ভুল ত্রুটির জন্য নয়, তার প্রধান কারণ সর্বনাশা গৃহ বিবাদ। কিন্তু তাতেও এই অবস্থা আসত না, যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের জঘন্য অর্থ লালসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য এই আদর্শ রাজ্যকে তাদের অর্থ লোলুপতার যূপকাষ্ঠে ওরূপ নির্মমভাবে বলি না দিত।

শাসনতন্ত্র

বিষ্ণুপুরের শাসনতন্ত্র নামে রাজতান্ত্রিক হলেও আসলে তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল। স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্তিত ছিল পরিপূর্ণভাবে। সমস্ত রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। আব সেই ভাগ করা প্রত্যেক অংশ এক একজন সামন্ত শাসন করতেন। সেখানের রাজস্ব বিভাগ, এমনকি সৈন্য বিভাগ পর্যন্ত আবশ্যকীয় সব কিছুই তাঁদের নিজের অধীনে ছিল। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজার আদেশ ব্যতীত কিছু করবার অধিকার তাঁদের ছিল না। তাঁদের নিজেদের অধীনে দুর্গ, সৈন্য, অস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই ছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে, কেন্দ্রের প্রয়োজন মত সৈন্য, অস্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই তাঁদের সাহায্য করতে হত। আর কোন জরুরী প্রয়োজন ও রাজার অভিষেকের সময় তাঁদের বিষ্ণুপুরে আসতে হত। এবং সেই অভিষেক নূতন রাজা হবার সময় ব্যতীতও, প্রত্যেক বৎসর পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রে অভিষেক উৎসব হত। তাই তাকে পুষ্যা অভিষেক বলা হয়। তাঁদের আদি কুল দেবতা

অনন্তদেব শালগ্রাম শিলাকে শাস্ত্রীয় বিধান মতে স্নান করিয়ে সেই জলে স্নান করে রাজা দরবারে বসতেন।

ঐদিন সারা মল্লভূমের সমস্ত সামন্ত রাজা বিষ্ণুপুরে আসতেন, রাজাকে ভেট দিতেন, আর তাঁর সঙ্গে দরবারে বসতেন।

বিষ্ণুপুরের অধীনে এইমত অনেকগুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। যেমন — বেত্রগড়, সিমলাপাল, রায়পুর, বগড়ী, ভেলাইডিহা, জামকুড়ি, ধরাপাট, ইন্দাস, ছাতনা, মালিয়াড়া, ভুমনী, চন্দ্রকোনা, গোহাল তোড়, লেগো, গড়মান্দারণ, পুরভুম প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় শাসন ছিল রাজার নিজের হাতে। সেখানের তিনিই ছিলেন সব কিছুর অধিশ্বর। সেখানের অনেকগুলি বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগের এক-জন করে অধ্যক্ষ ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন দেওয়ান, সৈন্য বিভাগের সেনাপতি, ধর্ম ও দান বিভাগের কর্তা ছিলেন মহাপাত্র উপাধিধারী প্রধান পুরোহিত, রাজা নিজে ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিচার বিভাগের নিয়ামক।

প্রকাশ্য দরবারে সপারিষদ রাজা বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের আবেদন নিবেদন শুনে পঞ্চায়েৎ, পত্রধারী, মুখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে বিচার করতেন। ঐ সমস্ত ব্যতীত আবশ্যকীয় সব কিছু কাজ তিনি নিজে দেখতেন এবং কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতেন। বিষ্ণুপুরের নরপতিগণের মধ্যে এমন ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ রাজা ছিলেন, যাঁরা আবশ্যকীয় সব কাজ সুসম্পন্ন করে দিনান্তে আহারাদি করতেন।

সৈন্য ও পুলিশ

শান্তির সময় যাঁরা শান্তিরক্ষার কাজ করতেন—প্রয়োজন হলে যুদ্ধের সময় তাঁরা সৈনিকের কাজও করতেন। আর রাজ্যের নৈতিক মান উন্নত থাকার জন্য পুলিশের প্রয়োজন ছিল খুবই কম।

কিন্তু মোগল, পাঠান, মারাঠা প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য সৈনিকের প্রয়োজন ছিল খুবই বেশী। তাই সে কাজে সাহায্যের জন্য রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত ব্যক্তিই যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করতেন। আর প্রয়োজন অপরিহার্য হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের সব কিছু দিয়ে তাঁরা সাহায্য করতেন। তার জন্য যে কোন অবস্থাকে বরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। আর তার জন্য সর্বদা তাঁরা সজাগ থাকতেন। সেই সম্বন্ধে

মল্লভূমে প্রচলিত একটি শ্লোকের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি এখানে দিলাম।

শ্লোক

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানং
শালপত্রে তু ভোজনম্।
শয়নম্ অশ্ব পৃষ্ঠে চ
মল্লভূমে রিয়ং প্রথা ॥

আর এই সমস্ত ব্যতীত হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিরই অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ এমনকি বর্ষাকালে দ্বারকেশ্বর নদে বন্যার সময় নৌকাযোগে জিনিষ আমদানি-রপ্তানীর সময় সেই সমস্ত বাণিজ্য তরী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নৌ সৈন্যও তাঁদের ছিল। কথিত আছে, এক ইঙ্গিতে এঁরা লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন।

রাজ্যের রক্ষা ব্যবস্থা

রাজ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে এঁদের বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত রাজ্য কতকগুলি ঘাঁটিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ঘাঁটির এক এক জন সর্দার ছিলেন। তাঁর অধীনে ঘাটোয়াল, সদীয়াল, তাঁবেদার, দিগর প্রভৃতি বিভিন্ন পদাভিষিক্ত ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের ঘাটোয়াল বাহিনী ছিল খুবই দুর্ধর্ষ ও করিৎ-কর্মা। হুকুম মাত্রই যত বাধা বিপত্তিই হোক সে কাজ তারা সমাধা করত।

তারপর রাজ্যের চারদিকে যে সব সামন্ত নৃপতি ছিলেন, রাজ্য রক্ষার কাজে প্রয়োজন মত তাঁদের সব কিছু দিয়ে তাঁরা সাহায্য করতেন। তারপর বিষ্ণুপুরের নিজস্ব গড়ও কতকগুলি ছিল। যেমন, অসুর গড়, করাসুর গড়, হোম গড়, শ্যামসুন্দর গড়, কৃষ্ণ গড় প্রভৃতি।

সেই সমস্ত গড়ের চারদিকে পরিখা, পরিখা পাড়ের ওপর কামান, দুর্গ মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য ও একজন অধ্যক্ষ থাকতেন।

বিষ্ণুপুর নগরের চারদিক ঘিরে পর পর সাত সারি পরিখা ও প্রত্যেক পরিখা পাহাড়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণ কামান সাজান থাকত। বিষ্ণুপুর নগরের তিন দিকে তিন দরজা ছিল। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বর্তমান রসিকগঞ্জ মহল্লায় বীরদরজাং বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী কালিন্দী বাঁধের নিকট লাল দরজা, বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত কৃষ্ণ বাঁধের কাছে হলদি দরজা ও মূল গড় প্রবেশের মুখে মাট্ দরজা ও বড় পাথর দরজা অবস্থিত—

যার ভগ্নাবশেষ রাজদরবার মহল্লার প্রবেশ পথের মুখে এখনও অবস্থিত। আর ঐ মাট্ দরজা ও বড় পাথর দরজার সামনের পথ ছিল পার্শ্ববর্তী পরিখার সঙ্গে যুক্ত। ওখানে কাঠের সেতু ছিল। সে সেতু প্রয়োজন মত ওঠা-নামা করা যেত।

আর ঐ সমস্ত পরিখা, পরিখার পাড় প্রভৃতি কার্যকরী অবস্থায় রাখবার জন্য বাইশ হাজার সরকারী মজুর ছিল। এখানের চলতি ভাষায় তাদের বলা হত 'মুলকী চাকর'।

আর ছিল রাজ্য রক্ষার কাজে সাহায্যের উদ্দেশে সংকেতে সংবাদ আদান-প্রদান ও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য মল্লভূমের সীমান্ত হতে রাজধানী বিষ্ণুপুর পর্যন্ত প্রায় ৬ মাইল পর পর উঁচু স্তম্ভ। এখানের চলতি ভাষায় তাকে বলা হয় মাচান। এখনও মল্লভূমের স্থানে স্থানে ঐ মাচানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

রাজস্ব বিভাগ

রাজস্ব ব্যাপারে ভূমি রাজস্ব আদায় হত এঁদের খুব কমই। কারণ সমস্ত রাজ্য ভরে বিভিন্ন ব্যাপারে এঁদের নিজস্ব নিষ্কর জমি দেওয়া ছিল অপরিমিত। রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে দেবালয় ও দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের পূজা পার্বণের জন্য নিষ্কর জমি দান, বাইরের থেকে আসা সাধু-মোহান্ত, অতিথি অভ্যাগতদের জন্য সারা রাজ্য ভরে স্থানে স্থানে আশ্রমজাতীয় প্রতিষ্ঠান-অস্থল, তার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর জমিদান, রাজ্যের ব্রাহ্মণ, সজ্জন, জ্ঞানী, গুণীদের জন্য জমিদান প্রভৃতি।

তারপর রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের জন্য দেওয়া অপর্যাপ্ত জমিদারী। যেমন, সৈন্যাধ্যক্ষদের জন্য সেনাপতি মহল; দুর্গরক্ষীদের জন্য মহলবেরা মহল; গোলন্দাজদের জন্য তোপখানা মহল; দুর্গ, পরিখা প্রভৃতি সংস্কারকারীদের জন্য খাটালি মহল; সৈন্যদের বেতন দেওয়া প্রভৃতি কর্মচারীদের জন্য বক্সীমহল, রাজপরিবারের খাবার সরবরাহকারীদের জন্য ছড়িদারী মহল; রাজাদের খাস ভৃত্যদের জন্য সাইগিরদীপেশা মহল; রাজপরিবারের জ্বালানী সংগ্রহকারীদের জন্য কাষ্ঠভাণ্ডার মহল, পালকী বাহকদের জন্য কাহারান মহল, ঘাটোয়ালদের জন্য বিরাট ঘাটোয়ালী মহল প্রভৃতি।

আর এই সমস্ত ব্যতীত রাজবাড়ীর দেওয়ান, মুন্সী, আয়কাত, ভাণ্ডারী, ফৌজদার, কোটাল, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায়, এমনকি নট-নটি পর্যন্ত সকলকেই নিষ্কর জমি দেওয়া ছিল।

অন্যদিক দিয়ে রাজস্ব আদায় হত সামন্তদের কাছ থেকে, প্রজাদের বাস্তু-উদ্বাস্তু থেকে, জঙ্গল মহল থেকে, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। আর কিছু পরিমাণ আদায় হত কৃষকদের কাছ থেকে।

মোটের ওপর যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হত, তাতে বহু ব্যাপারে স্থায়ী ব্যবস্থাও রাজাদের রাজসিক ব্যয় বাহুল্যের আধিক্য না থাকার জন্য অভাব হত না।

স্বায়ত্ব শাসন

স্বায়ত্ব শাসন ব্যাপারে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চায়েৎগণ তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রধান নির্বাচিত করতেন, তাঁকে বলা হত 'শিরোমণি'। তিনি তাঁর সহকর্মী, পঞ্চায়েৎ মুখ্যা প্রভৃতিদের নিয়ে গ্রামের ফৌজদারী, দেওয়ানী সব কিছু বিচারই সম্পন্ন করতেন।

আর নির্দিষ্ট প্রণামী নিয়ে গ্রামের সামাজিক কাজে অনুমতি দিতেন। এবং কোন জটিল ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে না পারলে, রাজ দরবারের সাহায্য গ্রহণ করা হত।

বিচার

হিন্দুপ্রধান জায়গা বলে সাধারণত হিন্দু বিধান মতেই বিচার হত। আর সে কাজ সাধারণত করা হত গ্রাম্যদেবতার সামনে, তাঁর নাটমন্দিরে। তখনকার দিনে সেই দেবস্থানই ছিল বিচারালয়। আর বিচার করতেন পঞ্চায়েৎ, মুখ্যা প্রভৃতি গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা ও রাজদরবার থেকে নিযুক্ত পত্রধারী। তাই বিচারের কাজ হত ভাবে খুবই ভালভাবে। বর্তমান কালের মত আইনের ফাঁকিবাজী বা উৎকোচ নিয়ে অপরাধীব মুক্তি, নিরপরাধীর শাস্তি হত না। উৎকোচ গ্রহণকারীর শাস্তি ছিল অত্যন্ত গুরুতর।

তারপর যেখানের বাদী-বিবাদী, সেখানের পঞ্চায়েৎ, মুখ্যা প্রভৃতিরাই-বিচার করতেন। স্থানীয় ব্যক্তি তাঁরা। তাই তাঁদের কাছে সত্য গোপন করা বাদী-বিবাদী কোন পক্ষেরই সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়তঃ—দেবতা ধর্ম প্রভৃতির ওপর সেকালের মানুষের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। আর তাই সেই দেবমন্দিরে, দেবতার সামনে মিথ্যা বলতে কেউ সাহসী হতেন না। তাই সব ক্ষেত্রেই সুবিচার হত। আর নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে বিচার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ম

ধর্মই ছিল এঁদের ধর্ম। আর ধর্মই ছিল তাঁদের রাজ্য পরিচালনার সব চাইতে বড় হাতিয়ার। তাঁরা বুঝেছিলেন, শুধু শাসনের ভয় দেখিয়ে বা আইনের বাঁধনে বন্দী করে মানুষের শয়তানী প্রবৃত্তিকে রোধ করা যাবে না। নীতি, ধর্ম প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলে পাপ-পুণ্যের ভয় ও জয় দেখিয়ে, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে।

আর তাই ধর্মকে আশ্রয় করেই পরিচালিত হত এখানের সব কিছু। ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু করতেন এখানের প্রধান পুরোহিত। ধর্ম সম্বন্ধে তিনিই ছিলেন এখানের সব কিছুর অধীশ্বর। আর ধর্ম সম্বন্ধে বহু বিধিবদ্ধ নিয়ম করা ছিল। তার জন্য মল্লভূমের প্রত্যেক গ্রামে দেবালয়, দেবমূর্তি ও তার সামনে নাটমন্দির ছিল। সেই নাটমন্দিরে দেবতার সামনে বিচার হত। আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার পর সকলের অবসর সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে সেখানে উপদেশ দেওয়া হত। প্রাপ্তবয়স্ক সেখানের প্রত্যেক পুরুষকে সেখানে গিয়ে বাধ্যতা-মূলকভাবে সেই উপদেশ শুনতে হত। কোন দিন কোন পুস্তক থেকে কি বিষয় নিয়ে উপদেশ দেওয়া হবে, পুরোহিত তার নির্দেশ দিতেন। মেয়ে ছেলেরাও অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই উপদেশ শুনতে যেতেন। এ ছিল মল্লভূমের প্রত্যেক গ্রামের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম।

তারপর সময় বিশেষে কবিগান হত, কথাবার্তা হত, পাল পার্বণের সময় অভিনয় হত। আর সব কিছুর মধ্যেই ছিল নীতি, ধর্ম প্রভৃতি সদাচার, সৎ শিক্ষার প্রাধান্য। ধর্মের ভেতর দিয়ে, সৎ উপদেশের ভেতর দিয়ে ছিল মানুষের সত্তাকে বিকশিত করবার প্রয়াস। এইভাবে গড়ে তোলা হত রাজ্যবাসীর নৈতিক মানকে, যার ফলে অতীতের বিষ্ণুপুর একসময় ছিল সত্যকার দেবভূমি। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের নিজস্ব দেবালয়, জলাশয়, সদাব্রত প্রভৃতি সৎপ্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে। আর আজ আমরা অতিরিক্ত সভ্য হয়ে, শিক্ষিত নামধারী হয়ে. চলেছি জাহান্নমের পথে।

যাত্রাগান, মঞ্চ, ছায়াছবি, গল্প, উপন্যাস সব কিছুর ভেতর দিয়ে তুলে ধরছি স্মাগলিং, উৎকোচ, চোরাকারবার, ভাঁওতাবাজী, ভেজাল, অর্ধনগ্না নারীর নৃত্য, হাস্য, লাস্য; গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও সভ্যতার নামে অসভ্যতার সর্বনাশা রূপকে। আর দেশের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা আমরা তার প্রতিবাদ করা দূরে থাক, তাকে বর্জন করা দূরে থাক, দিনের পর

দিন গ্রহণ করে চলেছি, অতি আনন্দের সঙ্গে। যার ফলে অতি দ্রুত গতিতে দেশের বুকে তৈরী হয়ে চলেছে যত কিছু অনাচারী, দুর্নীতিবাজের দল। সোনার দেশ, দেবভূমি দেশ, পরিণত হয়ে চলেছে নরকের চেয়েও জঘন্যতম আখ্যা দেওয়ার মত ভাষা যদি কিছু থাকে—সেই পথে। মানুষের পৃথিবীতে মানবতার মূল্য আজ নেই। প্রগতির নামে আছে যত কিছু দুর্গতি, দুরাকাঙ্ক্ষার অগ্রগতি।

দান

দানের কথা বলতে গেলে মল্লভূমের সব কিছুই তার অধিপতিদের দান। এখানের সব কিছুতেই স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় কীর্তি, অপরিমিত দানের কথা। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের সবকিছু উৎসর্গ করে গেছেন তাঁরা প্রজার কল্যাণে।

মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ মনুষ্যত্ব বা চরিত্র--যার ওপরই নিহিত মানুষের উত্থান-পতন, তার সুখ, শান্তি। সেই চরিত্রকে গড়ে তোলবার চেষ্টার তাঁদের অন্ত ছিল না। তার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা বহু শিক্ষায়তন, টোল, মক্তব। ধর্মের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন সমস্ত রাজ্য। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অসংখ্য দেবালয়, দেববিগ্রহ। মুসলমান প্রজাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়ে ছিলেন ইদগা, পীরের আস্তানা, মসজিদ প্রভৃতি। আর তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দিয়ে গেছেন অপর্যাপ্ত পীরোত্তর, দেবোত্তর সম্পত্তি।

বাইরের থেকে আসা সাধু-মোহান্ত, অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য 'অস্থল', তার ব্যয় বহনের জন্য দান, ব্রাহ্মণ, সজ্জন, জ্ঞানী, গুণী, পীর-ফকির প্রভৃতিদের দান, যা কৃষির উন্নতি ও পানীয় জলের জন্য প্রচুর দীঘি, সেচ খাল প্রভৃতি খননের ভেতর দিয়ে রাজ্যের কল্যাণের জন্য তাঁদের অবদান অসীম।

কিন্তু কালের আবর্তে পড়ে মল্লরাজগণের শক্তি, সমৃদ্ধিহীন হওয়ায় এবং মানুষের অতি হীন জঘন্য মনোবৃত্তির ফলে সেই সমস্ত কল্যাণকর অবদান তাঁদের নিরর্থক হতে বসেছে। মোহান্তদের সীমাহীন দুর্মতির জন্য সমস্ত অস্থল ধ্বংস প্রায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ দেবালয়ই বিনষ্ট। কেবলমাত্র ভারতসরকারের কীর্তিরক্ষা বিভাগের চেষ্টায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি মন্দির পাথর দরজা, দলমর্দন কামান প্রভৃতি এখনও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু সমস্ত জলাশয়ই ধ্বংসপ্রায়। তাদের অধিকাংশ বাঁধেরই বহু অংশ আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে, ভাবীকালের গর্ভে এইভাবেই হয়ত তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের মহানদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কিছুই হয়ত আর অবশিষ্ট থাকবে না।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উভয় বস্তুই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সম পর্যায়ভুক্ত। তাই সেই দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁদের খুবই প্রখর। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগ ছিল রাজার নিজের হাতে। তার জন্য রাজ্যময় প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন তাঁরা বহু শিক্ষায়তন, টোল, মক্তব। ধর্মের ভেতর দিয়ে ও ছিল তাঁদের চরিত্র গঠনের প্রয়াস পূর্বেই উল্লিখিত আছে। প্রত্যেক গ্রামে সেখানের গ্রাম্য দেবতার নাটমন্দিরে ছিল ধর্মোপদেশ দেবার ব্যবস্থা।

আর ছিল সারা বৎসর ধরে বিভিন্ন পাল পার্বণের সময় এবং আরও সব বিশিষ্ট সময়ে কথকতা, কবিগান, অভিনয় প্রভৃতি সব কিছুর ভেতর দিয়ে সুশিক্ষার ব্যবস্থা। আর ছিল কুকর্মের জন্য যেমন শাস্তি, সুকর্মের জন্য ছিল সেইমত পুরস্কার। যার ফলে রাজ্যের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল অপরূপভাবে। আর তারই জন্য শিল্প, সঙ্গীত নৈতিক-চরিত্র প্রভৃতি সব দিক দিয়েই বিষ্ণুপুর হয়ে উঠেছিল অসামান্য, অনন্য!

স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ছিল সেইমত ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় গো দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের জন্য গোপালনকে করেছিলেন তাঁরা বাধ্যতা-মূলক। আর গোচারণের সুবিধার জন্য গোচরভূমি প্রভৃতিরও করেছিলেন তাঁরা সেইমত ব্যবস্থা। সেই গোচরভূমি কেউ অবরোধ করলে, রাজসরকার থেকে তাকে দণ্ড দেওয়া হত। কেউ কোন খাদ্যে ভেজাল দিলে, অথবা প্রতারণা করে কুখাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করলে, তাকে নরঘাতকের দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। আর এই সমস্ত ব্যতীত রাজ্যের সর্বত্র বিশুদ্ধ জলের জন্যও জলাশয় খনন করিয়েছিলেন তাঁরা প্রচুর পরিমাণে। এইভাবে তাঁদের রাজ্যকে স্বাস্থ্যেও করেছিলেন তাঁরা সমৃদ্ধ।

সমাজ ব্যবস্থা

বিষ্ণুপুরের সমাজ ব্যবস্থাও ছিল ঐ একই ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানেও সবার ওপরে ছিল ধর্ম। এমনকি রাষ্ট্রের চেয়েও ধর্মের অনুশাসনই সেখানে ছিল প্রবল। কিন্তু সেধর্ম ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল সেকালের সমাজ ব্যবস্থা।

বর্ণাশ্রম ধর্মের নাম শুনে, বর্ণবৈষম্যের অপকারিতার কথা স্মরণ করে বর্তমান কালের চিন্তাধারায় বর্ণবৈষম্যের অপকারিতার কথা বিচার করে, অনেকে হয়ত তাকে কুপ্রথা বলতে চাইবেন। কিন্তু সেকালের সেই সমাজ ব্যবস্থার বর্ণাশ্রম ধর্ম জাতির কল্যাণ করেছিল প্রচুর। কারণ বর্ণভেদ থাকলেও বর্ণবিদ্বেষ ছিল না। ছিল পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক। তখনকার দিনে সমগ্র হিন্দু জাতিকে গুণ ও কর্মের যোগ্যতামত কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা ছিল। আর সেই প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছিল। এবং সেই বৃত্তি যদি কেউ হরণ করতেন অর্থাৎ এক জাতির কাজ অন্য জাতিতে করত তাহলে তাঁকে বৃত্তি হরণকারী বলে রাজ সরকার থেকে শাস্তি দেওয়া হত। ধর্মের অনুশাসনেও ছিল বৃত্তি হরণ করা মহাপাপ। তাই একের বৃত্তি তখন অপরে কেউ গ্রহণ করতেন না।

আর ছিল সেই বিভিন্ন বর্ণের উৎপন্ন করা বস্তু বিক্রয়ের জন্য সামাজিক প্রথার ভেতর দিয়ে বিধিবদ্ধ ভাবে ব্যবস্থা।

তখনকার দিনে ছোট বড় সকলের সব ক্রিয়াতেই কাজের গুরুত্ব মত সকল জাতির উৎপন্ন করা সব কিছু জিনিষ অল্প-বিস্তর নিতে হত। নৈলে ধর্ম, সমাজ, কোন দিক দিয়েই সে কাজ ত্রুটিশূন্য হত না। আর সেকালের মানুষ আজকের দিনের মত এমন আত্মসর্বস্ব ছিলেন না। আজকের দিনের মানুষ যেমন অপরকে বঞ্চিত করে, তাদের ফাঁকি দিয়ে, নিজেদের ভোগ বিলাস, নিজের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য বাড়ীর পর বাড়ী, টাকার ওপর টাকা, আর তাকে আরও কেমন করে বাড়ান যায়, সেই চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকে, সেকালের মানুষ তেমনি নানা প্রকারের জনহিতকর কাজের ভেতর দিয়ে, কে কার নামকে অমর করে রাখতে পারবেন সেই চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত করে রাখতেন। সেই ছিল সেকালের মানুষের চিন্তাধারা।

তাই সারা দেশ ভরে গাছ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠার সীমা ছিল না। সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা সদাব্রত পর্যন্ত দিতেন। মল্লভূমের নরপতি ও সেখানের বহু বর্ধিষ্ণু ব্যক্তির দেওয়া ঐমত জনহিতকর কীর্তি- দেবালয়, জলাশয়, এমনকি সদাব্রতও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেখা যেত। সরকার বাহাদুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার ফলে তা নষ্ট হয়ে গেছে।

তখনকার দিনে আর এক ব্যবস্থা ছিল বিনিময় প্রথা। প্রত্যেকের উৎপন্ন করা জিনিষ পরস্পরের মধ্যে তাঁরা বিনিময় করে নিতেন। আর সেকালের

মানুষ আজকের দিনের মত এত বিলাসী অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বাহুল্য বর্জিত, ন্যায় ধর্মে আস্থাশীল, সুসংযত মানুষ। আজকের তুলনায় প্রয়োজন ছিল তাঁদের খুবই নগণ্য। আর সেই জন্য সেই নিয়মের ভেতর দিয়ে কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের সব সমস্যার তাঁরা সমাধান করেছিলেন। বেকার বলে কোন সমস্যা তাঁদের ছিল না বললেও চলে এবং মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও প্রাচুর্য না থাকার জন্য আজকের দিনের মত ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানও এত বিরাট ছিল না।

তারপর অন্য দিক দিয়েও সুব্যবস্থা ছিল অতি সুন্দর ভাবে। ধর্ম, সদুপদেশ, সুশাসন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মানুষের সৎপ্রবৃত্তিকে এমন সুন্দর ভাবে জাগিয়ে রাখা হত—যার ফলে মানুষের কোন শয়তানী প্রবৃত্তি এমন জাগত না। চুরী জুয়াচুরী, মিথ্যাচার, কপটতা প্রভৃতি কোন অমানুষিক আচরণ সে যুগে বিরল ছিল। মানুষের সুখ শান্তি ছিল অগাধ। আর তার ফলে, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সৎসাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে সংস্কৃতি ভাণ্ডারকে তাঁরা সমৃদ্ধ করে গেছেন অভূতপূর্বভাবে। আজকের দিনের মত অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব দিক দিয়ে অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত হয়ে, অতি সভ্যতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ তাঁদের হতে হয়নি। অল্পেতে সন্তুষ্ট হয়ে, ন্যায়, ধর্ম ও ভগবানের ওপর আস্থাশীল হয়ে, দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে আনন্দ-উৎসবের ভেতর দিয়ে সত্যকার মানুষের জীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন। আর আমরা আজ বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্কারে ভরা যুগে জন্মগ্রহণ করে, অজ্ঞানতার চরমতম অভিশাপ মাথায় নিয়ে, পশুর পশুত্বকেও অতিক্রম করে আরও জঘন্যতম পাশবিকতার দিকে এগিয়ে চলেছি।

কৃষি ও বাণিজ্য

রাজ্যের চারদিকে বড় বড় দীঘি, সেচ খাল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নদী, প্রচুর অরণ্য সম্পদ ও যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন মত বৃষ্টির অভাব এখানে হত না, গো-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য উৎকৃষ্ট সারও হত সেইমত। তাই কৃষিও ছিল এখানে খুবই উন্নত। কৃষিজাত দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণে। সময় বিশেষে ধান উৎপন্ন হত এখানে এত অধিক পরিমাণে যার ফলে টাকায় চার মণ পর্যন্ত ধান পাওয়া যেত। তার মধ্যে গুড়, চাল, নীল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য; লা, গালা, মোম, মধু প্রভৃতি অরণ্য জাত সম্পদ; পিতল, কাঁসার বাসন প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য; শঙ্খ জাত বলয়, শাঁখের পদক প্রভৃতি শঙ্খবস্তুও নানা

প্রকারের শিংয়ের তৈরী জিনিষ বাইরে রপ্তানী হত। আর বাইরের থেকে আসত নুন, মসলা প্রভৃতি।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানের গালা, নীল প্রভৃতির বড় খরিদ্দার ছিলেন। এখানের সব চাইতে বড় নীল ব্যবসায়ী ছিলেন—বিষ্ণুপুরের প্রায় ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত অযোধ্যা গ্রামের গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়। তাঁর বহু নীল কুঠি ছিল। উক্ত নীল ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তিনি অগাধ বিত্তের অধিকারী হয়ে ছিলেন। এখনও উক্ত অযোধ্যা গ্রামে তাঁর এক বিরাট নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। এবং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মল্লভূমের আরও বহুস্থানে বহু নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ ছিল। কথিত আছে—এবং ইতিহাসেও দেখা যায়, সময় বিশেষে মল্লভূমের অধিবাসিরা বিরাট বাণিজ্য তরী নিয়ে ভারতের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা করতে যেতেন। বর্ষাকালে দ্বারকেশ্বর নদের বন্যার সময় ভাসান হত সেই সমস্ত তরী। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যায়, বাণিজ্যের দিক দিয়েও মল্লভূম ছিল যথেষ্ট উন্নত।

শিল্প

শিল্পে বিষ্ণুপুর অনন্য। আর তা শুধু বাংলায় নয়, খ্যাতি তার সর্বভারতীয়। এমনকি ভারতের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে তার প্রসিদ্ধি।

এখানের সাধারণ শিল্প প্রধানত পিতল, কাঁসার বাসন, সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ রেশমের বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের শাঁখের জিনিস এবং সোনা রূপা ও তামার অলঙ্কার প্রভৃতি। তারপর বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্প, বিশাল দুর্গদ্বার পাথর দরজা, পাথরের রথ, বিশাল রাসমঞ্চ প্রভৃতি ব্যতীত বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের ৩৬০ দেবালয় ছিল। কালের প্রভাবে তাঁদের শক্তি, সমৃদ্ধি হীন হওয়ায় ও স্থানীয় জনসাধারণের ঔদাসীন্যে তার অধিকাংশই লয় হয়ে গেছে। তবুও ভারত সরকারের কীর্তিরক্ষা বিভাগের রক্ষাধীনে মদনমোহন মন্দির, মল্লেশ্বর শিবমন্দির, রাধালাল জীউয়ের মন্দির, বুড়ো রাধাশ্যাম, জোড়বাংলা, শ্যামরায়, কালাচাঁদ, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, জোড়ামন্দির, নন্দলাল, কেশবলাল, মুরলীমোহন, মদনগোপাল, রাধাগোবিন্দ জীউয়ের শ্রীমন্দির ও বিষ্ণুপুরের বাহিরে ডিহর গ্রামের সারেশ্বর, শৈলেশ্বর, বোলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর ও বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর শিবমন্দির প্রভৃতি যে কয়েকটি শ্রীমন্দির এখনও অবশিষ্ট আছে, তা যে কোন মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করবে। তার মধ্যে শ্যামরায় ও জোড়বাংলা নামক মন্দির দুটি গঠন প্রণালী, বিশেষত তার মধ্যে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতায় এমন

অপরূপ যার তুলনা বিরল। জোড়বাংলা মন্দিরের চারদিকের দেওয়াল, স্তম্ভগাত্র ঢাকা বারান্দার ভেতরের দেওয়াল প্রভৃতি সর্বত্র কৃষ্ণলীলা, রসায়ন, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানের ছবি ব্যতীতও শিকার, স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ সেকালের সমাজচিত্র, নৃত্যগীত, ফুল, লতাপাতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পোড়ামাটির ফলকে ভরা। একটিমাত্র মন্দিরে বিভিন্ন প্রকারের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের এমন অভিনব অত্যাশ্চর্য সমাবেশ বিরল।

শ্যামরায়ের মন্দির উক্ত পোড়ামাটির ভাস্কর্যের অলঙ্করণের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতায় আরও অপরূপ। এর চারদিকের দেওয়াল, ভেতর বাহির, স্তম্ভগাত্র প্রভৃতি সর্বত্রই আরও উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ পোড়ামাটির ফলকে ভরা। দেখলে সহসা চোখ ফেরান যায় না। আর দেখে যেন শেষ করা যায় না।

এর সম্বন্ধে আমার নিজের দেখা একটা বিষয় উল্লেখ করলাম। তখন খাস ব্রিটিশ রাজত্ব। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। উক্ত শ্যামরায় মন্দিরের যে সমস্ত জায়গায় অলঙ্করণের চিহ্ন নেই, চূণ বালির প্রলেপ দিয়ে ঢাকা, ঐ স্থানগুলো উক্ত মন্দিরের ভগ্নস্থান। ঐ সমস্ত জায়গা পোড়ামাটির ফলক দিয়ে ভরাবার জন্য সেকালের বড় বড় ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারেরা বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাতে সফল হতে তাঁরা পারেননি। তাই নিরুপায় হয়ে সেকালের মন্দির শিল্পীদের কাছে হার স্বীকার করে, ঐ চূণ বালি দিয়ে কাজ শেষ করবার আদেশ দিতে তাঁরা বাধ্য হন।

মদনমোহন মন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালও পোড়ামাটির ভাস্কর্যের অলঙ্করণে অপরূপ। যার তুলনা বিরল।

তারপর বুড়ো রাধাশ্যাম জীউয়ের শ্রীমন্দিরে সাধারণ মাকড়া পাথরের ওপর খোদাই করে তার ওপর চূণের প্রলেপ দিয়ে যে জিনিষ তৈরী করা হয়েছে সেকালের শিল্পীদের শিল্প প্রতিভার সে এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, কালাচাঁদ প্রভৃতি মন্দিরের শিল্প ও অল্প বিস্তর ঐক্যমত রাধা-বিনোদ মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণও অতি উচ্চস্তরের। মূর্তি শিল্পেও বিষ্ণুপুরের কৃতিত্ব অসাধারণ। অষ্টধাতুর তৈরী রাধাকৃষ্ণের মূর্তি শিব দুর্গার মূর্তি, দারু নির্মিত শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, সাক্ষীগোপাল, ষড়ভুজ প্রভৃতির বিভিন্ন মূর্তি যে কোন ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

তারপর পট শিল্পের পর্যায়ভুক্ত দশবতার খেলার দশ অবতারের ছবি ও তাঁদের প্রতীক চিহ্ন শঙ্খ, চক্র, পদ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রসহ দশবতার তাস বিষ্ণুপুরের গর্বের বস্তু। মৃৎশিল্পেও তাই। এখানের পাঁচমুড়া গ্রামের তৈরী

পোড়ামাটির হাতী, ঘোড়া, সোনামুখীর মনসার বারি নামক মনসাদেবীর মূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পবস্তু শুধু আমাদের দেশেই নয়, ভারতের বাইরেও যথেষ্ট আদৃত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের আর এক ধাতু শিল্প বিশালকায় কামান। সুদূর অতীতকাল হতে অনাবৃত ও অনাদৃত অবস্থায় মুক্ত আকাশের তলে পড়ে থাকা সত্বেও মরিচা পড়া দূরে থাক তার মসৃণতা পর্যন্ত হারায় নি। এবং সেই যন্ত্রবিহীন যুগে পাথর থেকে বর্তমান কালের টেনলেশ ষ্টীলের মত অতি উৎকৃষ্ট লোহা তৈরী করে, তার থেকে প্রায় তিনশত মন পর্যন্ত ওজনের বিশালকায় কামানকে তৈরী করবার সময় কিভাবে উত্তপ্ত করে, ও তার সেই দুঃসহ তাপ সহ্য করে সেই অবস্থায় তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তৈরী করা হয়েছে, তা চিন্তা করে দেখলে এক দিক দিয়ে যেমন মনে বিস্ময় জাগায়, অন্যদিকে সেইমত সেকালের শিল্পীদের ওপর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

আর ঐ সমস্ত বিশালকায় বিধ্বংসী কামান যে মহারাজ হাম্বিরমল্লের পূর্ব হতেই তৈরী আরম্ভ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ ঐ মত প্রচণ্ডতম বিধ্বংসী কামানের বলেই তিনি দুর্ধর্ষ কালাপাহাড়ী ফৌজকে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। দাযুদখাঁয়ের লক্ষ সৈন্যের কবর রচনা করেছিলেন যুঝঘাটির প্রান্তরে আর তারই শক্তিতে দেখেছিলেন তিনি বাংলায় স্বাধীন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন। পরবর্তীকালেও ওরই শক্তিতে মহারাজা রঘুনাথমল্লদেব সুজার অশ্বারোহী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিলেন। ওরই শক্তিতে বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্রশক্তির অবলুপ্তির দিনেও বিষ্ণুপুর বিপর্যস্ত করেছিল সারা বাংলার ত্রাস ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্ধর্ষ বর্গীবাহিনীকে।

বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বাংলার মন্দির শিল্পে পোড়ামাটির ফলকের অলঙ্করণের যে বিপুল সমৃদ্ধি বাঙ্গালীর শিল্প চিন্তাকে এরা অতি উচ্চ মার্গে নিয়ে গিয়েছিল, মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে তা চরম বিকাশ লাভ করে। (দেশ পত্রিকা ১৩৮৪ সাল ৫ঠা চৈত্র।)

বিষ্ণুপুরের আর এক প্রসিদ্ধ শিল্প তামাক। বিভিন্ন রাজকীর্তির মত বিষ্ণুপুর তামাক শিল্পেও অদ্বিতীয়। এখানের শ্রীপতি কর ও হেমচন্দ্র করমহাশয়-দের তামাক উৎকর্ষতায় সারা ভারতে অদ্বিতীয় বলে পরিগণিত হয়েছে।

আর এঁরা ব্যতীত বিষ্ণুপুরে আর এক তামাক শিল্পী ছিলেন। নফরমুদী, বিপিনবিহারী খাঁ ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মশায় প্রভৃতি। এঁরাও নফরমুদী বিষ্ণুপুরে, আর খাঁ মশায়, মুখোপাধ্যায় মশায় কলিকাতায় তামাকে এক সময়

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্তমান কালেও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়ের পৌত্র চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মশায়ের তামাক তৈরী ও বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় আছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরী তামাকের নাম দিয়ে বহু জায়গায় বহু ব্যক্তি যার যা খুশী তামাক চালাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে আসল বিষ্ণুপুরী তামাক নেই। এখনও আসল বিষ্ণুপুরী তামাক পাওয়া যায় এক মাত্র বিষ্ণুপুরেই।

বর্তমানেও কয়েকজন ভারত—এমনকি তারবাইরেও প্রসিদ্ধিলাভকরা শিল্পী রয়েছেন। শঙ্খশিল্পে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার নন্দী কয়েকবার সর্বভারতীয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এবং বহুবার বাংলার প্রাদেশিক পুরস্কার লাভ করেছেন। শাঁখের ওপর এঁর সূক্ষ্ম সুন্দর শিল্পকলা আমেরিকা প্রভৃতি বহির্ভারতে গিয়েছে এবং সমাদর লাভ করেছে।

বিখ্যাত রেশমশিল্পী শ্রীযুক্তঅক্ষয়কুমার পাটরাঙ্গা মহাশয়ের প্রসিদ্ধি আজ বিশ্বব্যাপী। রেশমের ওপর তাঁর অত্যাশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি বালুচরী ও বিশেষ করে মল্লভূম শাড়ী সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমান বয়স তাঁর প্রায় ৮৬ বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁর কর্মশক্তি, শিল্পপ্রতিভা অম্লান।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে গত হয়েছেন রামবিলাস কর্মকার মশায়। সূক্ষ্ম শিল্পে তাঁর প্রতিভাও ছিল অত্যাশ্চর্য! মুসুর কলাইয়ের ক্ষুদ্র আধখানা ডালের মধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে দুর্গা প্রতিমা ও একসঙ্গে ২২টি হাতী আঁকতে পারতেন।

সঙ্গীত

সঙ্গীতও বিষ্ণুপুরের এক গৌরবোজ্জল শিল্প। আর তাতে বিষ্ণুপুর শুধু প্রসিদ্ধই নয়, বাংলার পীঠস্থান ও ভারতের দ্বিতীয় দিল্লী বলে পরিগণিত হয়েছে।

দিল্লীর সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট আকবর শাহের দরবারে সঙ্গীত গুরু তানসেনের আগমনের কাল হতে।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের প্রসিদ্ধি তার পরবর্তীকালে হলেও, প্রচলন তার বহু পূর্বের থেকে। সুর ব্রহ্ম আর্য্য মনীষিরা সেই ব্রহ্মের আরাধনার জন্য সুর অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করেন। তাঁদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ যাগযজ্ঞের মন্ত্র, দেব-দেবীর আরাধনার স্তোত্র প্রভৃতি সেই বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সংযুক্ত হয়ে সঙ্গীতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাসে দেখা যায় সেই আর্যদের

ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সেই আর্যদের প্রবেশ পথ বাংলার পশ্চিম রাঢ় অঞ্চল মল্লভূম। আর এই বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম মল্লভূমই যে তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এ অবিসম্বাদিত সত্য। এবং তার ফলে আর্যদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ তাঁদের দেব-দেবীর আরাধনার ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার ও প্রচলন সেখানেই যে প্রথম হয়েছিল, তাতেও সন্দেহের কোন কারণ নেই। মল্লভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ দশকে। তারপর প্রায় তার ৭ শতাব্দী পরে বিষ্ণুপুর রাজবংশের ৪২ সংখ্যক নরপতি শিবশিংমল্ল তার ওপর আকৃষ্ট হয়ে, নিজে উক্ত সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং দেব-দেবীর আরাধনা ব্যতীত মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য বিষ্ণুপুর রাজসভায় সভাগায়কের পদের প্রবর্তন করে সেখানে দৃঢ়ভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেহ বলেন, তা ঝুমুর, খেউড় জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গীত। তখনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকাশ সেখানে হয়নি। কিন্তু তা ভুল। প্রথমত খেউড়, ঝুমুর জাতীয় সঙ্গীতের যত আকর্ষণই থাক, রাজসভায় স্থান লাভ করতে পারে না। আর যতদূর জানা যায় মহারাজ শিবশিংমল্ল যে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা শিক্ষা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। তারই বিকাশ সেখানে হয়েছিল। আর সেই থেকে তার ধারাই চলে এসেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যবাসী প্রজাদের মধ্যে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার ফলে, মল্লভূমের বুকে আসে কীর্তনগানের জোয়ার। কিন্তু তার মধ্যেও ছিল শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবন থেকে আনীত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধ্রুবদাঙ্গ কীর্তন। আর বিষ্ণুপুর রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও তার অস্তিত্ব হারায় না। তার স্নিগ্ধ মাধুর্যময় ধারা চলে আসে তার স্বভাবসিদ্ধ গতিতে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রায় সাত হাজারেরও অধিক পুঁথির মধ্যে। তাতে রাগ রাগিণী সংযুক্ত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পুঁথির সংখ্যাও প্রায় দুই শতাধিকের মত। তার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সাধক, ভক্ত, গায়ক, শূরদাস, ব্রহ্মদাস, তুলসীদাস, জানকীদাস, হরিদাস, পরমানন্দ প্রভৃতির নাম, তাঁদের গান আছে। কয়েকটি গানে মোগল সম্রাট আকবরশাহ, জাহাঙ্গীর বাদশাহের স্তুতিবাচক বিষয়, এমন কি বৈরাম খাঁ, তোড়মল্লের নামও উল্লিখিত আছে। আর আছে বিভিন্ন গানে ব্যবহৃত বিভিন্নরাগ। মল্লার, গৌরী, ধানাশ্রী, টোড়ী, কেদার, দক্ষিণশ্রী, কানড়, সৌরাঠ, বিভাস, সুই, শ্রী,

পূরবী, মারু, করুণাশ্রী, গোণ্ডশ্রী, কৌ, বারাড়ি, বেলওয়ার সিন্ধুড়া, প্রেমসিন্ধু প্রভৃতি। আর তাতে লিখিত তারিখ দেখে জানা যায় সেই সমস্ত পুঁথি লেখা হয়েছে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বীরহাম্বিরের পূর্ববর্তীকাল হতে, তার পরবর্তী বীরসিংহদেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

কালের প্রভাবে কত পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে, কত পুঁথি বাইরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে চলে গেছে। তাতে আরও কত ঐ জাতীয় জিনিষ ছিল বা আছে, জানা নেই। কিন্তু তাতে সঙ্গীত গুরু তানসেন বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিখ্যাত সেনী ঘরানার কোন উল্লেখ নেই। অথচ মহারাজ বীরসিংহদেব সপ্তদশ শতাব্দীর সম্রাট ঔরংজেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁর সময় পর্যন্ত ঐ সমস্ত পুঁথি লিখিত। সেনী ঘরানার তখন পরিপক্ক অবস্থা, সারা ভারতব্যাপী তার প্রসিদ্ধি।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত অহল্যা বাঈ রোড, ভারতের বিভিন্ন স্থান, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে যাবার এক বিশিষ্ট পথ। তিনি অতি প্রাচীনকালের দেবতা। আর তার জন্য সারা ভারতব্যাপী তাঁর প্রসিদ্ধি। ভক্তের সমাগমও তাই সেই মত। অনেকে বলেন, ঐ উদ্দেশ্যে আগত উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা অল্প-বিস্তর সঙ্গীতশিল্পী শ্রীক্ষেত্রে যাবার পথে এখানে তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশন করে বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতকে কিছু পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে—সঙ্গীতের প্রতি বিষ্ণুপুরবাসীর অসীম অনুরাগ। তাদের সাধনা। আর যতদূর জানা যায় সে সমৃদ্ধি বিপুলভাবে আসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর রাজবংশের ৫৪ সংখ্যক অধিপতি দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের সঙ্গীতের প্রতি অসীম আগ্রহ ও তার জন্য তাকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সেইমত প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে। কিন্তু অবস্থা তখন খুবই প্রতিকূল। দিল্লীর সিংহাসনে তখন সম্রাট ঔরংজেব। পূর্বেই উল্লিখিত আছে তার কঠোর আদেশে জ্যোতিষ-চর্চা, যাত্রাগান প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীতও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সমস্ত সঙ্গীত-শিল্পী তখন তাই নিষ্ক্রিয়, অবহেলিত। ঔরংজেবের কঠোর আদেশের বিরুদ্ধে ভারতের কোন রাজা, মহারাজা বা রাজকল্প ব্যক্তি তাঁদের আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিতে সাহস করেননি। কিন্তু মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব ছিলেন তাঁর ব্যতিক্রম। তিনি সর্ববিদ্যার সার সঙ্গীতকে তাঁর রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাকেই গ্রহণ করে-

ছিলেন তাঁর জীবনের ধর্মরূপে। তার ফলে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর সেই অসীম অনুরাগের কথা কোন প্রকারে অবগত হয়ে. বিখ্যাত সেনীঘরানার বাহাদুর খাঁ নামে এক ধ্রুপদী দিল্লী থেকে বিষ্ণুপুরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর তাঁর মত গুণীকে পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করে তাঁর সম্মানের উপযোগী মাসিক পাঁচশত টাকা মাইনের ব্যবস্থা করে রঘুনাথসিংহদেব তাঁকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। আর রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করে দেন, সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট যে-কোন ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে বাহাদুর খাঁয়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারবেন, এমনকি দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করবেন। তাই বহু ছাত্র তখন বাহাদুর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে বিষ্ণুপুর পাঠকপাড়া মহল্লার অধিবাসী গদাধর চক্রবর্তী ও বুড়াধর্মরাজতলা নিবাসী নিতাই নাজীর ও বৃন্দাবন নাজীর অন্যতম। এঁদের মধ্যেও গদাধর চক্রবর্তীর কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাই বাহাদুর খাঁর পর তিনিই বিষ্ণুপুর রাজসভার সঙ্গীতাচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই বাহাদুর খাঁর আগমন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, রঘুনাথসিংহদেবের মাসিক পাঁচশত টাকা মাইনে দেবার সামর্থ্য ছিল না বলে, কেহ কেহ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা একটুও অনুসন্ধান করে দেখেননি কত শক্তি তখন বিষ্ণুপুর রাজের ছিল। এক ইঙ্গিতে তখনও তাঁরা লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন। আর তারই ফলে নবাবী, বাদশাহী ফৌজ যা পারেনি, মহারাজ রঘুনাথসিংহদেব সেই দুঃসাধ্য সাধন করেছিলেন। রহিম খাঁ ও চেৎবরদার মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে, তাদের শিবির ও চেৎবরদা রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করে ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন। যার ফলে আরও অনেক বেশী মাইনে তিনি দিতে পারতেন। তার প্রমাণ তার পরবর্তী মহারাজা গোপালসিংহদেবের রাজত্বকালের দিকে দৃষ্টি দিলেই যে কেহ বুঝতে পারবেন। তাঁর সময়ে এক বিষ্ণুপুরের বুকেই তৈরী হয়েছে জোড়া মন্দিরের মত দুই সুবৃহৎ মন্দির রাধা-গোবিন্দ ও রাধামাধবের মত আরও দুটি মন্দির। আমার নিজের দেখা যার একটা মন্দিরের মূল্য নিরূপণ করতে ব্রিটিশ সরকারের খাস ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারেরা পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর বিদেশী ভূপর্যটক এ বি. রেনল্ড প্রভৃতির উক্তিতেও আছে, বিষ্ণুপুরের ঐ সময় সুখ-সৌভাগ্যের কাল। তাই ঐ সময়ের বিষ্ণুপুরের নরপতিদের উদ্দেশে, ঐ মত দৈন্য দশার অপবাদ, শুধু অবাস্তব নয়—হাস্যকর উক্তির পর্যায়ভুক্ত।

আর দিল্লী থেকে বাহাদুর খাঁ নামের সেনী ঘরানার ধ্রুপদীর বিষ্ণুপুর

আগমনের জনশ্রুতি এত প্রবল ও উক্ত সেনী ঘরানার ধ্রুপদ গানের সংখ্যা বিষ্ণুপুরে এত অধিক, যার জন্যে ওকে নস্যাৎ করা সুকঠিন। তারও পর বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত যন্ত্রী ও ধ্রুপদী, সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় লিখেছেন, বাহাদুর খাঁর আগমন সত্য এবং 'সব গুণ নিধান রঘুনাথ' বলে মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের যে যশোগাঁথা বাহাদুর খাঁ রচনা করে গেছেন, তার প্রতিলিপি তিনি তাঁর পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে তাঁর লিখিত 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থে দিয়েছেন। তাই বহু দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, জীবন খাঁয়ের পুত্র বাহাদুর খাঁ না হলেও, মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের সমসাময়িক সেনী ঘরানার বাহাদুর খাঁ নামের কোন ধ্রুপদী বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। এবং রঘুনাথসিংহদেবের ওপর ছিলেন তিনি খুবই শ্রদ্ধাশীল। আর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত রঘুনাথসিংহদেবের যশোগাঁথার মধ্যে। তাই তাঁর মর্মান্তিক পরিণতিতে ব্যথিত হয়ে তিনি চলে যান। আর তাই এখানে তাঁর কোন স্থায়ী বাসভবন বা বংশাদির কোন চিহ্ন নেই। আছে শুধু তাঁর নামে উৎসর্গ করা, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বাহাদুরগঞ্জ মহল্লা, আর তাঁর দেওয়া সেনী ঘরানার অজস্র ধ্রুপদ সঙ্গীত। তাঁর ছাত্র গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির প্রভৃতির ভেতর দিয়ে তা পরিবেশিত হয়েছে।

আর সেই সঙ্গীতকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান, আরও সুললিত ও সুখশ্রাব্য করেন বিষ্ণুপুর ঘরানার জনক বলে অভিহিত, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায়। অনেকে এঁকে বাহাদুর খাঁর শিষ্য প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু যিনি যাই বলুন, তিনি তাঁর শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর সময়েরও নন। তিনি আরও পরবর্তীকালের। আর তা অনুমানভিত্তিক নয়। অঙ্কের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। নীচে তা দিলাম।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন গীতসম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে ১৯৬৩ থেকে ৮৫ বাদ গেলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁর পিতা সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় সন্তান। তখনকার দিনে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হত কম বয়সে। তাই তিনি তাঁর পিতার ৩০ বৎসর বয়সের সন্তান যদি হন তাহলে ১৮৭৮ থেকে ৩০ বাদ গেলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে হয় অনন্তলালের জন্ম। শোনা যায় তিনি কিছু বেশী বয়সে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতে যান। সেটা যদি তাঁর ৩০ বৎসর বয়সে হয় তাহলে ১৮৪৮য়ের সঙ্গে ৩০

যোগ করলে হয় তা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় রামশঙ্করের বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর ৬০ বৎসর বয়সে অনন্তলাল যদি তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করতে যান তাহলে ১৮৭৮ থেকে ৬০ বাদ গেলে ১৮.৮ খৃষ্টাব্দের মত সময়ে হয় রামশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের জন্ম। তখন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে মহারাজ দ্বিতীয় গোপাল-সিংহদেব। আর তাই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায় গদাধরের শিষ্যও হতে পারেন না। কারণ গদাধর চক্রবর্তী মশায় মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ-সিংহদেবের সমসাময়িক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ব্যক্তি। আর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায় দ্বিতীয় গোপালসিংহদেবের সমকালীন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ব্যক্তি। দুজনের মধ্যে প্রায় শত বৎসরের ব্যবধান। তবে গুরু তাঁর যেই হোন প্রতিভার দিক দিয়ে তিনি অনন্য। আর তারই বলে তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার স্রষ্টা। তার জনক বলে তাঁর প্রসিদ্ধি। এবং যতদূর জানা যায়, তাঁর পিতা গদাধর ভট্টাচার্য্য মশায় ছিলেন মহারাজ দ্বিতীয় গোপাল-সিংহদেবের সভাপণ্ডিত। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতার বিদ্যাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং তাতে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করবার জন্য কাশীতে চলে যান। কিন্তু অধ্যয়ন করলেও, সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ এবং সেইমত সুললিত কণ্ঠ ছিল তাঁর শৈশবকাল হতেই। তাই নিজের খুশী মত গান তিনি সময় বিশেষে গাইতেন। আর তা এত সুখশ্রাব্য, এত উচ্চমানের যে তা শুনে তাঁর কাশীর শিক্ষাগুরু তাঁকে বলেন, সঙ্গীতে তোমার যে প্রতিভা, যে সুললিত কণ্ঠ, সঙ্গীতবিদ হলে, তুমি তাতে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারবে। কথাগুলো মনে তাঁর এমন দৃঢ়ভাবে গাঁথা হয়ে যায়, যার জন্য বিষ্ণুপুরে এসে তিনি সঙ্গীতকেই সারবস্তু বলে গ্রহণ করে মত্ত হয়ে ওঠেন তার সাধনায়। তালিম নিতে আরম্ভ করেন তিনি সে সময়ের সঙ্গীতনায়ক গদাধর চক্রবর্তীর ছাত্র বিখ্যাত ধ্রুপদী কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর কাছে। কিন্তু তিনি তাঁকেও অতিক্রম করে যান। সঙ্গীত সিন্ধু মন্থন করে তিনি অমৃত আহরণ করেন। জন্ম হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার। আজও তাঁর প্রবর্তিত ধারা বিষ্ণুপুর ঘরানায় চলে আসছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এবং শিক্ষাদাতা হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতের দিকপাল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি তাঁর অনন্য প্রতিভা বলে।

এই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সর্বপ্রথম ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বরলিপি তৈরী করেন। ইনি কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। ইনি 'কথা কৌমুদী' ও 'সঙ্গীতসার' নামে সঙ্গীতের দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখে

গেছেন। আর শুধু ইনিই নন। বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের বহু সঙ্গীত সাধকেরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিন্তু তবুও যে সকল সঙ্গীত সাধকের কীর্তিপ্রদীপে দীর্ঘ পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল সঙ্গীতে বিষ্ণুপুর স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে, যাঁদের নিরলস সাধনায় বিষ্ণুপুর সঙ্গীতে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে 'দ্বিতীয় দিল্লী' আখ্যায় ভূষিতা হয়েছে, সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আর সঙ্গীত সাধনার সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহু গানও তিনি রচনা করে গেছেন।

সঙ্গীতে মধুসূদনভট্টের পুত্র যদুভট্টের প্রসিদ্ধিও অসাধারণ। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি শুধু পারদর্শীই নন, তিনি একজন শ্রুতিধর ছিলেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাগ-রাগিনী একবার শোনা মাত্র নির্ভুলভাবে তিনি তা আয়ত্ব করতে পারতেন। তাই সেকালের সঙ্গীতবিদেরা বলতেন তাঁকে, তুমি যদু নও, যাদু। তাঁদের কাছে সঙ্গীতের যাদুকর বলে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। আর অন্যান্য দিক দিয়েও সঙ্গীতে প্রতিভা ছিল তাঁর এমন অপরূপ! সঙ্গীতকে এমন পর্যায়ে তিনি উন্নীত করেছিলেন যার জন্য তাঁকে বাংলার তানসেন বলা হত। প্রথম জীবনে পিতা মধুসূদনভট্টের কাছে তিনি সেতার, এসরাজ প্রভৃতি তারের যন্ত্রে তালিম নেন। পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করে তিনি বাইরে চলে যান। সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চকোটের অধিপতি "রঙ্গনাথ" ও ত্রিপুরার মহারাজা বীরভদ্র মাণিক্য তাঁকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি পঞ্চকোট, ত্রিপুরা, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বহু রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করেন। আর তাঁর শিক্ষাগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মশায় বিষ্ণুপুর ঘরানার স্রষ্টা হলেও, বাইরে প্রথম যশের মুকুট পরান তাকে সঙ্গীতের যাদুকর এই যদুভট্টই। তিনিই তাঁর সুরেলা যাদুজাল সৃষ্টি করা কণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীতে ভারতের সঙ্গীত শিল্পীদের মুগ্ধ করে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের প্রসিদ্ধিকে।

বহু জ্ঞানী গুণীদের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ কলিকাতা মহানগরীও তখন তাঁর সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রশংসায় মুখর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। সেই অবস্থাতেও তাঁর প্রতিভায় এমন মুগ্ধ তিনি হয়েছিলেন, তাঁর মনের মণিকোঠায় গুণী এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যার জন্য তার পরবর্তীকালে কবি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "বালককালে যদুভট্টকে আমি জানতাম। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে

গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা। ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরী হতে পারে। যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত রচিত।"

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আর একজন প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশনেই নন, সঙ্গীত শিক্ষাদানেও প্রতিভা ছিল তাঁর অগাধ! তাঁর সেই অনন্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুরের অধিপতি তাঁকে "সঙ্গীতকেশরী" উপাধিতে ভূষণ করেন। এবং তাঁরই পরিচালনায়ও বিষ্ণুপুরের অধিপতি রামকৃষ্ণসিংহদেবের সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার প্রথম ও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইনিই তাঁর শিক্ষক হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইনি বহু ছাত্রকে শুধু সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষাই দেননি; সঙ্গীতের বহু রথী-মহারথী তৈরী করে গেছেন। যন্ত্র সঙ্গীতের যাদুকর, কণ্ঠসঙ্গীতেও অগাধ প্রতিভার অধিকারী সঙ্গীত রত্নাকর রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতে বহু রাজা, মহারাজা ও বহু সভা-মহাসভা কর্তৃক উপাধিও স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত গীতসম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতে ঐমত প্রতিভারই অধিকারী, সঙ্গীত রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর-তথা সারা বাংলার সঙ্গীত-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কত্রয়ের ইনি পিতা। এবং ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও সঙ্গীতে সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যেষ্ঠ সন্তান রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা গুরু ইনি।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শুধু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই নন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গ্রন্থ এবং বাংলা ও হিন্দী ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গীত রচনাতেও দান তাঁর অসামান্য! যা শুধু বাঙ্গালীদেরই নয়—হিন্দুস্থানীদের কাছেও আদৃত হয়েছে। আর সঙ্গীতে শুধু প্রসিদ্ধিই নয়—পূর্বেই উল্লিখিত আছে, বহু রাজা-মহারাজা, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভা-মহাসভা কর্তৃক উপাধি ও স্বুবর্ণ পদক তিনি পেয়েছেন। তাঁর অগাধ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাকে উপাধি দিয়েছেন "স্বর স্বরস্বতী", জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাধি দিয়েছেন "সঙ্গীত নায়ক", ময়ূরভঞ্জের অধিপতি "গীতসম্রাট", টিকারারাজ "অদ্বিতীয় গায়ক", মীর্জাপুর সঙ্গীত সম্মেলন "সঙ্গীত ভাস্কর", পুরুলিয়া সঙ্গীত সভা "স্বর সাধক", নাড়াজোলের অধিপতি "তানরাজ", ঝঙ্কার "ডক্টর অফ্ মিউজিক্" প্রভৃতি। আর এই সমস্ত ব্যতীত বহু সভা মহাসভা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বুবর্ণ পদকও তিনি পেয়েছেন। তার মধ্যে কাশী সঙ্গীত মহাসভা, বিষ্ণুপুরের অধিপতি রামকৃষ্ণসিংহদেব, কালিকা মিউজিক কলেজ থেকে সঙ্গীত রাজ্ঞী প্রতিভাদেবী ও উখরার জমিদার পুলিনবিহারী সিংহমশায় অন্যতম, এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের রবীন্দ্র

শতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভারতের সর্বোত্তম "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করেন। কণ্ঠসঙ্গীত ব্যতীত যন্ত্রসঙ্গীতেও দক্ষতা ছিল তাঁর অসামান্য। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ৮৫ বৎসর বয়সে এই গুণীশ্রেষ্ঠ মহামনীষী ইহলোক হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুর-তথা সমগ্র বাংলার সঙ্গীত গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিলীন হয়ে যান মহাকালের গর্ভে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ও ছিলেন ঐমত প্রতিভার অধিকারী। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই দক্ষতা ছিল তাঁর অসীম। বীণা, সেতার, সুরবাহার, ব্যাঞ্জো, রবার, কানন, ন্যাসতরঙ্গ, এসরাজ প্রভৃতি সঙ্গীতের বহু যন্ত্রে ছিল তাঁর সমান দখল। আর ছিল সঙ্গীতের স্বরলিপি তৈরীতে তাঁর অগাধ প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের প্রায় দু-তিনশত গানের স্বরলিপি তিনি তৈরী করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ গাইতেন, আর সেই গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বরলিপি তৈরী করে যেতেন —যা খুবই বিস্ময়ের! তাই তিনি তাঁকে 'স্বরলিপির যাদুকর' বলে অভিহিত করে গেছেন। কিন্তু এত যশ, এত খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা উভয় সহোদরই —গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ, বাইরের মোহ পরিত্যাগ করে, দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতি স্বল্প মাহিনায় বিষ্ণুপুর রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ও ছিলেন একদিক দিয়ে অনন্য। তিনি শুধু দেশে নয়, বহির্ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী ও সারা ইউরোপে প্রচার করে বিষ্ণুপুর ঘরানাকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীনের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম. এ ক্লাশের ব্যবস্থা ও এম. এ ডিগ্রী প্রবর্তন করা হয়। ইনি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ধ্রুপদসঙ্গীত আকাশবাণীতে নিয়মিত ভাবে গেয়েছেন। আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডের তিনি একজন সভ্য ছিলেন। ইনিও কবিগুরুর বহু গানের স্বরলিপি করেছেন এবং কিছু গানের রেকর্ডও করে গেছেন।

ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। পূর্বেই উল্লিখিত আছে ইনি সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। এবং শুধু কণ্ঠসঙ্গীতেই নয়, ইনি একজন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদকও ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগ-রাগিনীর রূপজ্ঞান ছিল, তা নয়। তিনি

গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে বেশী।" এটা খুবই সত্য। তাঁর শেষের দিকের গান আমিও শুনেছি। তা আশ্চর্য রকমের সুন্দর। এবং তার প্রধান কারণ, তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানা ব্যতীতও রেওয়া ও বেতিয়া প্রভৃতি ঘরানার ধ্রুপদ শিক্ষা করে, সব কিছুর সংমিশ্রণে, তাঁর কণ্ঠ নিসৃত অবদানকে ঐমত সুখশ্রাব্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সঙ্গীতের যাদুকর যদুভট্টের পর তিনিও গীতসম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ই বিষ্ণুপুর ঘরানাকে সারা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যশের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেছেন। এই রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মশায় কলিকাতার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গীতাচার্য ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, কাশিমবাজার রাজসভা ও মুক্তাগাছার রাজ-দরবারে সভাগায়কের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

এঁর বহু ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।

এঁর ছাত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফেসার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীও একজন অসামান্য সঙ্গীতবিদ ছিলেন! কণ্ঠ সঙ্গীতে এঁর মত গাম্ভীর্যপূর্ণ অপরূপ কণ্ঠস্বর আরও কারও শোনা যায়নি।

এঁর আর একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র মৃদঙ্গী ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। তিনি নাড়াজোল রাজসভার মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। দ্বিতীয় ছাত্র হারাধন দেউঘরিয়া বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন।

সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র ও ছাত্র সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্য মশায়ও সঙ্গীতে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে তিনি কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে এরূপ বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। যার জন্য রাজা একটি সুসজ্জিত হাতী ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেই মহামান্য গুণীকে সম্বর্দ্ধিত করেন। দীনবন্ধু গোস্বামীর পুত্র গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী নিজের কৃতিত্বের গুণে ময়মনসিংহের মহারাজার সঙ্গীত পরিষদে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বাইরের থেকে পিয়ার বক্স বলে একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গী বিষ্ণুপুরে এসে-ছিলেন। সঙ্গীতাচার্য গদাধর চক্রবর্তীর বংশধর রামমোহন চক্রবর্তী তাঁর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর দুজন ছাত্র, জগৎচাঁদ গোস্বামী ও জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়। এঁরাও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। প্রবাদ আছে কুয়োপাটকে চামড়া দিয়ে ছেয়ে তাতে মৃদঙ্গের ধ্বনি তুলতে

পারতেন জগৎচাঁদ গোস্বামী। আর যতদূর জানা যায়, এঁর সময় থেকেই গোস্বামী বংশের সঙ্গীতের প্রসিদ্ধি আরম্ভ হয়।

বিষ্ণুপুরের আর একজন প্রতিভাধর মৃদঙ্গ ছিলেন গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি ত্রিপুরা রাজসভার মৃদঙ্গী ছিলেন।

তারপর উদয়চন্দ্র গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র গোস্বামী, হলধর গোস্বামী, নকুড়চন্দ্র গোস্বামী, শ্যামলাল গোস্বামী, কার্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, কানাইলাল চক্রবর্তী, মাধবলাল চক্রবর্তী, রামকল্প মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাক্রমে কুচবিহার, ত্রিপুরা, ময়মনসিং, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, পঞ্চকোট, নাড়াজোল, বিষ্ণুপুর, কুচিয়াকোল প্রভৃতি বহু রাজা, মহারাজার সভায় সঙ্গীতাচার্য ছিলেন।

আর এঁরা ব্যতীত বহু সাধারণ ব্যক্তি, ব্যবসায়ী শ্রমজীবী পর্যন্ত সঙ্গীতের সাধনা করে বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

তার মধ্যে রামচরণ সূত্রধর, ক্ষেত্রনাথ বণিক, রামপদ বণিক, হৃদয়নাথ ধীবর, রূপনাথ শাঁখারী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় সূত্রধর, কালীচরণ শাঁখারী, রামপ্রসন্ন কর্মকার, ব্যবসাজীবী অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ কামিলা প্রভৃতি অন্যতম।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বর্তমান কালের অন্যতম বরণীয় শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার এবং সঙ্গীত শিল্পী। ধ্রুপদ সঙ্গীতে বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধের যে বিজ্ঞপ্তি আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ কলকাতাতেও জারি করে রেখেছেন তার বিরুদ্ধে ব্যথিত শিল্পী প্রতিবাদ জানিয়েছেন বারংবার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বয়ং আকাশবাণী যাঁর নামকরণ নিয়ে গর্বিত। সেই বিশ্বকবির ভাষার এই অবমাননা যে কতদূর গর্হিত এবং উক্ত সঙ্গীতের বাহন হিসাবে বাংলা ভাষা যে কতদূর উপযোগিতা দেখিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি করেন নি। তবুও বিফলকাম হওয়ার ফলে অভিমানাহত শিল্পী আকাশবাণীতে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করেছেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগের আর এক নিদর্শন, তাঁর পুত্র চতুষ্টয়কেও তিনি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গীতেও করেছেন কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠপুত্র অমিয়রঞ্জন এম এ. পি. এইচ ডি এবং তা সঙ্গীত নিয়েই সঙ্গীতের সৌন্দর্য-বোধ গবেষণায়। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাগসঙ্গীত বিভাগের কণ্ঠসঙ্গীতের অধ্যাপক। মধ্যমপুত্র চিত্তরঞ্জন সরিষা রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সঙ্গীতাচার্য এবং ডায়মণ্ডহারবার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তৃতীয়পুত্র মনোরঞ্জন দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. এবং বেতার কেন্দ্রের অফিসার ও উচ্চমানের

খেয়াল গায়ক। চতুর্থ পুত্র নীহাররঞ্জন এম-এ, বি. টি. ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

মহাবলবান মহাকাল মত্ত তার ভাঙ্গাগড়ার খেলায়। মল্লরাজ শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক যুগ গত হওয়ার ফলে তার সঙ্গীত জগতেও কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসার পথে। কিন্তু সঙ্গীতের জন্য আকুলতা, তাকে অর্জন করবার ঐকান্তিকতা আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তার নিদর্শন পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতির সঙ্গীত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বেতার কেন্দ্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীতের গুরু দায়িত্ব যাঁরা বহন করে চলেছেন, তাঁদের এক বিশিষ্ট অংশ এই বিষ্ণুপুরেরই মানুষ। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত তাঁদের কণ্ঠ ও যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আজও প্রসার লাভ করে চলেছে।

বিষ্ণুপুরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। তার মধ্যে উক্ত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভাস্করচন্দ্র নন্দী, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, শিক্ষক অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়, মথুরানাথ দত্ত, ভাস্কর পাত্র, মধুসূদন নাগ, উক্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দেবব্রত সিংহঠাকুর সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী গৌরীবালা দেবী, গুরুপ্রসাদ সরকার, দূর্গাদাস গোস্বামী প্রভৃতি উচ্চমানের সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। তবুও সঙ্গীতে বাংলার পীঠস্থান, ভারতের দ্বিতীয়া দিল্লী বলে অভিহিত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত জগতে জোয়ারের তীব্রতা দূরে থাক, গতি তার অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। কিন্তু সংস্কৃতি মৃত্যুহীন। যুগে যুগে সে অপমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে বিকশিত হয়ে ওঠে পরম সার্থকতায়।

অনন্য অক্ষয় পাটরাঙ্গার সাধনা যেমন 'বালুচরী' এবং মল্লভূম শাড়ীর রূপ সৃষ্টিতে বিষ্ণুপুরের হৃতমান রেশম শিল্পকে পুনর্জীবিত করেছে অবিশ্বাস্যভাবে, শিল্পী অশ্বিনীকুমার নন্দীর অবিস্মরণীয় প্রতিভা যেমন বিষ্ণুপুরের শঙ্খ শিল্পকে করেছে বরেণ্য, সেইমত হয়ত কোন এক নব যদুভট্টের আবির্ভাবে একদিন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ঐতিহ্যও তার স্বমহিমায় পুনস্থাপিত হবে তার আত্ম-বিকাশের আনন্দ নিয়ে। কিন্তু তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। তাই অনুরোধ করি আমাদের জাতীয় সরকার—বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের জনসাধারণকে, তাঁদের অন্তহীন ঔদাস্য পরিত্যাগ করে তাঁদের ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁরা সচেষ্ট হোন।

সাহিত্য

সাহিত্যেও মল্লভূম এত উন্নত ছিল, যার তুলনা হয় না। এই রাজ্যের অগাধ সুখ-শান্তি ও এখানের নরপতিদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এখানের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল বিস্ময়কর ভাবে। সে সাহিত্য ছিল কল্যাণের আধার, লোক শিক্ষার বাহন। সম্পূর্ণভাবে নীতি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণকর ভাবধারাকে মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদের জীবনযাত্রার শান্তিময় ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং উন্নত করার কাজে সাহায্য করা হত। আজকের দিনের মানুষের মত বাস্তবতার নাম দিয়ে, প্রগতির নাম দিয়ে মানুষকে অমানুষিকতার পথে নিয়ে গিয়ে দেশ ও জাতিকে সর্বনাশের শেষ সীমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। সেকালের সাহিত্যিকেরা ছিলেন কল্যাণের পূজারী, মানবতার উপাসক। কোন প্রকার আবিলতা তাঁদের সৃষ্টি-শক্তিকে ক্লেদাক্ত করেনি। আর সেই জন্যই এখানে হীনতা, সংকীর্ণতা শূন্য এক আদর্শ ভাবধারা গড়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ আমরা পাই মন্দির, মসজিদ, পীরের আস্তানা প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মস্থান, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন উৎসবে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে।

এর সব চাইতে বড় কারণ, এখানের আবিলতাশূন্য উন্নত সাহিত্য। কারণ সৎসাহিত্য লোক শিক্ষার প্রধান বাহন। উন্নত সাহিত্য সৎকর্মে প্রেরণা যোগায়, মানুষের মনকে উন্নত করে তোলে।

এখানের সাহিত্যিকদের পুরোভাগে আমরা দেখতে পাই-ধর্মপূজার প্রবর্তক, 'ধর্মপুরাণ' রচয়িতা রমাই পণ্ডিত, সুললিত পদকর্তা মল্লাবনীনাথ বীরহাম্বির, 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ সাধক মনোহর দাস আউলিয়া, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা পদকর্ত্রী হেমলতা দেবী, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা মল্লাবনীনাথ গোপালসিংহদেব, 'দুর্গাপঞ্চ রাত্রি'র গ্রন্থকার রামপ্রসাদ, 'অনর্ঘরাঘব' নাটক রচয়িতা মুরারী মিত্র, কবিপতি বল্লভদাস, গোকুলদাস মোহান্ত, 'শিবমঙ্গল কাব্য', 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কবিশচন্দ্র, কাশীরাম বাচস্পতি, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বহু গান রচয়িতা সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদুভট্ট, রামকেশব ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এবং এঁরা ব্যতীত এখানের অসংখ্য অখ্যাত ব্যক্তিও এখানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার ফলে কথকতা, কবিগান, যাত্রাভিনয়ের নাটক, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল. শীতলামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, পাঁচালী প্রভৃতি বহু জিনিষ এখানে গড়ে উঠে-ছিল। পূর্বেই উল্লিখিত আছে কত পুঁথি নষ্ট, কত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রভৃতিতে চলে যাওয়ার পরও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ শালায় সাত হাজারেরও অধিক পুঁথি সংগৃহীত আছে। পৃথকভাবে সেইসব লেখকদের নাম পরিচয় এখানে দিতে গেলে এই গ্রন্থ মহাভারতের আকারে পরিণত হয়ে যাবে। তাই তার থেকে বিরত হলাম। পুঁথির ঐমত বিপুল সংখ্যা থেকে যে কোন সুধী ধারণা করতে পারবেন অতীতের বিষ্ণুপুর সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল কি অভাবনীয়ভাবে এবং এ রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধিও ছিল কিরূপ অকল্পনীয়! যার ফলে ঐ সমস্ত জিনিষ গড়ে উঠেছিল ঐমত অপরিমিত ভাবে। বর্তমান শতাব্দীতেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর নাম পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নামে এখানে রামানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি। তাঁর নামে এখানে যোগেশ পুরাকীর্তি ভবন স্থাপিত হয়েছে। তারপর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামদুর্লভ কাব্য বিশারদ প্রভৃতি। এঁরাও উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা ছিলেন।

উৎসব

উৎসব মানুষের এক বিশিষ্ট সম্পদ। উৎসবের ভেতর দিয়ে প্রচুর আনন্দ আসে। আনন্দ মানুষের জীবনী শক্তি বাড়ায়। আর টাকা পয়সা রোজগারের দিক দিয়েও উৎসব প্রচুর সাহায্য করে। উৎসবের মেলা প্রভৃতিতে প্রচুর জিনিষপত্র আয় বিক্রয়ের ভেতর দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়। তাই বিষ্ণুপুরের অধিপতিগণ তাঁদের রাজ্যে উৎসবকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন পরিপূর্ণভাবে। তারজন্য অনেককে স্থায়ী সম্পত্তি পর্যন্ত তাঁরা দান করে গেছেন। এমনকি উৎসবে প্রজাদের উৎসাহিত করবার জন্য রথযাত্রা, হোলি উৎসবের শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে তাঁরা নিজেরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছেন। হোলি উৎসবের পুরাতন গানের মধ্যে দেখা যায় তার প্রমাণ। 'আগে চলে মদনমোহন পিছু গোপালসিং' প্রভৃতি।

বর্তমান কালেও বিষ্ণুপুরের রাজা বাহাদুর রথপর্বের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে প্রজাদের আনন্দ দান করেন। আর এই পর্ব ব্যতীত অন্যান্য আরও সব পর্বে প্রজারাই রাজদরবারে গিয়ে সমবেত হয়।

যেমন শ্রাবণ সংক্রান্তির ঝাপান পর্ব। এখনও বহু সাপের ওঝা চতুর্দোলা, মোটর বাসের ছাদ, মাটির তৈরী বাঘের ওপর চড়ে রাজদরবারে গিয়ে বিষধর সাপ নিয়ে রাজাবাহাদুরের সামনে সাপের খেলা দেখিয়ে আসেন।

তার জন্য তার প্রধানদের বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে পুরস্কার দেবার প্রথা আছে।

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বশূন্যভাবে প্রজাপালন প্রভৃতি সদাচারের জন্য, এই সাম্প্রদায়িকতার দিনেও তাঁদের পূর্ব প্রথামত এখানের মুসলমান প্রজাগণ তাঁদের মহরম পর্বের তাজিয়া রাজদরবার মহল্লায় নিয়ে গিয়ে সেই তাজিয়া ও লাঠিখেলা প্রভৃতি রাজবাহাদুরকে দেখিয়ে আসেন। সেই মহরম পর্বের উৎসবে তাঁদের উৎসাহিত করবার জন্য তাঁদের নির্বাচিত প্রধানকে পুরস্কার দেবার প্রথা আছে।

আর আছে ইন্দ্র দ্বাদশী তিথির ইঁদ পর্ব। বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি রাজা আদিমল্ল তাঁর সাহায্যকারী সাঁওতালদের নিয়ে মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাদের নিয়ে ইঁদ পর্ব বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের এক বিশিষ্ট উৎসবরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। ঐ পর্বের আরম্ভের অনুষ্ঠান শুরু হয় আষাঢ় মাসের সংক্রান্তিতে ঝাপান পর্ব অনুষ্ঠানের পরের দিন শ্রাবণ মাসের প্রথম তারিখ থেকে।

ঐদিনকে এখানের চলতি ভাষায় ইঁদ কাটার দিন বলা হয়। ঐদিনে রাজবাড়ীর নিজস্ব বাদ্য ঝাড়খণ্ডি বাজনা বাজিয়ে এখানের শাঁখারী বাজার মহল্লার অধিবাসী ফৌজদার উপাধিধারী ব্যক্তিদের এক সক্ষম ব্যক্তি সামরিক-জাতীয় পোষাক পরে উন্মুক্ত তরবারি হাতে পূজারী ব্রাহ্মণকে নিয়ে বিষ্ণুপুরের প্রান্তবর্তী অরণ্যে ইঁদ তৈরীর জন্য ইঁদকাঠ সংগ্রহে যান। সেখানে গিয়ে ইঁদ তৈরীর উপযোগী দুটি সরলসুন্দর শাল গাছকে সঙ্গের ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিধিমত পূজো করিয়ে নিজের হাতের তরবারি দিয়ে আঘাত করিয়ে চিহ্নিত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরেরা কুঠার দিয়ে সেই গাছ দুটিকে কেটে ভূপতিত করে রেখে আসে।

তারপর রাধাষ্টমী তিথির পূর্ববর্তী ষষ্ঠীর দিনে সেই কাঠ দুটিকে ইঁদ পর্ব অনুষ্ঠানের ময়দান ইঁদতলায় নিয়ে এসে ইঁদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়। মূল ইঁদ কাঠের উচ্চতা দশ বার হাতের মধ্যে হয়। সেটিকে আগাগোড়া নতুন কাপড় দিয়ে মুড়ে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বাঁশের বাখারী দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়। তার শীর্ষস্থানে তালপাতা ও বাঁশের বাখারী দিয়ে তৈরী এক ছত্র দেওয়া হয়। আর ধান ভাঙ্গা ঢেঁকিকে যেমন পাউই নামক দুটো কাঠের মধ্যে লাগিয়ে ওঠানামা করা হয়। ইঁদ কাঠকেও তোলবার জন্য তার গোড়ার দিকে সেইমত ব্যবস্থা করা থাকে। তাকে হাড়িকাঠ বলা হয়। তারপর ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে

ইঁদপর্বের দিন স্নানবেলায় অভিষেক মঞ্চের ওপর রাজাবাহাদুরকে বসিয়ে শাস্ত্রীয় বিধান মত অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করে, অপরাহ্ণের দিকে মহাপালে চড়িয়ে অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা, রাজপুরোহিত মহাপাত্র ও রাজা বাহাদুরকে ইঁদতলা ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে শাস্ত্রীয় বিধানমত অনন্তদেব শালগ্রামশিলার পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে রাজাবাহাদুর ইঁদ কাঠে সংযুক্ত দড়ি ধরে ইঁদ তোলা অনুষ্ঠান শেষ করেন। তারপর চলে আনন্দ উৎসব। দূর দূরান্তর থেকে আগত সাঁওতাল নর-নারীর সেই ইঁদ কাঠকে ঘিরে চলে নৃত্য, গীত প্রভৃতি।

এই পর্ব উপলক্ষে একজাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানও সমবেত সাঁওতাল নর-নারীর মধ্যে চলে। সে তাদের বর, বধূ নির্বাচন। এখানের চলতি ভাষায় তাকে সিঁদরাণ অর্থাৎ সিঁদুর দেওয়া অনুষ্ঠান বলে। নির্বাচিত বধূর সিঁথিতে অতর্কিতে সিঁদুর লাগিয়ে যে কোন প্রকারে হোক বর আত্মগোপন করে। নৈলে আদর আপ্যায়ন দূরের কথা পাত্রীপক্ষ এমন বেপরোয়াভাবে তাকে প্রহার করে যার ফলে তার প্রাণ সংশয় হয়ে পড়ে। এইমত সব অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সেদিনের পর্ব শেষ হয়।

তারপর তার সাতদিন পরে সেই ইঁদ কাঠকে সেখান থেকে তুলে বাঁধের জলে তার সলিল সমাধি করে ইঁদ পর্ব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। এই সময় এক প্রকার ঝোড়ো বাতাস দেয়। এখানের চলতি ভাষায় তাকে ইঁদ ঝাড়ি বলা হয়। এই ইঁদ পর্ব অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে সাঁওতাল সর্দারদের হলদে রংয়ের পাগড়ী উপহার দেবার প্রথা আছে। মহরম পর্বের মুসলমান প্রধানকে পুরস্কার দেবার প্রথা আছে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা ও একটি নূতন বস্ত্র। ঝাপান পর্বের ওঝা প্রধানকে দেবার প্রথা আছে, একটি রৌপ্যমুদ্রা ও মনসা-দেবীর প্রসাদ। এইমত ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিষ্ণুপুরের নরপতিগণ উৎসবে প্রজাদের উৎসাহিত করে গেছেন।

সকলের ওপরে বিষ্ণুপুরের শারদীয় দুর্গোৎসব এখানের সব চাইতে বিরাট বিস্তৃত উৎসব! রাজদরবার ব্যতীত বিষ্ণুপুরের আরও বহু জায়গায় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে রাজদরবারে মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রী মৃন্ময়ীদেবীর মন্দিরে উক্ত মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয় খুবই বিস্তৃত ভাবে।

সাধারণ দুর্গাপূজা হয় যে পুরাণের মতে এ হয় অন্য, বলী নারায়ণী মতে। এই মতের মহাপূজার পুঁথি আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হয় নি। এর হস্তলিখিত পুঁথি আছে বিষ্ণুপুর রাজপুরোহিত মহাপাত্রমশাইদের বাড়ীতে।

এ পূজা সাধারণ দুর্গা পূজা হতে আরও বহু বিস্তৃত। পিতৃপক্ষের নবমী তিথি থেকে আরম্ভ হয়ে দেবীপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এর সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ উনিশ দিন ব্যাপী এখানের শারদীয়া দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ হয় দেবীপক্ষের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন। আর মৃন্ময়ী দেবীর কল্পারম্ভ হয় পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে। তাই একে নবম্যাদি কল্পারম্ভ বলা হয়। তার পূর্বের দিন জীমূত বাহনের পূজা জীতাষ্টমীর দিনে হয় এর বিল্বরণ বা আমন্ত্রণ অধিবাস। তার পর তারিখে আদ্রা নক্ষত্র যুক্ত নবমী তিথিতে হয় দেবীর বোধন। পটে আঁকা মহিষমর্দিনী দশভূজা দেবী ও তাঁর ঘটসহ মৃন্ময়ী মন্দিরে হয় বড় ঠাকরণের আগমন। সেই থেকে নিয়মিত ভাবে চলে তাঁর পূজা, হোম প্রভৃতি। পরে তার পরবর্তী দেবীপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ঐ মত আর এক পট ও ঘটসহ আসেন মধ্যম বা মাইজর ঠাকরণ। কিন্তু সে সময় সেখানে তাঁর অবস্থিতিকাল খুবই স্বল্প। সেই দিন ও রাত্রি অবস্থানের পর তার পর তারিখের প্রত্যুষে হয় তাঁর বিদায়। তারপর তার পরবর্তী দেবীপক্ষের ষষ্ঠীর দিন পুনরায় হয় বিল্ববরণ বা আমন্ত্রণ অধিবাস, এবং তার পরদিন মহাসপ্তমী তিথিতে ঐ মত পট ও ঘটসহ আসেন ছোট ঠাকরণ বা পটেশ্বরী, আর তার সঙ্গে হয় মাইজর ঠাকরণেরও পুনরাগমন। একসঙ্গে চলে পটে আঁকা তিন ঠাকরণ ও মৃন্ময়ী দেবীর পূজা। উক্ত পূজায় ছোট ঠাকরণেরই প্রাধান্য বেশী। তাই তাঁকে পটেশ্বরী বলা হয়।

সপ্তমীর দিনে ব্রাহ্মী, কালিকা, রক্তদন্তিকা, শোক রহিতা, কার্তিকী, শিবা, দুর্গা, চামুণ্ডা, লক্ষ্মীদেবীর এই নয় রূপের প্রতীক নব পত্রিকার হয় বিস্তৃতভাবে পূজা। এতে প্রয়োজন হয় স্নানের জন্য সমুদ্রের বারি, বিভিন্ন নদ-নদী তাদের সঙ্গমস্থলের জল, মাটি, তীর্থবারি, কর্পূর, অগুরু প্রভৃতি দেওয়া সুগন্ধি জল, হাতীর দাঁতে খোঁড়া, শূকরের দাঁতে খোঁড়া, বৃষের সঙ্গে খোঁড়া মাটি ও বিচারালয়, বেশ্যার দোরের মাটি প্রভৃতি মেশান জল।

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পূজা ও বিস্তৃত আচার অনুষ্ঠান হয় মহাষ্টমীর দিন। সেদিন মহাষ্টমীর সবকিছু নিয়মকানুন, আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত ও মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে অষ্টধাতুর তৈরী অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডী দেবীর হয় মহাস্নান অনুষ্ঠান। মৃন্ময়ীদেবীর সম্মুখে স্থায়ী এক পাকা বেদীর ওপর উক্ত দেবীকে রেখে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে উক্ত মহাস্নান পর্ব শেষ করা হয়। আর সেদিনের মহাষ্টমীর পূজায় উক্ত উগ্রচণ্ডা দেবীরই প্রাধান্য থাকে অধিক।

মহাষ্টমী দিনের সন্ধিপূজা, সন্ধি বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়,

মহাষ্টমী তিথির গমনকাল ও মহানবমী তিথির আগমন কালের সন্ধিক্ষণে। মল্লভূমে সেই সময়কে ঘোষণা করা হয়, বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লায় অবস্থিত মুর্চার পাড়ের ওপর স্থাপিত কামানে অগ্নি সংযোগ করে তার তোপ ধ্বনির মাধ্যমে। মল্লভূমবাসী সেই তোপধ্বনি শুনে ও তার অগ্নিশিখা দেখে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ পালন করেন। সেই সময় দিক দিগন্ত প্রকম্পিত করে এক অভিনব শব্দ উত্থিত হয়। তাকে বলা হয় মল্লের রা। ঐ সম্বন্ধে ছড়ার আকারে এখানে এক প্রবাদ বাক্য আছে।

মল্লে রা, শিখরে পা,
সাক্ষাৎ দেখবিত নদীয়ায় যা।

সেই রা কয়েক দশক পূর্ব পর্যন্ত আমার তরুণ বয়সে আমি শুনেছি। আর এখন শোনা যায়, উচ্ছৃঙ্খল নর-নারীর চীৎকার, আর কানের পর্দা ফাটান পটকার বীভৎস আওয়াজ।

তারপর মহানবমীর দিন হয় মহানবমীর মহাপূজা, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান। আর এক স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান হয় মহামারী খচ্চর বাহিনী দেবীর মহাপূজা। পটে আঁকা সেই মূর্তি থাকে বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুরের লক্ষ্মীঘর নামক দেবগৃহে। বৎসরে ঐ একদিন মাত্র মৃন্ময়ী মন্দিরে সেই পট নিয়ে এসে মহানবমীর মহানিশায় পূজা করা হয়। পূর্বেই উল্লিখিত এর পূজা পদ্ধতি অদ্ভুত। পটের পিছন দিকে পূজারী ব্রাহ্মণকে করতে হয় উক্ত খচ্চর বাহিনীদেবীর অর্চনা। এবং পূজারী ব্রাহ্মণ ও রাজাবাহাদুর ব্যতীত সেই সময় সেখানে আর কারও থাকা নিষিদ্ধ। তারপর আসে বিজয়া দশমীর বিসর্জনের দিন। এক মৃন্ময়ীদেবী ব্যতীত সেখানের সকলের হয় বিসর্জন। পট ঘট সব কিছু হয় বিসর্জিতা। অতীতে হাতী, ঘোড়া, চতুর্দোলা ও সেইমত আর ও সব সাজ সজ্জা, বাদ্য ভাণ্ড সহ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ববর্তী সরোবর কৃষ্ণ বাঁধে গিয়ে উক্ত বিসর্জন পর্বের সমাপ্তি করা হত। কিন্তু সরকার বাহাদুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার পর শক্তি সমৃদ্ধি হীন হওয়ায় এখন আর তা হয় না। বর্তমানে রাজ দরবার মহল্লার মধ্যবর্তী গোপালসায়র নামক পুষ্করণীতে উক্ত কাজ শেষ করা হয়।

তারপর অপরাহ্নের দিকে হয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শুভযাত্রার প্রতীক টেসকনা নামক পাখী দর্শন, দধির মধ্যে জ্যান্ত মাছ ছেড়ে দিয়ে তা দর্শন প্রভৃতি। তারপর বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা অনন্তদেব শালগ্রামশিলা, কুল পুরোহিত মহাপাত্রকে অগ্রগামী করে, মহাপালে চড়ে বিজয়া সাওয়ারী

নামক অনুষ্ঠানে বের হন রাজা বাহাদুর। প্রথমে যান বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বর্তমান হাওড়া রোডের পার্শ্ববর্তী রঘুনাথজীউয়ের অস্থলে। সেখানে রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ দর্শন ও তাঁকে প্রণাম করে যান বিষ্ণুপুরের শেষ তার উত্তর-পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ইঁদতলা বা ইঁদপর্ব অনুষ্ঠানের ময়দানে। সেখানে খড়ের রাবণ ও তার চিতা তৈরী করে তাকে দাহ করা হয়। রাজা বাহাদুর তার ধোঁয়া দর্শন করেন। তারপর অনন্তদেবের পূজা, সদ্য তৈরী করা এক তোরণের ভেতর দিয়ে স্বল্প বয়স্ক এক বৃষকে পার করে, সড়ক দুয়ার, বৈতরণী পার প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ করে, নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত বাসন্তীদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে শাঁখারী বাজার মহল্লায় অবস্থিত বুড়ো ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজারী-পণ্ডিত উপাধিধারী কর্মকারদের দুর্গামণ্ডপ, মাড়ুইবাজার মহল্লায় অবস্থিত কর্মকারদের বারমেসে দুর্গামণ্ডপ ও গড়দরজা মহল্লায় অবস্থিত দুর্গামণ্ডপে মাল্যভূষিত হয়ে রাজদরবার মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে মৃন্ময়ী মন্দিরে যান রাজা বাহাদুর। সেখানে দেবীকে প্রণাম করে গদীতে বসে হুকুম দেন তোপের। সঙ্গে সঙ্গে একের পর বহু তোপ গর্জে ওঠে। তাকে বিজয়া সাওয়ারী ফেরার তোপ বলা হয়। তারপর তলোয়ার খেলা, রাজপুরোহিতের নিকট হতে হোমের তিলক গ্রহণ, অপরাজিতা বন্ধন, শান্তিজল নেওয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ করে, রাজ অন্তঃপুরের দেবগৃহ লক্ষ্মীঘর হতে আনীত স্বর্ণপট, অষ্টধাতুর অষ্টাদশ-ভূজা প্রভৃতি নিয়ে যান অন্তঃপুরে। সেখানেও রাজ পুরোহিত অন্তঃপুরিকাদের তিলক দান, অপরাজিতা ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ দরবারের শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান শেষ করেন।

আরম্ভ হয় রঘুনাথজীউ বিগ্রহের অস্থলের রাবণ কাটার পর্ব।

সেখানে রঘুনাথজীউ বিগ্রহের পূজা, নামের উপযোগী মুখোস ও পোষাক পরে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ প্রভৃতি সেজে, বিষ্ণুপুর রাজ দরবারের নিজস্ব বাদ্য ঝাড়খণ্ডি নামক বাদ্য বাজিয়ে নেচে, রাবণের পুত্র-ইন্দ্রজিতের মাটির গড়া মূর্তিকে বধ করে, সেই বিজয়া দশমীর দিনের ইন্দ্রজিতবধের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এখানের চলতি ভাষায় ঐ মুখোস, সাজপোশাকধারী সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতিকে রাবণ কাটার বানর বলা হয়। দশমীর পরের তারিখ একাদশী বা মধ্যম বিজয়ার দিন কুম্ভকর্ণ বধের অনুষ্ঠান করা হয়। সেদিন সকালের দিক থেকে তাদের সাজপোষাক পরে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী পল্লীতে যান রাবণ কাটার বানরেরা। সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে ফিরে বাদ্যভাণ্ড সহকারে নেচে গ্রামবাসীদের তাঁরা প্রচুর আনন্দ দেন। তারপর

সন্ধ্যের দিকে ফিরে এসে রাত্রে মাটির তৈরী কুম্ভকর্ণকে বধ করে মধ্যম বিজয়া দিনের কুম্ভকর্ণ বধ অনুষ্ঠানের শেষ করেন।

তারপরের তারিখ দ্বাদশী বা শেষ বিজয়ার দিন জাঁকজমকপূর্ণ রাবণ বধ পর্বের অনুষ্ঠান। সেদিন বিষ্ণুপুর সহরের সর্বত্র বালক বালিকাদের রাবণ কাটার বানরের আতঙ্ক, আর বড়দের আনন্দ। সেদিন সারা সহর পরিভ্রমণ করে বাদ্যভাণ্ড সহকারে নেচে সমস্ত সহর তাঁরা তোলপাড় করে তোলেন। তারপর রাত্রির দিকে ফিরে এসে রাবণ কাটা পর্ব অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগদান করেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে জনসমাগম হয় প্রচুর! গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে সেই পর্ব। রথারূঢ় রঘুনাথজীউ বিগ্রহের সামনে মাটির তৈরী বিশাল রাবণের মূর্তিকে বধ করে তার সমাপ্তি করা হয়। আর সেই সঙ্গে হয় দীর্ঘ উনিশ দিন ব্যাপী শারদীয়া দুর্গোৎসবের সমাপ্তি।

এখানের চলতি কথায় বলে—বারো মাসে তেরো পার্বণ। বিষ্ণুপুর ছিল তারও ওপরে। জীবনের দিনগুলিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার জন্য, ভক্তির নিবিড়তায় জীবনকে মহীয়ান করার জন্য, এখানের মানুষ চিন্তা করেছে এখনও তার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উৎসব। ইতুপূজার রমণীয়তায় আজও ঘরে ঘরে বধূরা শ্রীময়ী। তুষু গানের উল্লাসে কুমারীরা উচ্ছল। দীর্ঘ এক মাসের পূজার পর অগ্রহায়ণের শেষ রাতে ইতুর হয় বিসর্জন। রাত্রি শেষের সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি ইতুর বিদায় উৎসবের শঙ্খ ঘণ্টায় হয়ে ওঠে যেন মায়াময়ী। মকর সংক্রান্তির রাত্রির পথে পথে তুষুর ভেলা নিয়ে মেয়েরা, বধূরা যখন গাইতে গাইতে চলে যায়, তখন কীর্তিময়ী বিষ্ণুপুরের অতীত যেন কথা বলতে থাকে বর্তমানের আঙ্গিনায়। কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ, যমুনাবাঁধ প্রভৃতি হ্রদে সদৃশ বিশাল জলাশয়ের বুকে শেষ রাতের মাদকতাময় শীতের বিস্তারে রূপসী ভেলাগুলি ভাসতে থাকে। প্রদীপের আলোয় সজ্জিত দেহগুলি তাদের চঞ্চল! মনে হয় যেন জীবন সমুদ্রে ভাসমান এক একটি প্রাণের প্রতীক।

শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীময়ী, জ্ঞানময়ী সরস্বতীদেবীর আরাধনার আয়োজন হয় ও এখানে প্রচুর গাজন পর্ব, মনসা পর্ব, চব্বিশ প্রহরের নাম সংকীর্তনের পর্বও চলে এখানের বহু স্থানে বহুদিন ধরে। গাজনের ঢাকের কাঠি বন্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনসা পর্বের ঢাক সগর্বে উত্তাল হয়ে ওঠে। রথ যাত্রায় কতদূরের গ্রাম, নগর থেকে আসে কত মানুষ। আজও তার বিরাম নেই। অতীত দিনের আয়োজনের সঙ্গে আধুনিককালের জৌলুষ যুক্ত হয়ে, উৎসবকে করেছে আরও রূপময়ী।

মেলার আয়োজনও এখানে প্রচুর। চৈত্র মাসের বারুণীয় মেলার খ্যাতি ছিল এক কালে সুদূর বিস্তৃত। দ্বারকেশ্বর নদ এখন সেই মেলার স্থানকে দিনে দিনে গ্রাস করে অস্তিত্বকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে। কিন্তু তবুও তা লুপ্ত হয়নি। সে মেলা বসে এখন তারই নিকটবর্তী ষাড়েশ্বর বা সারেশ্বর শৈলেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্তী ময়দানে। কিন্তু তার সে বিশালতা আর নেই। কিন্তু আরও নতুন মেলার জন্ম দিনে দিনে বেড়েছে। মকর সংক্রান্তিতে নাড়িচা গ্রামের সর্বমঙ্গলাদেবীর মেলা, মাঘী পূর্ণিমায় বগড়ী গ্রামের কৃষ্ণরায় বিগ্রহের দোল-যাত্রার মেলা, সোনামুখী গ্রামে মনোহরদাসের মহোৎসবের মেলা, হরিতপোবনে রামনবমীর মেলা, কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণদেবের মেলা, জিতুজুড়ি গ্রামের শোন বা শনি পর্বের মেলা প্রভৃতি। সবার ওপরে ছিল এখানের রাস পর্ব। সুদূর অতীতে হত তা মহারাজা বীরহাম্বিরের প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাসমঞ্চে। এবং মাত্র দু দশক পূর্বেও তার অপার মহিমা নিয়ে বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মৃন্ময়ী মায়ের শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত নয়নাভিরাম বিগ্রহের সেই মহামেলা। নিস্তব্ধ রাত্রির ভাবগম্ভীর পরিবেশে সেখানে অধিষ্ঠিত সমস্ত বিগ্রহের একসঙ্গে সন্ধ্যারতি, এককালীন বন্দনা, দর্শক মনকে ভরিয়ে দিত এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতিতে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উপভোগ করতে হয় তা উপলব্ধি দিয়ে। কিন্তু সেদিন আর নেই। জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজাবাহাদুর নিঃস্ব, অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জনসাধারণ পঙ্গু দলীয় কোন্দলে উন্মত্ত। সর্বোপরি দেশ আজ দুর্নীতির দরিয়া। তার কাছে যত কিছু শুভ সব বর্জনীয়।

কামান

প্রবাদ আছে বিষ্ণুপুরের নরপতিদের ছোট বড় বিভিন্ন আকারের বাইশ শত কামান ছিল। সারা রাজ্য ভরে বিভিন্ন স্থানে সেগুলি রাজ্যরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার কিছুই নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিষ্ণুপুরের শক্তিকে নষ্ট করবার জন্য এঁদের নির্বাণপ্রায় সামরিক শক্তির শেষ সম্বল কামান, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি এঁদের সমস্ত অস্ত্র জোর করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। এবং সামান্য কিছু সংখ্যক নিয়ে যান। আর তাঁদের আদেশে, সারা রাজ্যের সমস্ত কামান, বন্দুক, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের রাজদরবার মহল্লায় অবস্থিত মুর্চার পাহাড়ের ওপর কয়েকটি

কামান ছিল। বর্তমানে তাও নেই। কয়েকটি তার পাশের পরিখার মধ্যে পড়ে আছে। আর বাকী কয়েকটি আওয়াজের সময় ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট কামানের নমুনা স্বরূপ বর্তমান ফৌজদারী আদালতের সামনে সিমেণ্টের বেদীর ওপর একটি কামান আছে। এর দৈর্ঘ্য সাত ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, মাঝের বেড় দু ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, গোলা বের হবার বিবর সাড়ে চার ইঞ্চি। আর আছে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল কামান দলমর্দন বা দলমাদল। এত বড় কামান সচরাচব দেখা যায় না। এর ওজন ২৯৬ মণ। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি, বিবরের ব্যাস সাড়ে এগার ও মুখের ব্যাস সওয়া এগার ইঞ্চি। পার্শি-ভাষায় এর মূল্য লেখা ছিল তখনকার দিনের এক লক্ষ পঁচিশ টাকা। এখন আর সে লেখার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই কামানটি ৬৩টি লোহার বেড়ি বা বালা ও প্রয়োজনমত লোহার পাটি দিয়ে তৈরী বলে অনুমান করা হয়। প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তিকে অবলীলায় পরাভূত করে এই বিশাল আগ্নেয়াস্ত্রটি সেকালের শিল্পীদের অবিস্মরণীয় নৈপুণ্য এবং মল্লরাজ শক্তির গরিমা প্রচার করছে সগর্বে।

মন্দির

কথিত আছে সারা রাজ্যভরে বিষ্ণুপুবের নরপতিদের তিনশত ষাট দেবালয় ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় যে তার অধিকাংশই এখন বিনষ্ট। অবশিষ্ট কয়েকটি আছে ভারত সরকারের প্রাচীন কীর্তিরক্ষা বিভাগের রক্ষণাধীনে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুরের বাইরে প্রায় ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বোলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় একশত ফুটেরও বেশী। এটি বিষ্ণুপুরী স্থপতিদের তৈরী হলেও, এতে সুদূর ভুবনেশ্বরের ভুবন বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিল্প পদ্ধতির ছোঁয়াচ আছে।

আর আছে বাইরের মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের প্রায় চার মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত তার উপনদী ব্রীড়াবতীর তটভূমিতে দুটি মন্দির। সারেশ্বর ও শৈলেশ্বরের শিবমন্দির।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের সপ্তত্রিংশ রাজা পৃথ্বিমল্ল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৬০৬ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন উক্ত শিব ও শ্রীমন্দির। মন্দির দুটির পাশ দিয়ে ধীর, মন্থর গতিতে একদিন বহে যেত স্বচ্ছসলিলা ব্রীড়াবতী। কালের গতির সঙ্গে ইতিহাসের অখ্যাত নদীটি হারিয়ে ফেলেছে তার অস্তিত্ব। কিন্তু অপরূপ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে জীর্ণ অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে মন্দির দুটি। অবশিষ্ট মন্দিরগুলি আছে বিষ্ণুপুরের মধ্যে ও তার প্রান্তবর্তী স্থানে। তারমধ্যে মল্লেশ্বর মহল্লায় ১৬২২ খৃষ্টাব্দ ও ৯২৮ মল্লাব্দে বীরসিংহ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর শিবমন্দির।

শাঁখারীবাজার মহল্লায় অবস্থিত ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ ও ১০০০ মল্লাব্দে ত্রিপঞ্চাশৎ নরপতি দুর্জনসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মদনমোহনদেবের শ্রীমন্দির। বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লায় অবস্থিত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬৪ মল্লাব্দে দ্বিপঞ্চাশৎ নরপতি বীরসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধালাল জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির। ঐ মন্দিরটির দক্ষিণে অবস্থিত ১৬৮০ শকাব্দ ও ১০৬৪ মল্লাব্দে ষটপঞ্চাশৎ নরপতি চৈতন্যসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুড়ো রাধাশ্যাম জীউয়ের শ্রীমন্দির।

উক্ত মন্দিরের আরও দক্ষিণে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬১ মল্লাব্দে এক পঞ্চাশৎ নরপতি প্রথম বা বুড়ো রঘুনাথসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের মন্দির বিখ্যাত 'জোড়বাংলা'। জোড়বাংলার পশ্চিম ও বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬১ মল্লাব্দে উক্ত বুড়ো রঘুনাথসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির। এটি পাঁচচূড়া নামে পরিচিত।

আর আছে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বিখ্যাত সরোবর লাল বাঁধের দক্ষিণ তীরে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬২ মল্লাব্দে উক্ত বুড়ো রঘুনাথসিংহদেব প্রতিষ্ঠিত কালাচাঁদ জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির। তার পশ্চিমে নিকটবর্তী স্থানে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ ও ১০৪৩ মল্লাব্দে চৈতন্যসিংহদেবের মাতা ধর্মপরায়ণা চূড়ামণিদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব জীউয়ের শ্রীমন্দির, তারই পশ্চিমে অবস্থিত ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ ও ১০৩২ মল্লাব্দে চৈতন্যসিংহদেবের পিতা কৃষ্ণসিংহদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ জীউয়ের শ্রীমন্দির ও তার দক্ষিণ পশ্চিমে উক্ত ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ ও ১০৩২ মল্লাব্দে পঞ্চপঞ্চাশৎ নরপতি গোপালসিংহদেব প্রতিষ্ঠিত জোড়ামন্দির, এবং রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরের উত্তরে তার অনতিদূরে নন্দলাল জীউয়ের শ্রীমন্দির অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকার জন্য প্রতিষ্ঠার কাল বা প্রতিষ্ঠাতার নাম পাওয়া যায় না।

আর আছে বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কৃষ্ণ বাঁধের দক্ষিণ তীরে পাটপুরের বাগান নামক স্থানে কেশবলাল জীউয়ের শ্রীমন্দির। এরও প্রস্তরফলক না থাকার জন্য প্রতিষ্ঠার কাল ও প্রতিষ্ঠার নাম পাওয়া যায় না।

ঐ সমস্ত ব্যতীত বিষ্ণুপুর মাধবগঞ্জ মহল্লায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৭১ মল্লাব্দে

দ্বিপঞ্চাশৎ নরপতি বীরসিংহদেবের মহিষী মহারাণী চূড়ামণি পট্টমহাদেবী প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল জীউয়ের শ্রীমন্দির, বিষ্ণুপুর মহাপাত্র পাড়া মহল্লায় অবস্থিত ঐ একই সময়ে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ও ৯৭১ মলাব্দে উক্ত মহারাণী চূড়ামণি পট্টমহাদেবী প্রতিষ্ঠিত মুরলীমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির। জনসাধারণের অগ্রগতির জন্য এখানে একটা কথার উল্লেখ করলাম। বিষ্ণুপুরের মহারাণীদের পিতা-মাতার দেওয়া নাম যাই থাক, মহারাণী হওয়ার পর তাঁদের পর পর শিরোমণি, চূড়ামণি, ধ্বজামণি নামে অভিহিতা করা হয়। এবং বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার পর ঐমত সম্মানিয়া, সম্মানীয়দের মা গোঁসাই, বাবা গোঁসাই নামে সম্বোধন করা হয়।

বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তের খড়বাংলা মহল্লায় অর্ধভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত রাধা-বিনোদ জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির, শ্রীনিবাস আচার্য প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ জীউয়ের শ্রীমন্দির, শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমাধি, বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত বাসন্তীদেবীর সম্বাটতলা মহল্লায় সম্বাট তারিণীদেবীর শ্রীমন্দির ও বিষ্ণুপুরের বাহিরে নাড়িচা গ্রামে সর্বমঙ্গলাদেবী মন্দির অবস্থিত। এখানে পৌষমাসের মকর সংক্রান্তির দিন হতে পাঁচদিনব্যাপী হরিনাম সঙ্কীর্তন ও সেই উপলক্ষ্যে এখানে বিরাট মেলা বসে। তাতে বহু নরনারীর সমাবেশ হয়।

আর এই সমস্ত ব্যতীত বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী রাসতলা মহল্লায় আছে উনপঞ্চাশৎ নরপতি বীরহাম্বির প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাসমঞ্চ। এই জাতীয় মন্দির বাংলা-তথা সারা ভারতবর্ষে বিরল।

কিন্তু এই রাসমঞ্চ কোন বিগ্রহ বিশেষের শ্রীমন্দির নয়। রাজপর্ব অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজ বীরহাম্বির নির্মাণ করান এই বিশাল রাসমঞ্চ। রাসপর্ব অনুষ্ঠানের সময় এর সমস্ত দরজায় বিগ্রহ বসতেন, সেই সময় একসঙ্গে হত সেইসব বিগ্রহের পূজার্চনা, একসঙ্গে হত সন্ধ্যারতি, একসঙ্গে বাজত পূজা সমাপ্তির শঙ্খ। সে এক অনির্বচনীয় অনুষ্ঠান। কালের প্রভাব লয় হয়ে গেছে সেই স্মরণীয় ও বরণীয় দিন। সেই অতীত দিনের সাক্ষ্যস্বরূপ তার জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের রাসমঞ্চ।

আর আছে বিষ্ণুপুর তথা সমগ্র মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীশ্রীমৃন্ময়ীমায়ের শ্রীমন্দির। পূর্বেই উল্লিখিত আছে বিষ্ণুপুর রাজবংশের উনবিংশ নরপতি জগৎমল্ল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠা করেন এই দেবী। কিন্তু মন্দির নির্মাণের প্রচলন তখন ছিল না। তাই তা নির্মিত হয়েছে তার বহু পরবর্তীকালে। আর যে কোন কারণবশতই হোক তার ছাদ ধ্বসে পড়ে মন্দির নষ্ট হবার উপক্রম

হয়। এবং তার সংস্কার হয় বাংলা ১৩৫৫ সালে। তার জন্য তার আগের বৎসর ১৩৫৪ সালে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান, বিষ্ণুপুরের দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর তিন সহোদর রামশরণ, কৃত্তিবাস ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমারই রচিত বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক নাটক 'দেবীমৃন্ময়ী' টিকিট করে অভিনয় করে এক রাত্রিতে ২০৮৫·০০ টাকা সংগ্রহ করেন। এবং অভিনয়ের খরচ তাঁরা নিজেরা বহন করেন। তারপর তারপরের বৎসর ১৩৫৫ সালের মহাপূজার পূর্বে আরও টাকা সংগ্রহ করে উক্ত শ্রীমন্দিরের ছাদ আর ভোগ তৈরীর জন্য মন্দিরের সংলগ্ন একটি বড় আকারের রান্নাঘর তৈরী করান। তারপর ১৩৫৭ সালে পুনরায় টাকা সংগ্রহ করে শ্রীমন্দিরের বেষ্টনীর প্রাচীর এবং ১৩৬৫ সালে মন্দির মধ্যে যে আধারটির ভেতর মৃন্ময়ী প্রতিমা রয়েছে সেটি জীর্ণ হয়ে প্রতিমা নষ্ট হবার উপক্রম হওয়ায়, পুনরায় টাকা সংগ্রহ করে সেটির সংস্কার ও প্রতিমার অঙ্গরাগ করান। ঐ সমস্ত কাজে শ্রদ্ধেয় ফণিবাবুর যে অসীমনিষ্ঠা ও কর্মশক্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি, তা বিস্ময়কর! উক্ত ১৩৬৫ সালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার অরোরা ফিল্ম কোম্পানীকে দিয়ে বিষ্ণুপুরের সমস্ত মন্দির, গড, বাঁধ, দলমাদল কামান, পাথরের রথ প্রভৃতি তুলে নিয়ে গিয়ে বিগতদিনের স্মৃতি নাম দিয়ে ছায়া চিত্রের পর্দায় জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্য বিষ্ণুপুর-তথা মল্লভূমবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের জাতীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঁধ

এক পোকাবাঁধ ও কাজুলে বাঁধ ব্যতীত বিষ্ণুপুরের অবশিষ্ট সব কয়টি বাঁধই ধানের চলকে একদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে বিশাল জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই ঐ সমস্ত জলাশয়কে দীঘির পরিবর্তে বাঁধ বলা হয়।

বিষ্ণুপুরে ঐমত ৯টি বাঁধ ছিল। বিষ্ণুপুরের পূর্বপ্রান্তে দক্ষিণ হতে উত্তরে ৪টি। চৌকান, লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও কৃষ্ণ বাঁধ। তার মধ্যে চৌকান বাঁধের অতি সামান্য একটুখানি অবশিষ্ট আছে। বাকী সমস্ত অংশই তার আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় লালবাঁধ। তার গর্ভে আবাদী জমির পরিমাণ কম হলেও, তার কিছু অংশকে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘিরে মূল বাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার পরিধিকেও ক্ষুদ্র করা হয়েছে।

তারপর শ্যামবাঁধ ও কৃষ্ণবাঁধ। তাদেরও, বিশেষ করে শ্যামবাঁধের বহু অংশকে আবাদী জমিতে পরিণত করে পরিখার মত অপরিসর অবস্থায় পরিণত

করা হয়েছে। সহরের মধ্যস্থলে পোকাবাঁধ ও কাজুলে বাঁধ। বর্তমানে সেটি সাধারণ এক পুষ্করিণীর আকারে পরিণত হয়েছে। বাকী সমস্তই তার পরিণত হয়েছে আবাদী জমিতে। তার পাশেই অবস্থিত পোকাবাঁধ। আয়তনে তার পরিবর্তন কিছু না হলেও, গর্ভে তার উত্তরোত্তর পাঁকের আধিক্য তার অস্তিত্বকেও বিপন্ন করেছে।

তারপর বিষ্ণুপুরের পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ হতে উত্তরে একের পর এক যমুনা, কালিন্দী ও গাঁতাত বাঁধ অবস্থিত। স্বার্থান্ধ মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাদের তিন বাঁধেরই বহু অংশকে আবাদী জমিতে পরিণত করে তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে। অনাগত ভবিষ্যতের বুকে তাদের বিশাল পরিধি, স্ফটিকস্বচ্ছ জলরাশি সবই হয়ত জমিতে পরিণত হয়ে প্রবাদবাক্যে পর্যবসিত হবে। বিষ্ণুপুরের অধিপতিদের কল্যাণময় অবদান, অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কীর্তিনাশা অমানুষের দল কোনটিকেই বোধহয় আর অবশিষ্ট রাখবে না।

জলঘড়ি বা তামী

জলঘড়ি বা তামী এক প্রকার সময় নিরূপণকারী যন্ত্র বিশেষ। আমাদেব দেশে ঘড়ি যখন ছিল না, এমন কি ঘড়ি যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন আমাদের দেশে ঐ প্রকারে সময় নিরূপণ করা হত। একটি মাটির বৃহৎ পাত্র। আমাদের এখানের চলতিভাষায় তাকে কুঁড়ি বলা হয়। সেই পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার জল দিয়ে তাতে একটি তামার পাতের তৈরী বাটি ভাসিয়ে দেওয়া হত। আর এমন একটি ক্ষুদ্র আকারের ছিদ্র তাতে থাকত, যাতে করে বর্তমান কালের চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ তখনকার দিনের হিসাবের এক দণ্ড পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্র দিয়ে জল প্রবেশ করে বাটি ভর্তি হয়ে বাটিটি সেই কুঁড়ির জলে ডুবে যেত। এখনকার দিনের ঘড়ির নির্ণিত সময় চব্বিশ মিনিট সমান তখনকার দিনের এক দণ্ড, আড়াই দণ্ড সমান বর্তমান কালের এক ঘণ্টা, একালের তিন ঘণ্টা ও সেকালের সাড়ে সাত দণ্ড সমান সেকালের এক প্রহর এবং সেই আট প্রহরে এক দিন ও রাত্রি। আবার সেকালের সেই দণ্ডকেও ষাটভাগে বিভক্ত করা ছিল। তাকে বলা হত পল। সেই পলের সময় নিরূপণ করা হত ধীরে ধীরে দশবার শ্রী গুরুশব্দ উচ্চারণ করার সময়, অথবা একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে, ধীরে সুস্পষ্টভাবে সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে যে সময় লাগে সেই সময়ের পরিমাপ দিয়ে। সেই শ্লোকটি নীচে দিলাম—

'মা কান্তে পক্ষস্যান্তে পর্য্যাকাসে দেশে স্বাপ্পি
কান্তং বক্তং পূর্ণচন্দ্রং মত্বা রাত্রৌ চেৎ।
ক্ষুৎকামঃ প্রাটং শ্চেতো রাহু ক্রুর পান্থা
তস্যুর্দ্ধান্তে হর্ম্যাস্যান্তে শর্য্যেকান্তে কর্তব্যঃ।'

এবং এই পলকেও বিভক্ত করা ছিল বিপল প্রভৃতিতে। এইভাবে তখনকার দিনে সময় নিরূপণ করা হত। সেই সময়ের পরিমাপ দিয়ে সেকালের সব কাজ এমনকি জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি নিরূপণ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করা হত। এছাড়া সূর্যের গতি নিয়ে সময় নিরূপণ করা সূর্য-ঘড়ির ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু সূর্য ব্যতীত অন্য সময় তা কার্যকরী হত না। কিন্তু এই তামি বা জলঘড়ি দিন-রাত সব সময় সমান ভাবে কাজ দিয়ে যেত। আর মল্লভূম প্রাচীন রাজ্য। তাই পুরাকাল থেকে এখানে ঐ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। আর সূক্ষ্মভাবে সময় নিরূপণ করবার জন্য কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত শারদীয়া মহাপূজার সময় মৃন্ময়ীদেবীর শ্রীমন্দিরে ঐ তামি বসান হত। বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত চাকদহ গ্রামের গ্রহাচার্যেরা ঐ কাজ করতেন। উক্ত কাজের কর্মি রাধাগোবিন্দ আচার্য্য মশায়ের কাছেই এই তথ্য আমার সংগৃহীত।

কোতলখানা

কোতলখানাকে অনেকে বর্তমানে তার অপভ্রংশ কোতের খানা বলে থাকেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তার সঠিক নাম কোতলখানা। বিষ্ণুপুর রজদরবার মহল্লার রাজ অন্তঃপুরের বেষ্টনীর পরিখার পশ্চিম তীরের ক্ষুদ্র এক প্রান্তরের মত স্থানে ছিল ঐ বধ্যভূমি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের সেখানে কোতল করা-অর্থাৎ হত্যা করা হত।

সেই দণ্ডাজ্ঞা শোনাতেন, সেই কাজ সম্পন্ন করাতেন—এখানের বধিলা উপাধিধারী এক জাতি। এখনও তাঁদের বংশধরেরা বিষ্ণুপুরে আছেন। 'বধিলা'র পরিবর্তে হয়ে আছেন এখন তাঁরা তার অপভ্রংশ—'বইলা' নামে অভিহিত। এখনও তাঁদের বাসভূমি বইলাপাড়া নামে পরিচিত। বর্তমান ফৌজদারী আদালতের পূর্ব-উত্তর দিকের পল্লী, যেখানে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত করা হয়েছে তার পার্শ্ববর্তী বহু দূরব্যাপী স্থান ঐ নামে অভিহিত।

কোতলখানা এখন তার অপভ্রংশ কোতের খানা নামে পরিচিত। সম্প্রতি সেখানে মিলনশ্রী সিনেমা হাউস প্রভৃতি হয়েছে।

সাততালা

বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুরের সংলগ্ন সাততালা নামে যে জলাশয়, যেখানে রাজ অন্তঃপুরের সকলে স্নানাদি করতেন এবং এখনও করেন, তাকে সাততালা বলা হয়।

তার কারণ বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লা বিষ্ণুপুর নগর হতে বহু উঁচু জায়গায় অবস্থিত। তাই এক বর্ষাকাল ব্যতীত ঐ অতি উঁচু জায়গায় অবস্থিত সাততালা পুষ্করিণীতে জল থাকা সম্ভব নয় বিবেচনা করে, বিষ্ণুপুরের যে প্রধান সাতটি বাঁধ রয়েছে, মাটির নীচে পাইপ দিয়ে ঐ সাতটি বাঁধের সঙ্গে সংযোগ ব্যবস্থা করা আছে। সেই সাতটি বাঁধ থেকে অল্প-বিস্তর জল এসে ঐ জলাশয়ে জল সরবরাহ করত। আর সেটা যে নেহাত প্রবাদ বাক্য নয়, সত্য। তার প্রমাণ গত কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ জলাশয়ের একবার আংশিকভাবে পঙ্কোদ্ধার করা হয়েছিল। সেই সময় পর পর ঐমত তিনটা পাইপের মুখ দেখা গিয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে সংস্কার হলে নীচের দিকে আরও কয়েকটা বোধহয় দেখা যেত। সব চাইতে ওপরে একটি পাইপ আছে সব সময়েই দেখা যায়। সেটি নিকটস্থ গোপাল সায়র নামক পুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত। যে কোন ব্যক্তি একটুখানি অনুসন্ধান করলেই তা দেখতে পাবেন।

লালগড়

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সরোবর লাল বাঁধের দক্ষিণ-পূর্বদিকে গভীর জঙ্গলের মাঝে এই লালগড় দুর্গ অবস্থিত।

রহস্যময় এই স্থান। এখানেও বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুরের মত হাওয়া মহল প্রভৃতি সব কিছুই ছিল। প্রবাদ আছে বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুর হতে লালগড় দুর্গ পর্যন্ত মাটির নীচে সুড়ঙ্গ পথ আছে। কোন দুর্ধর্ষ শত্রু কর্তৃক বিষ্ণুপুর আক্রান্ত হলে তাদের হাতে বন্দী হবার আশঙ্কায় বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের শিশু নারী প্রভৃতিকে সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ঐ দুর্গম লালগড় দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ মত দুর্গম জায়গায় ঐ গড় তৈরী করা হয়েছিল।

বহু বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে শুনেছি, ঐ জায়গা তখন এমন দুর্গম ছিল

যে আমরা যাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে থাকি, সেইমত দুর্ধর্ষ বাঘ ওখানের জঙ্গলে তখন হামেশা আসত। আর থাকত বুনো শূয়োর বুনো ময়ূর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বন্য প্রাণী।

বর্তমানকাল হতে প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে, বন বিষ্ণুপুর যখন সত্যকার বন বিষ্ণুপুর ছিল, তখন আমি যখন প্রথম ওখানে যাই তখন ওই জায়গা ছিল খুবই দুর্গম। দুর্গের ধ্বংসাবশেষও তখন বহু পরিমাণে ছিল। এমন তার কিছুই নেই। সে জঙ্গল, ধ্বংসাবশেষ সব নষ্ট হয়ে গেছে। আছে শুধু চার পাশের মজে যাওয়া পরিখা, আর তার ক্ষুদ্র পাড়। আর আছে দুর্গের অভ্যন্তরে, তার মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় এগার ফুট ও চৌদ্দ ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট রহস্যময় গভীর এক চৌবাচ্চা। ঐ চৌবাচ্চা ছিল তখন এক ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। আমি যখন প্রথম ওখানে গিয়েছিলাম, তখন সেমরের ধ্বংসাবশেষ বহু পরিমাণে ছিল। সেই ঘরের বারান্দা পার হয়ে সেই চৌবাচ্চার নীচে নামবার সিঁড়ির মুখে যেতে হত। আর ছিল চৌবাচ্চার গর্তে তার ভেতর দেওয়ালে লোহার রিংয়ে লাগান তার জলের ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত লোহার মোটা মোটা শেকল। এখন আর সে শেকল নেই। কিন্তু লোহার রিং কয়েকটা দেওয়ালে গাঁথা আছে। সেই শিকল রহস্য ভেদ করবার আশায় আমি একবার একাই সেই চৌবাচ্চায় নামবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে সফল হতে পারিনি। কিছুদূর নামবার পর তার জলের মাঝ থেকে বুদবুদ উঠতে দেখা যায়। আরও এক ধাপ নামার পর সে বুদবুদ আরও বাড়তে থাকে। তাই মনের মধ্যে কেমন এক ভয়ের সঞ্চার হয়, উঠে চলে আসি। সেই কথা আমার কাছে শুনে, আমার কয়েকজন দুঃসাহসী বন্ধু সেখানে নামতে শুরু করে। তাতে প্রথমে বুদবুদ ও পরে আর একটু গভীরে নামার পর তাদের চাপেই বোধ হয়, বুদবুদ খুবই বাড়ে, আর তার সঙ্গে জল ওপর দিকে উঠে আসতে থাকে। সিঁড়ির দুটো ধাপ জলে ডুবে যায়। ওপর দিকে প্রায় দু ফুট পরিমাণ জল বেড়ে যায়। ফলে রহস্য ভেদের চেষ্টা না করে তারাও উঠে আসতে বাধ্য হয়। আর তার পরই জল আবার যথাস্থানে নেমে যায়। আমার মনে হয়, ওখানের চারপাশের মাটি খুঁড়লে অনেক কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে, এমনকি সেকালের গুপ্ত ধনাগার ওখানে বের হওয়া অসম্ভব নয়।

গুমগড় ও ফোয়ারাখানা

বিষ্ণুপুর গড়ের দক্ষিণ প্রান্তে রাজপথের পাশে পরিখার পাড়ের ওপর দরজা-জানালা বিহীন পাকা দালানবাড়ীর মত যে ইমারতটি রয়েছে, তার নীচের পরিখাকে বলা হয় ফোয়ারাখানা। আর ঐ দালানবাড়ীর মত ইমারতটিকে বলে গুমগড়। কিন্তু আসলে ওটি গুমগড় নয়, গুমটগড়। ওটি একটি জলাধার ছিল। ফোয়ারার জন্য ওখান থেকে জল সরবরাহ করা হত। ওর নীচে যে পরিখা অবস্থিত ওখান থেকে নেওয়া হত সেই জল। তাই ঐ পরিখাকে বলা হয় ফোয়ারাখানা। ঐ গুমটগড়ের নীচের যে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান রয়েছে, ওখানে এককালে—কেহ বলেন রাজ অন্তঃপুর, কেহ বলেন রাজউদ্যান ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে ঐ ফোয়ারা চালু করে ওখানের আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা করা হত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হয়েছে উহা গুমগড় নামে অর্থাৎ গুম করে খুন করবার স্থান বলে। কিন্তু আসলে ওটা গুমটগড়।

নুতন মহল

ইহা মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত, চেৎবরদা হতে আনীতা রহিমখাঁর বেগমসাহেবা সঙ্গীত নিপুণা, রূপসী লালবাঈয়ের বাসভবন। এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর রাজত্বকালের কাহিনীতে উল্লিখিত আছে মহারাজা রঘুনাথসিংহদেব নিহত হয়ে মহারাণী চন্দ্রপ্রভা তাঁর জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করার পর উন্মত্ত প্রজার দল লালবাঈয়ের উক্ত বাসভবন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আর প্রজাদের হাতে লাঞ্ছিতা হবার আশঙ্কায় উক্ত নূতন মহলের সংলগ্ন চৌবাচ্চায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লালবাঈ আত্মহত্যা করে। তাই বর্তমানে চৌবাচ্চা নামক ক্ষুদ্র জলাশয় ও তার শৌচাগার, নোংরা জায়গা বলে প্রজাদের রোষদৃষ্টি তার ওপর না পড়ার জন্য কোন প্রকারে জরাজীর্ণ অবস্থায় তাদের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। বিষ্ণুপুর শহরেব পূর্বপ্রান্তে কুমারী টকি হাউসের পূর্ব দিকে তার অনতিদূরে এটি অবস্থিত।

সতীকুণ্ড

মহারাণী চন্দ্রপ্রভার আত্মোৎসর্গের পুণ্যক্ষেত্র শ্মশানভূমি। কিন্তু শ্মশান এখন সেখানে নেই। তার চতুঃস্পার্শ আবাদী জমিতে পরিণত হয়ে আছে।

দুর্ঘটনার ভয়ে সেখানে কেহ হল চালনা করতে সাহসী হয়নি। এর পূর্বে যারা তা করেছিল, জীবন দিয়ে তাদের সেই ধৃষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। তাই এখন আর কেউ সেখানে হল চালনা করতে সাহসী হয় না। বর্তমানে কুণ্ডেরই মত অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছে। বর্ষাকালে তাতে জল জমে। নূতন মহলের অনতিদূরে, তার দক্ষিণ দিকে এটি অবস্থিত।

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীদের উচ্চ অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায় বলেছেন, 'আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগ্রার মত একটি কলানগরী বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটিমাত্র নগরী সারা বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরেও নানাবিধ শিল্প কার্য্যে বাংলাদেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ দেখিল না, চিনিল না, আদর করিতে শিখিল না।' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সৌজন্যে —"ভারত-সংস্কৃতি" পুস্তকের 'কাশী' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। ১৭৬ পৃষ্ঠা।)

তারপর বৃহৎবঙ্গের রচয়িতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন মশায় বলেছেন—'খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ জীবণে বন-বিষ্ণুপুর রাজবংশ একটা নূতন জীবনও প্রেরণা আনিয়াছিলেন। এই নাট্যশালার প্রধান নায়ক রাজা বীরহাম্বির নূতন জীবন পাইয়া বাংলার সামাজিক জীবনে একটা নূতন প্রেরণা দিয়াছিলেন।

বনবিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া দুই শতাব্দীকাল বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এদেশে শিক্ষা দীক্ষার যে ঘৃতের প্রদীপটি নিবু নিবু হইয়া জ্বলিতেছিল, বিষ্ণুপুব রাজবংশ তা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

এবং চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে বিষ্ণুপুরের অবদান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিভিয়া যায়। চৈতন্যদেব অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁর তিরোধান পর্য্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তারপর কয়েক বৎসর ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জ্বলিতে থাকে। ষট্ গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহণে-বিশেষত জীব গোস্বামীর তিরোধানের

সহিত সেই আলোক বৃন্দাবনে নিষ্প্রভ হইলে, শ্রীনিবাস আচার্য্য সেই আলোক বিষ্ণুপুরে প্রজ্জ্বলিত করেন।

সেই থেকে পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজসভাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এবং বৈষ্ণবধর্ম যে জগৎকে কিরূপ পুণ্যময় করিতে পারে, বনবিষ্ণুপুর কয়েক শতাব্দীর জন্য সর্বসমক্ষে সেই চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন।'

(বৃহৎবঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১০০ ও ১১১৪ পৃষ্ঠা।)

এই সমস্ত ব্যতীত দেশ-বিদেশের বহু সুধী বিশেষত ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্যের ভূপর্যটকেরা বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রনীতি, শাসনপদ্ধতি, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি সব দিক দিয়ে বিষ্ণুপুরকে সারা পৃথিবীর অন্যতম রাজ্য বলে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন।

আমার জীবনব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতি সেই অতুলনীয় রাজ্যের খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ ও জটিলতা মুক্ত করে সেই হৃদয়বান গবেষকের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম, যিনি আমার অনাবিষ্কৃত তথ্যকে আবিষ্কার ও সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত করে, বাঙ্গালী জাতির এই গৌরবময় ইতিহাস আরও ভালভাবে সুসম্পূর্ণ করে তুলবেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেবেন অতীতের স্বপ্ন, সাধনা এবং তার অবিস্মরণীয় সার্থকতার এক দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহ্যকে।

আদি হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজবংশের নরপতিগণের নাম ও তাঁদের রাজত্বকালের তালিকা।

নাম	খৃষ্টাব্দ	মল্লাব্দ	বাংলা সাল।
১। আদিমল্ল ,,	৬৯৪ ,,	১ ,,	১০১ ,,
২। জয়মল্ল ,,	৭১০ ,,	১৬ ,,	১১৭ ,,
৩। বেনুমল্ল ,,	৭২০ ,,	২৬ ,,	১২৭ ,,
৪। কিনুমল্ল ,,	৭৩৩ ,,	৩৯ ,,	১৪০ ,,
৫। ইন্দ্রমল্ল ,,	৭৪২ ,,	৪৮ ,,	১৪৯ ,,
৬। কানুমল্ল ,,	৭৫৭ ,,	৬৩ ,,	১৬৪ ,,
৭। ধমল্ল ,,	৭৬৪ ,,	৭০ ,,	১৭১ ,,
৮। শূরমল্ল ,,	৭৭৫ ,,	৮১ ,,	১৮২ ,,
৯। কনকমল্ল ,,	৭৯৫ ,,	১০১ ,,	২০২ ,,
১০। কন্দর্পমল্ল ,,	৮০৭ ,,	১১৩ ,,	২১৪ ,,
১১। সনাতনমল্ল ,,	৮২৮ ,,	১৩৪ ,,	২৩৫ ,,
১২। খড়্গমল্ল ,,	৮৪১ ,,	১৪৭ ,,	২৪৮ ,,
১৩। দুর্জ্জনমল্ল ,,	৮৬২ ,,	১৬৮ ,,	২৬৯ ,,
১৪। যাদবমল্ল ,,	৯০৬ ,,	২১২ ,,	৩১৩ ,,
১৫। জগন্নাথমল্ল ,,	৯১৯ ,,	২২৫ ,,	৩২৬ ,,
১৬। বিরাটমল্ল ,,	৯৩১ ,,	২৩৭ ,,	৩৩৮ ,,
১৭। মাধবমল্ল ,,	৯৪৬ ,,	২৫২ ,,	৩৫৩ ,,
১৮। দুর্গাদাসমল্ল ,,	৯৭৭ ,,	২৮৩ ,,	৩৮৪ ,,
১৯। জগৎমল্ল ,,	৯৯৪ ,,	৩০০ ,,	৪০১ ,,
২০। অনন্তমল্ল ,,	১০০৭ ,,	৩১৩ ,,	৪১৪ ,,
২১। রূপমল্ল ,,	১০১৫ ,,	৩২১ ,,	৪২২ ,,
২২। সুন্দরমল্ল ,,	১০২৯ ,,	৩৩৫ ,,	৪৩৬ ,,
২৩। কুমুদমল্ল ,,	১০৫৩ ,,	৩৫৯ ,,	৪৬০ ,,
২৪। কৃষ্ণমল্ল ,,	১০৭৪ ,,	৩৮০ ,,	৪৮১ ,,
২৫। ২য় রূপমল্ল ,,	১০৮৪ ,,	৩৯০ ,,	৪৯১ ,,
২৬। প্রকাশমল্ল ,,	১০৯৭ ,,	৪০৩ ,,	৫০৪ ,,
২৭। প্রতাপমল্ল ,,	১১০২ ,,	৪০৮ ,,	৫০৯ ,,

	নাম	খৃষ্টাব্দ		মল্লাব্দ		বাংলা		সাল
২৮।	সিন্দুরমল্ল	„	১১১৩	„	৪১৯	„	৫২০	„
২৯।	সুখময়মল্ল	„	১১২৯	„	৪৩৫	„	৫৩৬	„
৩০।	বনমালীমল্ল	„	১১৪২	„	৪৪৮	„	৫৪৯	„
৩১।	যদুমল্ল	„	১১৫৬	„	৪৬২	„	৫৬৩	„
৩২।	জীবনমল্ল	„	১১৬৭	„	৪৭৩	„	৫৭৪	„
৩৩।	রামমল্ল	„	১১৮৫	„	৪৯১	„	৫৯২	„
৩৪।	গোবিন্দমল্ল	„	১২০৯	„	৫১৫	„	৬১৬	„
৩৫।	ভীমমল্ল	„	১২৪০	„	৫৪৬	„	৬৪৭	„
৩৬।	কাটারমল্ল	„	১২৬৩	„	৫৬৯	„	৬৭০	„
৩৭।	পৃথ্বিমল্ল	„	১২৯৫	„	৬০১	„	৭০২	„
৩৮।	তপঃমল্ল	„	১৩১৯	„	৬২৫	„	৭২৬	„
৩৯।	দীনবন্ধুমল্ল	„	১৩৩৪	„	৬৪০	„	৭৪১	„
৪০।	২য় কানুমল্ল	„	১৩৪৫	„	৬৫১	„	৭৫২	„
৪১।	২য় শূরমল্ল	„	১৩৫৮	„	৬৬৪	„	৭৬৫	„
৪২।	শিবশিংমল্ল	„	১৩৭০	„	৬৭৬	„	৭৭৭	„
৪৩।	মদনমল্ল	„	১৪০৭	„	৭১৩	„	৮১৪	„
৪৪।	২য় দুর্জ্জনমল্ল	„	১৪২০	„	৭২৬	„	৮২৭	„
৪৫।	উদয়মল্ল	„	১৪৩৭	„	৭৪৩	„	৮৪৪	„
৪৬।	চন্দ্রমল্ল	„	১৪৬০	„	৭৬৬	„	৮৬৭	„
৪৭।	বীরমল্ল	„	১৫০১	„	৮০৭	„	৯০৮	„
৪৮।	ধাড়ীমল্ল	„	১৫৫৪	„	৮৬০	„	৯৬১	„
৪৯।	হাম্বিরমল্ল	„	১৫৬৫	„	৮৭১	„	৯৭২	„
৫০।	ধাড়ি হাম্বিরদেব	„	১৬২০	„	৯২৬	„	১০২৭	„
৫১।	রঘুনাথমল্লদেব	„	১৬২৬	„	৯৩২	„	১০৩৩	„
৫২।	বীরসিংহদেব	„	১৬৫৬	„	৯৬২	„	১০৬৩	„
৫৩।	দুর্জ্জনসিংহদেব	„	১৬৮২	„	৯৮৮	„	১০৮৯	„
৫৪।	২য় রঘুনাথসিংহদেব	„	১৭০২	„	১০০৮	„	১১০৯	„
৫৫।	গোপালসিংহদেব	„	১৭১২	„	১ ১৮	„	১১১[illegible]	„
৫৬।	চৈতন্যসিংহদেব	„	১৭৪৮	„	১০৫৪	„	১১৫৫	„
৫৭।	মাধবসিংহদেব	„	১৮০১	„	১১০৭	„	১২০৮	„
৫৮।	২য় গোপালসিংহদেব	„	১৮০৯	„	১১১৫	„	১২১৬	„
৫৯।	রামকৃষ্ণসিংহদেব	„	১৮৭৬	„	১১৮২	„	১২৮৩	„
৬০।	নীলমণিসিংহদেব	„	১৮৮৯	„	১১৯৫	„	১২৯৬	„
৬১।	শ্রীশ্রীরাজাকালীপদ-সিংহঠাকুর	„	১৯৩০	„	১২৩৬	„	১৩৩৭	„

শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর বিষ্ণুপুরের বংশ তালিকা।

শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী – পুত্র—গতিগোবিন্দ।

গতিগোবিন্দ—পুত্র—সুন্দরানন্দ, সুবলচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণপ্রসাদ, রাধিকা-প্রসাদ।

সুন্দরানন্দ—পুত্র—বৈষ্ণবানন্দ।

সুবলচন্দ্র (অপুত্রক) হরিশ্চন্দ্র, (বংশ—নাকাইজুড়ি, গোঁড়াশোল, হীরাপুর, চাবড়া, মাকড়কোল, চুয়ামসিনা, চেঙ্গাই, বেঙ্গাই, কুন্দাল্যা প্রভৃতি গ্রামে গিয়াছে)।

কৃষ্ণপ্রসাদ বংশ—(মুর্শিদাবাদ, শেলাটি, নবগ্রাম, মাণিক্যহার প্রভৃতি গিয়াছে)।

রাধিকাপ্রসাদ – অপুত্রক।

বৈষ্ণবানন্দ – পুত্র—কৃষ্ণানন্দ, শ্যামানন্দ (অপুত্রক)।

কৃষ্ণানন্দ—পুত্র –বিষ্ণুপুর নিবাসী ডমনচাঁদ, নিমাইচাঁদ, বলাইচাঁদ, কানাইচাঁদ, নিমাইচাঁদ (অপুত্রক)।

ডমনচাঁদ –পুত্র –অদ্বৈতচাঁদ, (বিষ্ণুপুর নিবাসী)।

বলাইচাঁদ—পুত্র—মোহনচাঁদ, দীপচাঁদ, রামচাঁদ (কাঁকিলা গ্রাম)।

কানাইচাঁদ –পুত্র—নীলমোহন, ক্ষেত্রমোহন, (কাঁকিলা গ্রাম)।

মোহনচাঁদ –পুত্র –ক্ষেত্রমোহন, দীপচাঁদ, রামচাঁদ।

দীপচাঁদ—পুত্র—গোপীনাথ (অপুত্রক) ক্ষেত্রমোহন।

ক্ষেত্রমোহন –পুত্র –ভৈরব।

ভৈরব · পুত্র—কেদার।

ক্ষেত্রমোহন—পুত্র –নিমাই।

কেদার – পুত্র –মন্মথ, আশু।

নিমাই—পুত্র—জগবন্ধু, প্রাণকৃষ্ণ (উভয়েই অপুত্রক)।

রামচাঁদ—পুত্র –গদাধর, হরিশ্চন্দ্র (অপুত্রক, কাঁকিলা গ্রাম)।

গদাধর—পুত্র—কেশব।

কেশব –পুত্র—গতিগোবিন্দ।

নীলমোহন –পুত্র—দ্বারিকানাথ, অযোধ্যা (অপুত্রক)।

ক্ষেত্রমোহন –পুত্র—ঈশ্বর (অপুত্রক)।

দ্বারিকানাথ—পুত্র—মানগোবিন্দ।

মানগোবিন্দ –পুত্র—হরিহর, মোহন।

বিষ্ণুপুরবাসী

ডমনচাঁদ—পুত্র—অদ্বৈতচাঁদ (বিষ্ণুপুর)।

অদ্বৈতচাঁদ—পুত্র—নিমাইচাঁদ।

নিমাইচাঁদ—পুত্র—জগৎচাঁদ (বিখ্যাত মৃদঙ্গী), শ্যামচাঁদ।

জগৎচাঁদ—পুত্র—কীর্তিচন্দ্র (মৃদঙ্গী), বিপিন (সেতারী), রাধিকাপ্রসাদ (ভারতবিখ্যাত গায়ক—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত), নকুল (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত)।

শ্যামচাঁদ—পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র।

কীর্তিচন্দ্র—পুত্র—রামচন্দ্র।

বিপিন—পুত্র—চৈতন্য, মোহন, শুকদেব, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ (ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত)।

রাধিকাপ্রসাদ—পুত্র—গোবিন্দ, গোপাল, বিজয়, কমল।

নকুল বা নকড়ি—পুত্র—বিমল।

কৃষ্ণচন্দ্র—পুত্র—গোলক, গোরাচাঁদ, রঘুনাথ।

গোবিন্দ—পুত্র—রবি, আদিত্য।

গোপাল—পুত্র—দুর্গাপ্রসাদ (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী) রবীন্দ্রপ্রসাদ, বিজয় (অপুত্রক)।

কমল—পুত্র—সলিল, তারাপদ (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী) মণ্টু (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী।)